মহানগরী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড
১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক: শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ
জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পাব্লিশার্স লিঃ
১১৯, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—চার টাকা

প্রথম সংস্করণ

অগ্রহায়ণ, ১৩৫২

জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেডের মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ প্রেস—১১৯ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা] শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল

সুহৃদ্বরেষু

প্রথম পরিচ্ছেদ

১

প্রথম শহরে আসিয়া ছ'টি জিনিস আমার চিরস্থায়ী বিস্ময়কে বাড়াইয়া তোলে।....শিয়ালদহ ষ্টেশনের বাহিরের বিপুল জনতা, সৌধ শ্রেণীর ঘন অরণ্য, যানবাহনের বৈচিত্র্য ও সংখ্যাধিক্য এ সমস্ত প্রথম দর্শনার্থীর গ্রাম্যচৈতন্যকে হরণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট হইলেও, বিপুল জলস্রোতে কলকল শব্দে ভাসিয়া চলার মতই লাগিয়াছিল। গ্রামের নদীতে বর্ষাকালে যখন বন্যার জল আসিয়া ক্রোশের পর ক্রোশ মাঠ-ঘাট পরিপ্লাবিত করিয়া দেয়—তখনকার অপরিসীম আনন্দের ক্ষণিক স্পর্শের মতই—এই দৃশ্য দৃষ্টিকে হয়ত মূর্চ্ছাতুর করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যই বা! বন্যার স্থায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে এই সৌন্দর্যবোধ আপনি মনের মধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে কতবার। প্রখর আলোক-মালাসজ্জিত প্রচুর অট্টালিকা ও যানবাহন সমাকুল কলিকাতাও কিছুদিন পরে হয়ত প্রথম দর্শনের ভাল-লাগার তীব্রতাটুকু হরণ করিয়া লইবে। তবু প্রথম দর্শনে শহরকে ভালবাসিলাম বৈকি!

ছ'টি জিনিসের প্রথমটি এই, সেদিন রাত্রিতে ঘুমাইতে পারি নাই। ঘুম যেন শহরের চোখে মানায় না। অথবা নবপ্রণয়ের রীতিতে নিদ্রা বুঝি চিরদিনই নির্ব্বাসিতা।....দ্বিতলের রম্যকক্ষে—সুখ-শয্যায় জাগিয়া জাগিয়া রাত্রির শহরকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম এ শহরে রাত্রি নামে নাই। আকাশে চন্দ্র নাই, পথের আলোগুলি শুধু উজ্জ্বল

হইয়াছে। পথের জনতা কমিয়াছে—কলরব কমে নাই। ট্রাম, বাস, রিক্‌শা, মোটর, সাইকেল ও লরীতে সারা রাত্রিকেই বুঝি সজাগ করিয়া রাখিবে। নূতন বিছানায় শীঘ্র ঘুম আসে না। শব্দ ও আলোর রাজ্যেও ঘুম ক্বচিৎ অনধিকার প্রবেশ করিয়া থাকে। এমন সমারোহময় রাত্রিতে ঘুম আসিবেই বা কেন? এ সমারোহ কি গ্রাম্য বারোয়ারী তলার যাত্রার আসরের চেয়ে কিছু কম? না, বিবাহ-বাড়ির কার্য্য-ব্যস্ততার চেয়ে কিছু মন্থর? পৃথিবীর এখানে এত সমারোহ যে আকাশের দিকে চাহিবার অবসরই মিলে না। একফালি ম্লান চন্দ্রের চারিধারে ততোধিক ম্লান কতকগুলি তারা। পৃথিবীর ঐশ্বর্য্যে আকাশ বুঝি ম্লান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং জাগিয়াই রাত্রি কাটিয়া গেল।

প্রভাতের পূর্ব্বে পাড়াগাঁ'র আকাশে বর্ণচ্ছটা দেখা যায়। শুকতারাটি দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে থাকে ও ডানা ঝাপ্‌টাইয়া পাখীরা প্রভাত-কাকলী সুরু করিয়া দেয়। গৃহস্থবধূর সম্মার্জ্জনী চালনা ও উঠানে গোবরজল ছড়া দেওয়ার শব্দ, বৃদ্ধ ঠাকুরমার গঙ্গাস্তোত্র ও সুপ্রভাত-বন্দনার সুর, কচি ছেলের কল কল ধ্বনি—এগুলি দ্বারাও পল্লী-প্রভাতের আগমনীধ্বনি স্পষ্টতর হইয়া উঠে। নিঃশব্দ রাত্রির একাগ্র সাধনার মধ্যেই নবরূপময় সুন্দর ও সুস্নিগ্ধ প্রভাতের নিত্য আবির্ভাব ঘটে।

এখানে বৃক্ষ শাখায় শুধু বায়সকুল কর্কশস্বরে ডাকিয়া উঠিল। খটাখট শব্দে কে যেন রাস্তার গ্যাসবাতি নিবাইয়া দিয়া গেল, ঘড় ঘড় শব্দে ময়লা-ফেলার গাড়ি রাজপথে আর্ত্তনাদ তুলিয়া ছুটিতে লাগিল, পাইপে করিয়া ছড় ছড় জলধারায় রাজপথ কাহারা ভিজাইয়া দিল। কোন্ দিকে পূবের আকাশ? প্রভাত-তারা কোন্ খানে জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিতেছে? এ শহরে নবাগতের হইয়া দিক্ নির্ণয় করিয়াই বা দিবে কে! সুদীর্ঘ প্রহরের মধ্যে যে রাত্রিকে প্রত্যক্ষ করি নাই—প্রভাতের

মুখে তিনি বুঝি আসিলেন। এই পাংশু অন্ধকারের মধ্যে—এই অনৈক্য-কর্কশ-কোলাহলের মধ্যে—ক্ষণকালের জন্য তিনি নাই বা আসিতেন!

ও-পাশের বাড়িতে সহসা কান্নার রোল উঠিল। মৃত্যু! মৃত্যুই বুঝি এই বিশ্রী ভোর বেলার সুযোগে—আলো নিবিবার সুযোগে কাহার প্রাণটুকু হরণ করিয়া লইয়া গেল? চোর চুপিসারেই আসিয়া থাকে। তাড়াতাড়ি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম। পাশেই যিনি শুইয়াছিলেন, তিনি একবার পাশ ফিরিবার কালে আমার পানে চাহিয়া আলস্যজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, আঃ, এত সকালে—উঠলেন কেন আবার! শুয়ে পড়ুন—শুয়ে পড়ুন।

বলিলাম, পাশের বাড়িতে কেউ মারা গেলেন বোধ হয়।

চক্ষু না চাহিয়াই তিনি তেমনি নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন, যাকগে শুয়ে পড়ুন। তথাপি আমার শুইবার লক্ষণ না দেখিয়া কহিলেন, একি আপনার পাড়াগাঁ—ছুটবেন মড়া ফেলতে! এ শহর—কে কার কড়ি ধারে? সব আপ্‌সে ঠিক হয়ে যাবে। ঘুমুন—ঘুমুন। না ঘুমুলে—জানেন না তো আপিসের ঠেলা!

কিছুক্ষণ পরে ও-বাড়ির ক্রন্দনের সঙ্গে এঘরের নাসিকাধ্বনি অদ্ভুতভাবেই মিশিয়া গেল। জাগন্ত রাত্রি আর নিস্পৃহ মৃত্যু প্রথম শহরে পা দিয়া—এই দু'টি জিনিস চিরদিনের বিস্ময় হইয়া আমার মনের মধ্যে বাসা বাঁধিল। পরে অবশ্য এই বিস্ময় কিছু কাটিয়াছে। রাত্রির রহস্য ও মৃত্যুর রহস্য কিছু উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে—কিন্তু সে কাহিনী পরবর্তী অধ্যায়ের।

২

প্রভাতটা সুন্দর না হইলেও—অসহ্য নহে। বর্ষাকালের মেঘ হাঁক-ডাক না করিয়া যেমন অতর্কিতে বৃষ্টি আনিয়া দেয়, কলিকাতার এই প্রভাতটিও তেমনি সহসা আসিয়া গেল। এমন সহসা আসিল যে তাহার অভ্যর্থনার আয়োজন সুসম্পূর্ণ হইল কিনা সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। শুধু কতকগুলি কর্কশ চীৎকারের দ্বারা—রাত্রিকে কাহারা জোর করিয়া সরাইয়া দিল, আমরাও শয্যা ত্যাগ করিলাম।

পাশের বাড়ি হইতে রোদনের করুণ ধ্বনি আর শোনা যায় না। শোককে চাপা দিবার ব্যবস্থা এ শহরে সুন্দর ভাবেই আছে।

গৃহসঙ্গী (রুমমেট) গাত্রোত্থান করিলেন। সুপ্রভাতের কামনা করিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। কিন্তু শয্যাত্যাগ করিবার কোন লক্ষণই প্রকাশ করিলেন না। মাথায় কোঁচার খুঁটটি তুলিয়া দিয়া অর্দ্ধাবগুণ্ঠিত প্রৌঢ়ার মত ঈষৎ মাথা দোলাইতে লাগিলেন। সেই শির সঞ্চালনের মধ্যে হয়ত প্রভাত-স্তোত্রের মৌন উচ্চারণ চলিতেছিল—চোখে কিন্তু তখনও অগাধ ঘুমঘোর। চাকর আসিয়া তত্ত্ব লইয়া গেল কি চাই? তিনি অস্ফুটস্বরে বলিলেন, আর কিছু পরে।

আমার পানে চক্ষু না চাহিয়াই বলিলেন, ভোর বেলাই হচ্ছে ভোগের ঘুম। ওই ঘুমটুকু ভাঙ্গালে কি সারাদিন শরীর বয়। তবে আপনারা হচ্ছেন—ইয়ং বেঙ্গল—আপনাদের কথা আলাদা।

বয়স তাঁহার হইয়াছে; মাথার চুল, বলিরেখাঙ্কিত মুখ, বাহুমূল ও গলদেশের শিথিল চর্ম্ম ও নিষ্প্রভ নয়ন দেখিয়া সেটুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। গায়ের রংটি সেকালে হয়ত কিঞ্চিৎ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ ছিল—এখন তামাটে হইয়াছে, মাথায় টাকের সুমসৃণ পরিসর ক্ষেত্র বিস্তৃত।

বার্দ্ধক্য আসিতেছে,—প্রাণ-সৌন্দর্য্যে ঝলমল করিয়া নহে, অসীম একটি ক্লান্তিতে শহর-প্রভাতের মতই—পাংশু রঙে দেহ ঢাকিয়া।

মুখ ধোয়া শেষ করিয়া চায়ের পেয়ালা ও সংবাদ পত্রের খোলা পাতা সম্মুখে রাখিয়া যখন সম্পূর্ণ জাগ্রত হইয়া বসিলেন, তখন বেলা আটটা বাজে। অট্টালিকার মাথা ডিঙাইয়া খানিকটা রৌদ্র সূর্য্যদেব ঘরের মধ্যে পাঠাইয়াছেন। কলতলায় ও স্নানান্তরে প্রবেশ-প্রার্থীরা সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়াছে। রান্নাঘরের কার্য্য সশব্দে পুরাদমে চলিতেছে। সমাজনীতি ও রাজনীতির সঙ্গে আপিসনীতি মিশিয়া একটা মিশ্রনীতির কলরব উঠিয়াছে। কোন নীতিই কাহাকেও কোনদিন স্পর্শ করিতে পারে নাই বলিয়াই, মনের আগুনে সেখানকার লেখাগুলি পাঠ করিবার আবশ্যক কেহ হয়ত বোধ করেন না। প্রথম শহরে আসিয়া অন্ততঃ আমার তো তাই মনে হইল। পাড়াগাঁয়ে আমরা কাজকে ভালবাসিতাম কথার চেয়ে। বোধ হয় ওর একঘেয়েমি হইতে পরিত্রাণ লাভের দ্বিতীয় পন্থা আর ছিল না বলিয়া। শহরে কথার হাউই ছুড়িয়া না মারিলে এর আকাশের সৌন্দর্য্য বুঝি খোলে না তেমন—তাই যতটুকু অবসর হাতে থাকে নানান চিন্তা ও সমস্যায় প্রপীড়িত মুহূর্ত্তগুলি তর্কের শাণিত অস্ত্র দিয়া টুকরা টুকুরা করিয়া তবেই না তৃপ্তি!

তবু ইহাদের কাজ আছে। কার্য্যক্ষেত্রে ছুটিবার তাড়া আছে। তখন শিথিল চরণের মন্থর গতি লইয়া কাজ চলে না, ক্লান্ত কণ্ঠের মধ্যে মৃতসঞ্জীবনীর বেগকে সঞ্চারিত করিতে হয়। এমন সে বেগ কলতলায় বা ক্ষেত্রান্তরে হয়ত বা ছোটখাট একটি সংঘর্ষই ঘটিয়া গেল! ঠাকুরের উপর গরম বাক্যবাণ বর্ষণ, চাকরকে অযথা আদেশদান, সহগৃহীর সঙ্গে উগ্র বচসা—ওবেলায় হয়ত অন্য রূপ ধারণ করিবে, কিন্তু এবেলায় কর্ম্মক্ষেত্রের হাউইয়ে দেহমন ঊর্দ্ধমুখী—অদম্য গতিবেগে সঞ্চারিত

ইচ্ছাগুলি ফাটিয়া আলোর ফুল ছড়াইয়া—খানিকটা বা শব্দ করিয়া গতির ছন্দটিকে ক্ষণিক উজ্জ্বলতায় ভরিয়া তুলিতে চাহে। ওবেলার কথা স্বতন্ত্র, স্তূপীভূত ভস্মের উপর দাঁড়াইয়া এবেলার ক্ষণমাত্র জীবনকেও স্মরণে রাখা যায় না। সদাপ্রসারিত শয্যায় দেহ এলাইয়া—ঢিমে তেতালায় আদেশ দান, স্থূল রসিকতার প্রলেপে দুপুরের কর্ম্মশ্রান্তি ও সকালের দ্বন্দ্ব নিরসনের চেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়। একটি দিনের মধ্যে আমি অন্তত এইটুকু বুঝিলাম, রাগ বা বিরাগ কোনটাই ইহাদের মর্ম্মান্তিক নহে। স্রোতে যেমন ফুল ভাসিয়া চলে তেমনি চলা, অথবা পদ্মপাতায় যেমন জলের দাগ ধরে না তেমনই নিস্পৃহতা—এই জীবন পাড়াগাঁয়েও হয়ত দেখিয়াছি, —কিন্তু এমন নগ্নভাবে তাহা চক্ষুকে আঘাত করে নাই। অথচ এই জীবনের মধ্যে উগ্র সুরার ক্রিয়া আছে, চেতনা হরণের ব্যবস্থা আছে—তীব্রতাকে চাপা দিবার নানারকমের আয়োজনও আছে। অদ্ভুত লাগে বৈকি! এবং সেই কারণেই কি মনোহরণ করিতেছে?

৩

অতুলদাই আমাকে চাকুরির আশ্বাস দিয়া শহরে টানিয়া আনিয়াছেন। জেলাশহরে স্কুল ও কলেজের গণ্ডি ছাড়াইয়া সবে বেকারত্বে পা দিব-দিব করিতেছি, এমন সময় পূজার বন্ধে অতুলদা গ্রামে আসিলেন। আসিয়াই প্রশ্ন করিলেন, সুপ্রিয়, কি করবি ঠিক করলি? পড়বি আর?

মাথা নাড়িতেই বলিলেন, জানি তো সব। কিন্তু বেকার বসে থাকা চলবে না। হয় পড়—নয় কাজে ঢুকে যাও, বসে বসে আড্ডা ইয়ারকির শ্রাদ্ধ করবে সেটি হবে না।

বলিলাম, আপনি যা বলছেন—তাতে মনে হয় কাজ যেন পড়ে আছে —হাতে করে তুলে নিতে যা দেরি।

আছে রে—স্টুপিড—আছে। যারা তুলে নিতে জানে—তারাই তা পায়, যারা নিতে জানে না, তারা আজীবন হা-হুতাশ করে মরে। তা ছাড়া—জানিস তো idle brain—

জানি। সয়তান যাদের মাথায় বাসা বাঁধে—তাদের মগজের গড়ন শুধু আলাদা নয় অতুলদা, ওর মাল মশলাও আলাদা।

'ভেরি গুড'। কালীপূজোর পর আমার সঙ্গে শহরে যাবি। তারপর দেখা যাক কাজের ঘানি গাছে তোকে জুড়ে দিতে পারি কি না!

এত অল্প বয়সে ঘানি গাছে জুড়ে দিলে মা যে দুঃখু করবেন।

করুন দুঃখু। পরে কিন্তু আমাকে আশীর্ব্বাদ করবেন।

আজই বোধ একটা ইণ্টারভিউ দিবার কথা ছিল। অতুল-দা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, এই মাটি করেছে! এখনও তোর কাপড় ছাড়া হয়নি?

এই যে চট্ করে মুখটা ধুয়ে এসেই—

মুখটাও ধুসনি! হারে—কপাল, ক'দিনের বেকারত্ব তোকে এমনি করেই মাটি করেছে! নাঃ, তোর দেখছি কোন আশাই নেই!

ধপাস করিয়া পাশের তক্তাপোষে অতুল-দা বসিয়া পড়িলেন। নরেন-দা সবে মাত্র শয্যা ত্যাগ করিয়া মাথায় কাপড়টি টানিয়া দিয়া দুলিতে সুরু করিয়াছেন। তক্তাপোষ নড়িয়া তাঁহার তন্দ্রাজড়িত আলস্যকে রূঢ় আঘাত করাতে তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বলিলেন, আ, সকাল-বেলায় একটু স্থির হতে পার না! ঠাকুর দেবতার নামগুলো—

অতুলদা হাসিয়া বলিলেন, ঠাকুর দেবতাকে ধরা সোজা নাকি নরেন-দা! সকালবেলায় ব্রহ্মাণ্ডশুদ্ধ লোক ওঁদের ডাকে—স্থির থাকবেন কোথা থেকে?

বিরক্তিভরে নরেন-দা বলিলেন, ওঁদের কথা বলিনি, তোমার কথা বলছি।

আরে, ওঁরা চঞ্চল হ'লে আমরা কেমন করে স্থির থাকি বলুন ত?

ডেঁপোমি করোনা। ইস্কুলে মাস্টারি কর—না, ডেঁপোমি করে ছেলেগুলোর মাথা খাও! যেমন হ'য়েছে ইস্কুল! বছরে ন'মাস ছুটি, খালি পয়সা লুটবার কল!

অতুল-দা হাসিয়া আমাকে তাড়া দিলেন, এই স্টুপিড, দাঁড়িয়ে রইলি যে?

নরেনদার সঙ্গে অতুলদার আর কি বচসা হইয়াছিল, জানি না। আসিয়া দেখি, নরেন-দা গম্ভীর মুখে দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরাইয়া অনুচ্চ কণ্ঠে স্তোত্র আবৃত্তি করিতেছেন, অতুল-দা সকালের কাগজখানা উল্টাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, মাটি করেছে! একি তোর পাড়াগাঁ, যে যাচ্ছি যাব—খাচ্ছি খাব! এখানে চলনে—বলনে—পোষাকে পরিচ্ছদে খাওয়ায় রীতিমত স্মার্ট হতে হবে। দেখছিস না পথে ক'টা গরুর গাড়ি আর কতগুলো মোটর। এই কি কাপড় পরা হলো! জামাটি হাঁড়ি কলসীর ভেতর রাখা হয়েছিল বুঝি? উঁহু, ওসব চলবে না। বার কর কাপড় জামা।

জামা তো আর নেই, অতুলদা।

নেই! তাহ'লেই তোমার চাকরি হয়েছে! এই বেশে গেলেই পত্রপাঠ বিদায়। একটু ভাবিয়া অতুল-দা বলিলেন, বুঝেছি, বেকার হ'লেই স্রেফ্ মাটিয়ে যায় বাঙ্গালীরা। আচ্ছা—আয় আমার ঘরে। চলিতে চলিতে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, কত ছাতি তোর? ছত্রিশ? সাড়ে চৌত্রিশ? ওর বেশি ছাতি বাঙ্গালীর হয় নাকি?

অল্‌রাইট। আমার জামা একটা তোর গায়ে হলেও হতে পারে। বত্রিশ ছাতি হলেও ঢল্‌ঢলে জামাটাই আমি পছন্দ করি।

অতুলদাই সাজাইয়া দিলেন। চুলে ব্রাশ করিয়া অবাধ্য চুলগুলিকে পিছন দিকে ঠেলিয়া দিলেন। তৎপূর্ব্বে খানিকটা লাইমজুস্ গ্লিসারিন মাখাইয়া সেগুলি অনেকটা নরম ও চক্‌চকে করিলেন। কাঁধের কাছে সার্টের কলারটি উল্টাইয়া দিলেন, ধুতির কোঁচা পা পর্য্যন্ত ঝুলাইয়া দিলেন। শুধু তালিমারা জুতাটাকে কালি মাখাইয়াও কায়দা করিতে পারিলেন না। বুকের ছাতি আর পায়ের পাতা সমান বাধ্য নহে। কাজেই—সামান্য আধ ইঞ্চির তারতম্যে সেখানকার ত্রুটি সারিয়া লওয়া কঠিন।

কোন উপায় নাই বলিয়াই হয়ত এক মিনিট আমার পায়ের পানে চাহিয়া মাথা নাড়িয়া বলিলেন, থাক, কোন রকমে চালিয়ে নিবি, বুঝলি? বেশ করে বাঁ হাতের মুঠোয় কোঁচাটি একটু মেলিয়ে দিয়ে জুতো পর্য্যন্ত ঢেকে রাখবি। খবরদার পেছন ফিরবিনে ওঁদের দিকে। জুতোটাই দেখে কিনা। ওতে অনেক চাল-বেচাল ধরা পড়ে।

চাকরি করিতে চলিয়াছি, না বিবাহের উমেদারি করিতে যাইব ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। শহরের হালচাল সম্বন্ধে অতুল-দা যেমন ওয়াকিবহাল—আর শহরকেও যেমন দেখিতেছি সাজসজ্জায় ফিট্‌ফাট তাহাতে আমার কথা না কহাই উচিত। নরেনদার স্তোত্র আবৃত্তি শেষ হইয়া গিয়াছিল, তাড়াতাড়ি প্রণামটা সারিয়া আমাদের পানে ফিরিয়া তিনি পরিহাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, ভায়াটিকে যা বর সাজিয়ে নিয়ে চলেছ, চাকরি-কনের পছন্দ না হ'য়ে যায় না।

অতুলদা হাসিমুখে কহিলেন, সেই আশীর্ব্বাদই কর দাদা। তোমাদের বাপমায়ের আশীর্ব্বাদে আজ পর্য্যন্ত তো কোথাও বিফল মনোরথ হইনি। পায়ের ধুলো নে, সুপ্রিয়, দাদার পায়ের ধুলো নে।

অতুলদা মিথ্যা বলেন নাই। এই প্রাসাদে পা দিবার যোগ্যতা থাকা চাই। যোগ্যতার বিচার বাহির দেখিয়া যেমন অনায়াসে করা যায়, ভিতরের বস্তু বাহিরে আনিতে হইলে তেমনি পরিশ্রমের দরকার। বিদ্যার একটা মান বিশ্ববিদ্যালয় বাঁধিয়া দিয়াছেন, সেইটুকু পরিচয়ই ছেলে পড়াইবার পক্ষে যথেষ্ট। গ্রাজুয়েটের আবার ভেদাভেদ কি! রাজার ছাপমারা দশ টাকার নোটগুলি যেমন পুরাপুরি দশটি টাকাই প্রসব করে, তেমনি ছেলের অভিভাবকেরা জানেন, ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রকে উৎরাইয়া দিবার পক্ষে বি, এ, ডিগ্রিটার যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। তবে ওই ডিগ্রি থাকার সঙ্গে চালটা যদি বজায় থাকে তো—সোনায় সোহাগা।

নীতিশবাবুর বাড়িটি যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি প্রকাণ্ড হলঘরটা। প্রকাণ্ড ক্লকের নীচেয় প্রকাণ্ড আরসী বসানো—পায়ের পাতা হইতে মাথার চুল দেখা গিয়াও খানিকটা জায়গা ফাঁক থাকে—মাথার উপর প্রকাণ্ড একটি পাগড়ী থাকিলেও সেটির সবটুকুরই প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিবার কথা। সবুজ বনাত মোড়া প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলটার উপর কাঁচের পাল কাটা দোয়াত। কলমদানটা ময়ূরের পেখম-ধরার মত দোয়াতের মাথা ঠেলিয়া উঠিয়াছে। তাহার খাঁজে খাঁজে কত রঙের ও ঢঙেরই না কলম পেন্সিল সাজানো। তার পাশে পাঁশুটে রঙের অ্যাশট্রে। যেন একটা ছোটখাটো কাছিম মুখ থুবড়াইয়া টেবিলের উপর পড়িয়া আছে। গদি আঁটা পিঠ উঁচু চেয়ারগুলি দৈর্ঘ্যে ও উচ্চতায় দশাসই। আর ঘরের দেয়ালে যে বিচিত্রবর্ণের অয়েল পেন্টিংগুলি টাঙানো আছে—তাহার পরিচয় আমার জানিবার কথা নহে, এই বাড়ির উত্থান পতনের

ইতিহাসের সঙ্গে একদা তাঁহারা জড়িত ছিলেন—আজ স্বর্গীয় বলিয়াই দেওয়াল-বিলম্বিত হইয়া শোভা পাইতেছেন। আর কিছু আমার চোখে পড়িল না ; শুধু প্রকাণ্ড গৌরবর্ণের মাংসস্তূপ আমার সমস্ত দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়া বিস্ময়কে ঘনীভূত করিয়া দিল।

মাংসপিণ্ড হাসিলে গালের মাংস ঠেলিয়া উঠিয়া চোখ দু'টি ডুবাইয়া দেয়, মাংসপিণ্ড হাঁ করিলে এমন চিকণ ক্লান্তধ্বনি বাহির হয়—যাহা শুনিয়া পুতুল-বাঁশীর আওয়াজটাই মনে পড়ে।

নমস্কার অতুল-মাস্টার।

নমস্কার মিঃ দাশ। কেমন আছেন ?

আর কেমন ! কবিরাজের ওষুধ দু'বেলাই চলচে—ফল তেমন পাচ্ছি কৈ ?

বলেন কি ! এই তো সেদিন বললেন—আধপাউণ্ড কমেছেন।

সেকি আর কমা ! পরশু দেখলাম—আরও এক পাউণ্ড বেড়ে গেছি।

লেবুটা বুঝি বেশি করে খাচ্ছেন না ?

দিন আটটা-দশটা লেবু, এক থলো আঙ্গুর, পেয়ারা, আপেল—ভাত খাওয়া তো একদম ছেড়েই দিয়েছি মাস্টার। ইচ্ছে করে একটু মাংসের ঝোল দিয়ে চারটি ভাত—

সর্ব্বনাশ, মাংস খাওয়া একদম নিষেধ যে !

তাইতো খেতে ইচ্ছে করে। মাংস না খেয়েও যখন মাংস-বৃদ্ধির কামাই নেই—

না, না, না, ওইটি করবেন না। আপনাদের মূল্যবান জীবন।

মাংসস্তূপ মাথা নাড়িয়া হাসিয়া উঠিলেন। চিবুক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত মাংসপিণ্ডে তরঙ্গ জাগিল। কহিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির মিটিঙে অ্যাটেণ্ড করবার জন্য পরশু কলকাতা ছাড়তে হবে,

অথচ আজ পর্য্যন্ত রিপোর্টটি ঠিক হ'লো না। সঙ্গে সঙ্গে বিরাট হস্তে কলিং বেলে ধাক্কা দিলেন। কলিং বেলটা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেই শশব্যস্তে একজন চাপরাসী প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

সেক্রেটারিবাবুকো সেলাম দো। চাপরাসী চলিয়া গেলে আমাদের পানে ফিরিয়া কহিলেন, এদের দায়িত্বজ্ঞান বড় কম। কতকগুলো বাংলা রিপোর্ট লেখার কাজ যদি না থাকতো—একজন য়ুরোপীয়ান সেক্রেটারিই রাখতাম।

অতুলদা তাঁহার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিলেন, এক কাজ করুন না মিঃ দাশ। বাংলা লেখার জন্যে একজন বাঙ্গালীকেই রাখুন না।

দাশ হাসিলেন, তা'হলে কাজের সুবিধে হয় বটে, তবে কি জানেন, নেহাৎ কংগ্রেসে নামটা লিখিয়ে ইংরেজ সেক্রেটারি রাখব!

রাখলেনই বা। ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের তো বিবাদ নেই। বিবাদ শুধু প্রিন্সিপ্‌ল নিয়ে। মহাত্মা গান্ধী তো কতবার বলেছেন—

তা হ'লেও—বুঝছেন না—ওটা না থাকাই বাঞ্ছনীয়। সত্যি কথা বলতে কি যাদের সাম্রাজ্যবাদের আমরা প্রতিবাদ করি—মন থেকে তাদের ওপর বিদ্বেষ সত্যি সত্যিই কি মুছে ফেলতে পারা যায়!

কিন্তু মহাত্মা বলেন—

বাধা দিয়া মিঃ দাশ বলিলেন, জানি। কিন্তু আমরা মহাত্মা হ'তে পারছি কৈ? আগে সমান না হ'লে ভালবাসা দিতে যাওয়াটাও কেমন যেন খোসামুদি বলে বোধ হয় না কি। আমরা তাদেরই ভালবাসতে পারি—যাদের সঙ্গে এক লেবেলে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারি। নয় কি?

অতুলদা বলিলেন, সেতো বটেই। এমন সময় সেক্রেটারি আসিয়া

পড়াতে মিঃ দাশ সেই দিকে মনঃসংযোগ করিলেন। রিপোর্ট লেখা আপনার শেষ হ'লো? দেখি।

কাগজে চোখ বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, এঃ, যা আমি নোট করে দিয়েছিলাম সবগুলো পয়েন্ট যেন টাচ্ করেন নি মনে হচ্ছে। আছে নোটের কাগজ খানা?

এই যে সার। পকেট হইতে একটা নীলরঙের চিরকুট বাহির করিয়া তিনি দাশের হাতে দিলেন।

হু—আইন সভায় প্রবেশের যুক্তিগুলো আর একটু স্পষ্ট আর বিশদ হওয়া দরকার। সবাইকে বোঝাতে হবে তো?

তাহলে—আর একবার—

না, না, বাদসাদ দিতে হয় আমিই দেব'খন। হাঁ, ভাল কথা, কর্পোরেশনের গেল মিটিঙের মিনিটস্ শীটগুলো একবার দেখতে চাই, পাঠিয়ে দেবেন।

এখনই দিচ্ছি সার। প্রায় লম্ফ দিয়া সেক্রেটারি কক্ষত্যাগে উদ্যত হইলেন। মিঃ দাশ বলিলেন, আর শুনুন, আজকালের মধ্যে কোথায় কি এনগেজমেণ্ট আছে তার লিষ্টটা—

আজ্ঞে সে আমার মনে আছে। আজ বিকেল সাড়ে পাঁচটায়—স্বদেশ-সেবক-সমিতির একটা ভ্রাম্যমান পাঠাগারের উদ্বোধনী-সভা আছে। ছোট্ট করে একটা বক্তৃতা লিখে রেখেছি। সন্ধ্যা সাতটায়—মদন-মোহন ক্লাবের বার্ষিক অধিবেশনে নিমন্ত্রণ। রাত আটটায় শ্যামবাজার রিক্রিয়েশন ক্লাবের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভা। আর—

আরও আছে! বলিয়া গর্ব্বোৎফুল্ল দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিলেন।

আজ্ঞে—আজ আর নয়। কাল সকালে—

কাল শুনব—কাল শুনব। চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলাইয়া দিয়া ক্ষীণ ক্লান্তস্বরে বলিলেন, আর পারি না। এই শরীর!

সেক্রেটারি নিঃশব্দে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। অতুলদা খানিক থামিয়া বলিলেন, আজ তাহ'লে আমরা উঠি।

সহসা তিনি সোজা হইয়া বসিয়া কলিং-বেলে ঘা দিলেন। সেই আর্ত্তনাদে চাপরাসী ছুটিয়া আসিল। মিঃ দাশ চায়ের হুকুম দিলেন। পরে আমাদের পানে ফিরিয়া কহিলেন, সকাল বেলায় চা না খাইয়ে ছেড়ে দিলে—আমার নিন্দে করে বেড়াবেন তো।

অতুলদা হাসিয়া বলিলেন, আপনার নিন্দে করে আমরা কি কুলিয়ে উঠতে পারব!

প্রসন্ন উচ্চহাস্তে ঘর ফাটাইয়া চিবুকের মাংসস্তূপ নাচাইয়া মিঃ দাশ বলিলেন, বটে, বটে! হাসি থামাইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, এঁকে তো—

কাল যে প্রাইভেট টিউটরের কথা বলছিলেন—

ও, হাঁ। আমার আপাদমস্তকে দৃষ্টি বুলাইয়া কহিলেন, নামটা কিন্তু ভুলে গেছি।

আমি সসম্ভ্রমে কহিলাম, সুপ্রিয় রায়

সুপ্রিয়? বেশ নাম। এমন নাম সচরাচর শোনা যায় না। কি বলেন অতুলবাবু।

অতুলদা বলিলেন, ওর বাবা এককালে সাহিত্যচর্চ্চা করতেন, তাই ছেলেদের নামেও সাহিত্যের গন্ধ কিছু আছে।

আপনি? আপনি কিছু লেখেন টেখেন নাকি? বলিয়া সাগ্রহে মিঃ দাশ আমার পানে চাহিলেন।

আরক্তমুখে জবাব দিলাম, না।

না! বিস্ময়ে মিনিটখানেক নিরুত্তর থাকিয়া মিঃ দাশ আর একবার আমার সর্ব্বাঙ্গে দৃষ্টির সন্ধানী-আলো ফেলিয়া প্রশ্ন তুলিলেন, বলেন কি? সাহিত্যিকের ছেলে হ'য়ে কিছু লেখেন নি! একটা গল্প, কি একটা প্রবন্ধ কিংবা নিদেনপক্ষে একটুকরো কবিতাও?

তাঁহার প্রশ্নের ধরণে হাসি আসিল। কিন্তু সেটা অশোভন হইবে বলিয়াই ঠোঁটের কোণ চাপিয়া ধরিয়া সে হাসি দমন করিলাম। মুখে শুধু বলিলাম, না।

অথচ এমন চেহারা! তিনি অতুলদার পানে ফিরিলেন।

অতুলদা বলিলেন, জানেন তো, ভাবনা থাকলে ওসব কবিতাটবিতা বেরয় না। দারিদ্র্য-দোষ—গুণরাশি নাশি।

উহুঁ—আপনার এ কথায় আমি সায় দিতে পারলাম না অতুলবাবু, তাহলে কালিদাস জন্মাতেন না, মাইকেলও না, মিল্টনও না।

অতুলদা বলিলেন, হাঁ, দারিদ্র্য আর সম্পদ দু'টো জিনিসই হচ্ছে প্রতিভার বাহন। তবে একটিতে কষ্ট করে আগুন জ্বালাতে হয়—আগুন জ্বলবার আগেই প্রতিভা হয়তো পুড়ে কয়লা হ'য়ে গেল—

না, আগুনের ধর্ম্মই হ'লো জ্বলা। দারিদ্র্য বা সম্পদ যাই হোক, আগুন জ্বলবেই। দারিদ্র্যের অপচয় আর সম্পদের অপচয় সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের অতুলবাবু। দারিদ্র্য প্রতিভাকে উজ্জ্বল করে, সম্পদ বরং ম্লান ক'রে দেয়।

তাই বা হবে কেন?

তাই যে হয়। একটু প্রশংসা যার প্রাপ্য অনেকখানি স্তুতি তাকে নামায় বৈকি। ওইখানেই তো প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটে।

কিন্তু অনেকখানি স্তুতি যার প্রাপ্য—একদম প্রশংসা না পেলে সে জিনিসও তো নিবতে পারে।

উহুঁ, তবে আর সাধনা কিসের। সাধনা ফলাফলের অপেক্ষা রেখে আরম্ভ হয় বটে, কিন্তু ফলাফলকে অতিক্রম করতেও তার বেশি সময় লাগে না।

অতুলদা আর কথা কহিলেন না। অর্থাৎ চা আসিয়া পড়াতে তর্কের জের টানিবার সুবিধাও রহিল না। চা পানের সঙ্গে সঙ্গে আলোচনারও মোড় ফিরিল। আগামী কংগ্রেস-অধিবেশনের কথা হইতে লাগিল। মিঃ দাশের অভিজ্ঞতা বহুমুখী। যে কোন বিষয় লইয়া অনর্গল তর্ক চালাইতে পারেন বহুক্ষণ। মাংসপিণ্ডের স্তূপ প্রথম দর্শনে মনকে কৌতুক-রসাবিষ্ট করিলেও, বিদায়ের পূর্ব্বক্ষণে সম্ভ্রমের একটি কোমল কিরণে মনকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল বৈকি।

চাকরির কথা পাকা করিয়াই তবে অতুলদা উঠিলেন।

৫

একটা কথা ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গিয়াছিলাম। মিঃ দাশের লোকচরিত্র সম্বন্ধে কতখানি অভিজ্ঞতা ছিল জানিনা, কিন্তু প্রথম দৃষ্টিপাতে আমাকে লেখক বলিয়া না-জানায় যে মিনিটব্যাপী বিস্ময়ে তিনি অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন—সে বিস্ময়ে তাঁহার কিছু অভিজ্ঞতার পরিচয়ই আমি পাইলাম। পিতার সাহিত্যিকখ্যাতি ছিল ; ছেলেবেলা হইতে সম্মুখে সুপেয় সলিল দেখিয়া পিপাসার ধর্ম্ম কে ভুলিতে পারে? সুতরাং স্কুলে পড়িবার কালে লুকাইয়া কবিতা লেখার অভ্যাস আমারও ছিল। কবিতার পর গল্প লেখায় পাইয়া বসে, তারপর প্রবন্ধের ভূত। এই নিষিদ্ধ চর্চ্চার কথা জানিত শুধু সতীর্থবৃন্দ। ক্লাসে ডিবেটিং ক্লাবে আমার যশ ছিল এবং প্রধান পণ্ডিতমহাশয়ের কাছে বাংলা রচনায় আমি বেশি

করিয়াই নম্বর পাইতাম। তখন অবশ্য সেই কৃতিত্বে আমার মাটিতে পা-না-পড়ার অবস্থা যে দেখা দেয় নাই—এমন কথা বলিতে পারি না, কিন্তু গোপন সেই পা-ফেলার শব্দটি স্কুলসীমানা অতিক্রম করিয়া গৃহসীমানায় প্রবেশ করে নাই। বাবা জানিলে খুশী হইতেন কিংবা প্রহার দিতেন জানি না, তবে তাঁহাকে জানাইবার মত মনোবল আমার ছিল না। পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডিতে এই চর্চ্চা যে একটা অনিয়ম সেটা সেই বয়সেই হয়তো বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলাম। কিন্তু যে-লেখায় পণ্ডিতমহাশয় খুশী হইয়া নম্বর পুরা দিতেন—সে রচনার গৌরব আজকাল করিতে পারি না। সেই বঙ্কিম-রবীন্দ্র ভাষার মণিমাণিক্য দিয়া প্রবন্ধকে সুরসাল ও সুসমৃদ্ধ করিতে আজকাল কেমন সঙ্কোচ বোধ করি। কাশ্মিরীশালের কারুশিল্পে যাঁহাদের নৈপুণ্য, দেবী বীণাপাণিকে সমৃদ্ধতর করিবার সাধ্য তাঁহাদের অনায়াসলব্ধ। দেবীর পায়ে পদ্ম ফুল দিবার সামর্থ্য না থাকুক, কয়েক গাছি দুর্ব্বাও যদি আগাইয়া দিতে পারি—তাহাতেই জীবনকে ধন্যজ্ঞান করিব। আসল জিনিস যে শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা—ছেলেবেলার আড়ম্বরপ্রিয়তার স্ফীতিতে তা চাপা পড়িয়াছিল। তাই সামান্য সাহিত্য-সেবার গোপন ইতিহাসটুকু মিঃ দাশের গোচরীভূত করিতে আমার কর্ণমূল আরক্ত হইয়াছিল। লজ্জায় সাহিত্য-প্রীতিটুকু শুধু অস্বীকার করিয়াছিলাম।

মিঃ দাশের বিস্ময়ই আমার নিবন্ত সাহিত্য-স্ফুলিঙ্গকে ঈষৎ উদ্দীপ্ত করিয়া দিল। চেষ্টা করিলে—আমিও কি লেখক হইতে পারি না? সাহিত্যিকের পুত্রের সাহিত্যিক না হওয়াটাই অন্যায় বা আশ্চর্য্য। পারিপার্শ্বিকে মানুষের নূতন করিয়া হইয়া-উঠার কথাই শোনা যায়, বংশগত ধারারও একটা দাবি আছে। সে দাবিকে অস্বীকার করিবার সামর্থ্য আমার কোথায়?

অপরাহ্ণে বেড়াইয়া ফিরিতেছিলাম। অতুলদা সঙ্গে ছিলেন না। মেসের প্রবেশপথে—সেই বাড়িটা অতিক্রম করিতেছিলাম। ওই বাড়িটার দ্বিতলের একখানি কক্ষ—আমাদের কক্ষের একেবারে মুখোমুখি। সেই কক্ষের উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া কাল সকালের মৃত্যুবার্ত্তা আমার কক্ষকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। কাল সকালের খানিকক্ষণ সেই শোকবার্ত্তা মনের অনেকখানি দখল করিয়াছিল, আজ সকালে সেই ব্যথার বাষ্পমাত্র কোথাও ছিল না। কক্ষ কাঁপাইয়া ও শব্দ তুলিয়া অতিকায় বাস ও ট্রাম এমন অবিশ্রান্ত যাওয়া-আসা করিতেছে—যাহাতে মনের কোমলতম বৃত্তিগুলিকেও রক্ষা করিবার নিভৃততম স্থানই বা কোথায়? শব্দ শুধু রূঢ় আঘাত করিতেছে কর্ণপটহে, মন নিস্পৃহ হইয়া পড়িতেছে। তা ছাড়া, অন্ন-সংস্থানের একটা ব্যাকুল আশা—মনেও ছিল না ওই পাশের বাড়ি হইতে উত্থিত করুণ ধ্বনিতে কাল সকালের খানিকটা আমার বিস্বাদ হইয়া গিয়াছিল।

অসমতল গলিটা আলো-আঁধারি। পার হইবার কালে খুব দ্রুত চলা যায় না। একটু হাতড়াইয়া—একটু থামিয়াই অতিক্রম করিতে হয়। সেইভাবেই অতিক্রম করিতেছিলাম।

শুনছেন! ও মশাই—

উৎকর্ণ হইয়া দাঁড়াইলাম। আমাকে আবার ডাকিবে কে? এই শহরের সদ্য অতিথি আমি, একগাছি তৃণের সঙ্গেও আমার পরিচয় নাই—আমাকে আবার ডাকিবে কে?

একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে ছুটিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, আপনি তো এই পাশের বাড়িটায় থাকেন? আমায় ঘাড় নাড়িতে দেখিয়া সে বলিল, একখানা গাড়ি ডেকে দেবেন? আমরা ভবানীপুর যাব।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার বাবা কোথায়?

ছেলেটির কণ্ঠস্বর কেমন হইয়া আসিল, কহিল, বাবা তো কাল মারা গেছেন।

আলো-আঁধারি গলিটা আমায় প্রতারণা করিয়াছে; ছেলেটির পরণে সাদা থান কাপড়খানা এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই! মৃত্যু-প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিলাম, ভবানীপুর তো অনেক দূর। তোমরা চিনে যেতে পারবে?

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া বলিল, মাসিমার বাড়ি তো আমরা দু'একবার গেছি। কাগজে নম্বর লেখা আছে—কাউকে দেখালেই বলে দেবেন।

সন্ধ্যে হ'য়ে আসছে খোকা, কাল যেয়ো।

না, মা বললেন, আজই যেতে হবে। আপনি তো জানেন না, আমাদের বাড়িওয়ালাটা ভারি দুষ্টু। এমন সব কথা বলে!

কেন বলে?

ভাড়া পাবে কিনা—তাই। সবাইর কাছ থেকেই তো পাবে, তবু আমাদের যা তা বলে। বাবার অসুখ বলেই না ভাড়া বাকি প'ড়ে গেল। তাইত মাসিমার ওখানে—

খোকা। চাপা অথচ কঠিন কণ্ঠে—কে দুয়ারের ওপাশ হইতে ডাকিল। ছেলেটি সেইদিকে অগ্রসর হইয়া কহিল, ইনি বলছেন—কালকে গাড়ি ডেকে দেবেন।

আমরা যে আজই যাব, খোকা।

একটু অগ্রসর হইয়া কহিলাম, আর একটু পরে অন্ধকার আসবে। ঠিকানা জানলেও পথ চিনে বাড়ি বা'র ক'রতে পারবেন

কিন্তু আমায় যে যেতেই হবে। একটু থামিয়া বলিলেন

বড় ছেলে বেঁচে থাকলে তোমারই বয়সী হ'তো, তোমার

লজ্জা করব না, বাবা। আমার আজ সেখানে না গেলেই ন

বুঝেছি। আমি গাড়ি ডেকে আনছি।

তিনি আমাকে পিছন দিক হইতে ডাকিয়া বলিলেন, থার্ডক্লাস গাড়ি এনো, বাবা। যত কম ভাড়া হয়।

তাই আনব।

ফিরিয়া আসিয়া বলিলাম, আপনারা তৈরী হ'য়ে নিন।

তিনি ছেলেটির হাত ধরিয়া গলির উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন ও মৃদুস্বরে বলিলেন, আমরা তৈরী হ'য়েই এসেছি।

একটা কথা। আমি যদি আপনাদের সেখানে পৌছে দিই, কিছু আপত্তি আছে ?

আপত্তি! অবগুণ্ঠন নামাইয়া তিনি আলো-আঁধারি গলিতে আমার মুখের পানে চাহিলেন। একটু থামিয়া বলিলেন, আপত্তি কেন থাকবে বাবা, এতো আমার ভরসার কথা। তোমার অসুবিধে না হ'লেই হ'লো। কথাতে কৃতজ্ঞ অন্তরের খানিকটা যেন ধরা পড়িল।

তাহ'লে এক মিনিট অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

ফিরিয়া আসিতেই বলিলেন, তোমার নামটি কি বাবা ?

নাম বলিলাম।

কোন্ আপিসে চাকরি কর, বাবা ?

চাকরি তো করিনে, চাকরির চেষ্টায় এখানে এসেছি।

তাই বল। একটা যেন বড় সমস্যার সমাধান হইল—এমনভাবে কথাটি বলিয়া তিনি গাড়িতে আসিয়া বসিলেন। কোচবাক্সে উঠিতে-[illegible]লাম বাধা দিয়া বলিলেন, ভেতরে এসে বস, আমার কাছে আবার [illegible] কিসের ?

[illegible] গ্যাসের আলোয় তাঁহাকে দেখিলাম। কত বয়স অনুমান [illegible]ধ্য। দুঃস্থ কেরানীবধূর বয়স—প্রথম যৌবনের তটভূমি

হইতে ঈষৎ হেলিলে অনুমান করা রীতিমত প্রত্নতত্ত্বেরই বিষয়। বর্ষার অপরাহ্ণ ও গোধূলির তফাৎ খুব বেশি স্পষ্ট নহে। আলোয় যে রং দেখা গেল—তাহাতে বর্ণবিভ্রমই জন্মায়। সদ্য-বৈধব্যের চিহ্নস্বরূপ সাদা পাড়ের কাপড়খানি—দেহে খুব বেমানান হয় নাই। সীমন্তিনীর সৌভাগ্যলালিত চেহারা আর কয়জনেরই বা মানায়? তাঁহার চেহারায় মাতৃমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করিলাম না, কণ্ঠস্বরে মাতৃস্নেহকে যেন একটুখানি স্পর্শ করিলাম। দূর গ্রামে প্রবাসী পুত্রের উপার্জ্জনের মুখ চাহিয়া যে মা অগণ্য খ্যাত বা অখ্যাত দেবদেবীর পূজা মানত করিয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে দিন গণনা করিতেছেন, দুঃখের কুয়াশার বাষ্পভরা পরদাখানি সেই মায়ের অন্তর হইতে উঠিয়া এই মায়ের অন্তর পর্য্যন্ত যেন এই মুহূর্ত্তে প্রসারিত হইয়া গেল। আমরা দুঃখের মধ্যে লালিত বলিয়াই দুঃখ-উত্তাপে গাঢ় স্বরের কম্পনে মাতৃ-মহিমার আস্বাদ পাইয়া বিগলিত হইতে আরম্ভ করি। না হইলে, পরের গরজ বহিয়া শহরের সন্ধ্যাকে সম্মুখীন করিয়া অজানা ভবানীপুরের পথে পা বাড়াইব কেন?

থার্ডক্লাস গাড়ির আর্ত্তনাদে গল্পকে বাঁচাইয়া রাখা দুষ্কর। তবু গল্প চলিতে লাগিল। ছেলেটি যেটুকু কাহিনীর যবনিকা তুলিয়া ধরিয়াছিল, জননী সেটুকু সংক্ষেপে শুধু সম্পূর্ণ করিলেন। চিরন্তন দুঃখের কাহিনী। আস্বাদ তার নূতন নহে, ঘটনা সমাবেশেও সে কাহিনী বিচিত্র নয়। কেরানীর জীবন বাদুলে পোকার জীবন। আরম্ভের ইতিহাস সমাপ্তির ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি। মাঝখানে এক বেলাকার জীবন—কিন্তু কতটুকু সে জীবন—কত সঙ্কীর্ণ—বর্ণহীন, আলোহীন, শোভা- একঘেয়ে জীবন,—ত্রৈরাশিক অঙ্কের নির্ভুল উত্তরের মত পরিং কাহিনীতে কাহার মনোযোগই বা আকৃষ্ট হইতে পারে? দাঢ়

পর দাসীর স্থান লইয়া জগতের কাহারো মাথা ব্যথা নাই। সে যেন স্বনিয়মে দুঃখচক্রের গণ্ডিতেই আটকাইয়া পড়ে। যা স্বাভাবিক, তাহা লইয়া প্রশ্ন উঠিবে কেন?

অনেকখানি পথ ভবানীপুর। যে পথ দিয়া আমাদের থার্ডক্লাস ঠিকাগাড়িখানি সশব্দে অতিক্রম করিতেছে—সে পথের দু'ধারের সমৃদ্ধির চাপে গাড়ির মধ্যেকার দুঃখ অঙ্কুরিত হইবার অবসর পাইতেছে না। পিচবাঁধানো এমন প্রশস্ত ও মসৃণ রাজপথ—বিদ্যুতের আলো পিছলাইয়া পড়িতেছে সেই পথে। নিঃশব্দে পিছলাইয়া যাইতেছে—কত রকমের চক্‌চকে মোটর। ময়দানের কোল ঘেঁষিয়া ট্রাম ছুটিতেছে বলিয়া ঘর্ঘর আওয়াজটা এখানে কম, পথের প্রসাদে বাসের আর্ত্তনাদও তেমন কর্ণ-বিদারক নহে। রিক্‌শর ঠুন্ ঠুন্ ঘণ্টাধ্বনি ও ব্রুহাম ফিটনের অতিকায় অশ্বের কদমে পা-ফেলার শব্দ প্রশস্ত রাস্তার বুকে বাদ্যযন্ত্রের মতই মধুর লাগিতেছে। সবশুদ্ধ মিলিয়া একটা প্রচণ্ড গতি। প্রচণ্ড অথচ নিঃশব্দ। গতির যদি ছন্দ থাকে তো ট্রাফিক-পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত এই রাজপথেই আছে। বন্ধুর উঠান না হইলেই নৃত্য-সুষমা ফোটা স্বাভাবিক। আর রাস্তার দু'ধারের নানাছাঁদের বাড়ির তুলনা দিব না। বিজলীবাতিতে কাচের শো-কেস জ্বলিতেছে; কুবেরের ঐশ্বর্য্য তাহার মধ্যে স্তূপীভূত হইয়া চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চাহিদা মিটাইয়া ওগুলিকে উদ্বৃত্তও বলা যাইতে পারে। উদ্বৃত্ত কেন, যাহার প্রয়োগ-নৈপুণ্য জানা নাই—সেগুলির প্রতি লোভের চেয়ে বিস্ময় হওয়াই স্বাভাবিক! নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিকট ওই কুবেরের ঐশ্বর্য্য শুধু বিস্ময়ই বাড়াইতে পারে, ব্যবহারিক মূল্যে স্বাদহীন। তবু এই উপচাইয়া-পড়া ঐশ্বর্য্যের প্রতি চাহিয়া চক্ষুতে জ্বালা ধরে—মন হু-হু করে। মিথ্যা বলিব না, হিংসার সূক্ষ্ম অথচ শ্বাসরোধকারী কালো

ধোঁয়ায় দম যেন বন্ধ হইয়া আসে। এত অপচয় ও বৈষম্যে জগৎ আজও টিকিয়া আছে!

কিন্তু জগৎ টিকিয়া আছে—টিকিয়া আছে মহানগরী কলিকাতা। সুখ ও দুঃখ নদী এখানে পাশাপাশি অগাধ জলরাশিতে তরঙ্গ তুলিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই নদীর গভীর ধ্বনিতরঙ্গ দুই পাড়ের কানে আপন আপন মর্ম্মকথা মর্ম্মান্তিকভাবেই বলিয়া চলিয়াছে, তবু পরস্পরের চৈতন্যকে প্রতিহত করিতে পারে নাই। নিজ নিজ ধ্বনি-তরঙ্গে—দুই নদীই বিহ্বল—দুই নদীই আত্ম-চৈতন্যে সম্পূর্ণ পৃথক ও নিঃসঙ্গ। এমনটা কি করিয়া হয়?

৬

ভবানীপুরের বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া বুঝিলাম—এমনটাই হয়। হওয়া রীতি বলিয়াই হয়। ভ্রূর স্ফীতিতে চোখের অনেকখানিই তো ঢাকা পড়ে। এই নাতিবৃহৎ বাড়ির সঙ্গে—ভাড়া দিতে-না-পারা কেরানীবধূর আত্মীয়তা কতখানি গভীর তাহা অবিলম্বেই পরিস্ফুট হইল। সাজানো ড্রয়িংরুমে প্রতীক্ষা করা ছাড়া—এখানকার আদবকায়দা ঠেলিয়া 'ওগো আসিয়াছি' বলিয়া অন্দর মহলে গিয়া দাঁড়ানো চলিবে না। ড্রয়িংরুমের এই ঐশ্বর্য্য পৃথগীভূত সজ্জায় ও সুখাসনের বাহুল্যে নিকট আত্মীয়কেও অন্দর-প্রবেশের নিষেধবাণী অত্যন্ত মোলায়েম অথচ স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতেছে। কি জানি, কি আমার অন্ধ-সংস্কার, এমনি একটি বৈঠকখানা দেখিলেই—আত্মীয়তার বহিঃসৌন্দর্য্য ভেদ করিয়া মন ও চক্ষু একসঙ্গে তার উলঙ্গ অন্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বিমুখ হইয়া যায়।

পনেরো মিনিট ধরিয়া বসিয়াই আছি। ঘরের সজ্জা দেখা শেষ

হইয়াছে—দোকানের শো-কেসের কথাই মনে পড়িতেছে বারবার। এসব জিনিসের মূল্য কি বুঝি না—রুচিজ্ঞান নাই যে প্রশংসা করিব, অথচ দীর্ঘ-প্রতীক্ষিত অভ্যাগতকে আকৃষ্ট করিবার জন্যই যে এই সজ্জা-পারিপাট্য নিঃসন্দেহে বুঝিয়াও প্রসন্ন হইতে পারিতেছি না। বাড়ির সামনে সামান্য একটু 'লন'। লাল কাঁকর আস্তৃত পথে একখানা মাঝারি গোছের মোটরও দাঁড়াইয়া আছে দেখিলাম। লনের সবুজ শস্প ও গোলাপ-রজনীগন্ধার ঝাড়গুলি সুবিন্যস্ত। একটা শাখাপুষ্ঠ লতা বাড়ির পূবদিকের ঘরটা আঁকড়াইয়া উপর পানে উঠিতেছে। সর্ব্বশুদ্ধ মিলিয়া দৃশ্যটি রমণীয়।

বৈঠকখানায় বসিয়া ভিতরের সাড়াশব্দ বিশেষ পাওয়া যায় না। কয়েকটি শিশুর মিশ্র কোলাহল, একটা চাপা ধমকানি একবার শোনা গেল। মহিলাটি দশ বছরের ছেলেটিকে বলিলেন, একবার ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে পারিস?

না। বলিয়া ছেলেটি আমার চেয়ারের ধার ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল। হয়ত সে বুঝিয়াছে—অনভ্যর্থিতের পক্ষে এ বাড়ির হাওয়াটা বেশি শ্বাস-রোধকর।

মহিলাটি আত্মগত ভাবেই বলিলেন, আমিই না হয় একবার দেখি, বলিয়া সসঙ্কোচে অগ্রসর হইবার মুখেই পূর্ব্বদিকের ভারি মখমলের সুদৃশ্য পর্দ্দাটা দুলিয়া উঠিল এবং অনতিবিলম্বে সুবেশ এক যুবক বাহির হইয়া আসিল। আমাদের পানে চাহিয়া যুবকটি ক্ষণকালের জন্য কি চিন্তা করিল, পরে আমাকেই উদ্দেশ করিয়া কহিল, কাকে চান?

মহিলাটি অগ্রসর হইয়া সে বিপদ হইতে আমাকে ত্রাণ করিলেন। বলিলেন, তুমিই না অভয়?

যুবক আমার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া মহিলাটির পানে চাহিয়া ঈষৎ বিস্ময়ের সঙ্গেই বলিল, হাঁ। কিন্তু আপনাকে তো আমি—

মহিলাটি হাসিবার মত মুখভাব করিয়া কহিলেন, চিনবে কি করে বাবা। সে আজ চার বছরের কথা। তখন সবে তোমার গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে।

এই কথায় যুবকটি বিশেষ প্রসন্ন হইল কিনা বুঝা গেল না। শুধু বলিল, ও! এবং তারপর কি ভাবিয়া দু'টি হাত এক করিয়া নমস্কারের একটা ভঙ্গি করিল।

আমি তোমার মাসি হই। সু'র মাসতুত বোন আমি; বেনেটোলায় থাকি। জয়া-মাসিমার কথা মনে পড়ে?

পরিচয় পাইয়াও যুবকটির মুখভাবে হৃদ্যতা দেখা গেল না। বলিল, মা তো ওপরেই আছেন, যান। দাদার বড় মেয়ের টায়ফয়েড কিনা, আজ যোলদিন চলছে। ক্রিটিক্যাল ষ্টেজ। বাড়িশুদ্ধ সকলকারই মন খারাপ।

আহা, তাতো হবেই।

আমি একটু বেড়াতে যাচ্ছি। এই রামসিং গাড়ি বোলাও। বলিয়া চকচকে জুতার শব্দ তুলিয়া ও পুষ্পসার সুরভিতে ঘর ভরিয়া দিয়া সে বাহির হইয়া গেল। উঠানে প্রতীক্ষমান মোটরটা যাত্রার আয়োজনে খানিকটা শব্দ করিয়া ও ধোঁয়া ছড়াইয়া গেটের ওপারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মহিলাটি আমার পানে ফিরিয়া কতকটা অপরাধ স্খালনের ভঙ্গিতেই বলিলেন, তোমায় কত কষ্ট দিলাম বাবা! আর একটু বোস, বাড়ির ভেতরে একবার দেখা করে আসি।

খোকার হাত ধরিয়া তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন। মিনিট

পাঁচেক পরে একজন ভৃত্য নিতান্ত ভদ্রতারক্ষা-গোছের এক কাপ চা আমার টেবিলের সামনে রাখিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল। চা স্পর্শ করিতে হাত উঠিল না।

আরও পাঁচ মিনিট পরে তিনি বাহিরে আসিয়া আমাকে তদবস্থায় দেখিয়া বলিলেন, আমারই কপাল, নইলে এতদিন নয়—ততদিন নয়—আজই মেয়েটার অসুখ হবে কেন? বলেঃ

আমি যাই বঙ্গে
কপাল যায় সঙ্গে!

আপনার দিদির দেখা পেলেন?

পেলাম, কিন্তু কাজ কিছু হ'লো না। এমন অজ্জল-অস্থল অবস্থায় পড়লাম! এই নাবালকের হাত ধ'রে কোথায় আশ্রয় পাই বলত? ব'সে ব'সে যে কাঁদব একটু—এমন সময়ও হাতে আমার নেই। নিশ্বাসটা চাপিবার চেষ্টা করিলেও সশব্দে বাহির হইয়া গেল। চোখের কোলটাও চিক্‌চিক্ করিতেছে যেন। কেমন যেন অভিভূত হইয়া পড়িলেন তিনি।

বলিলাম, এখন ফিরবেন তো?

হঠাৎ আত্মচেতনায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন, হাঁ, ফিরব বৈকি। সহসা সম্মুখে রক্ষিত অস্পৃষ্ট চায়ের পেয়ালা দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, চা খাওনি যে বাবা?

না। সোজা প্রশ্নটি সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়া এড়াইতে গেলাম।

চা কি তুমি খাও না? এমন ভাবে প্রশ্ন করিলেন—যেন আমার অনিচ্ছার সত্যকার তথ্যটুকু তাঁর জানা চাই। আমার অসম্মান তাঁহার গায়েও বিঁধিয়াছে বলিয়া বোধ হইল।

মিথ্যা উত্তর দিয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলাম না। বলিলাম, খেতে ইচ্ছে হ'লো না।

ঠিক বলেছ বাবা। আমিই বুঝতে না পেরে তোমায় কষ্ট দিয়েছি। চা পাঠিয়ে দেওয়া আমার উচিত হয় নি।

না, না, আপনি কিছু মনে করবেন না। না হয় একটুখানি— কাপে হাত দিতে গেলাম।

তিনি নিষেধ করিলেন, কিন্তু চা খাবার আর সময় কই বাবা। তুমি ওঠ।

সে আদেশ অবহেলা করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না। উঠিলাম।

তিনি ম্লান হাসিয়া বলিলেন, আমিও কিছু কিছু বুঝি বাবা। তোমার কষ্টটাই এতক্ষণ ভেবেছি, আমি ভুল করেছি। মর্য্যাদা মানুষ একটু দেরিতেই বোঝে কিনা!

বলিলাম, মান-মর্য্যাদা নিয়ে তো এখানে ঢুকিনি।

সে কথার সবটা না শুনিয়া তিনি সিঁড়ি দিয়া কঙ্করাস্তৃত পথে নামিলেন। পথে নামিয়া সোজা গেটের পানে চলিতে লাগিলেন। বুঝিলাম, যথেষ্ট আহত হইয়াছেন। মিষ্ট কথার প্রলেপ দিয়া এই আঘাতের জ্বালাকে জুড়ানো অসম্ভব।

গেটের বাহিরে আসিয়া বলিলেন, ফেরবার গাড়ি ভাড়া তো নেই বাবা। ট্রামেই যাওয়া যাক।

কাছে আসিয়া বলিলাম, আমার পকেটে টাকা আছে।

তিনি ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মিথ্যে টাকাটা খরচ ক'রে লাভ কি? নিজের মান—পরে কি কোনকালে বাঁচাতে পারে বাবা? পারে না।

আমাকে উনি পর ভাবিয়া টাকা লইবেন না—এমনটা অবশ্য ভাবি নাই।

সে কথা বুঝিয়া তিনিই বলিলেন, যদিও তুমি পর, তবু তোমাকে লক্ষ্য করে ওকথা আমি বলিনি বাবা। আপন লোকই বা কাকে

ব'লব—তাই যে আমার জানা নেই! শুধু শুধু টাকা খরচের পক্ষপাতী আমি নই। একটু থামিয়া বলিলেন, তবে বলতে পার—আসবার সময় ট্রামে না এসে গাড়ি করলাম কেন? খানিক নীরবে পথ অতিবাহন করিতে লাগিলেন। অতঃপর নিজেকেই যেন নিজে প্রশ্ন করিলেন, কেন জান? যতবার এসেছি—কুটুমের বাড়ি—গাড়ির ভাড়া ওরাই দিয়েছে। অবশ্য বেশিবার আসিনি, তবু....কিন্তু মেয়েটার ভাবনায় ওরাও কেমন যেন হ'য়ে রয়েছে। আর—

আর কি? সাগ্রহে প্রশ্ন করিলাম।

আর আমার কথা সব শুনে—ওরাও একটু ভয় পেলে হয়ত। তিনি হাসিলেন।

ভয়! কিসের ভয়?

বিধবার ভার যে অনেকখানি; তার ওপরে এই নাবালক ছেলেটা। আঃ বোকা ছেলে, বুঝতে পারলে না? আমি যদি ওঁদের ঘাড়ে চেপেই বসতাম!

তিনি কি রহস্য করিতেছেন? থমকিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিলাম।

তিনি আমার বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে কেমন যেন অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। দ্রুতকণ্ঠে কহিলেন, অবশ্য আমার ভুলও হ'তে পারে। ওঁদের মত বড় লোকেরা এমন দশটা বিধবা প্রতিপালন ক'রতে পারেন। তা নয়। কথাটা এই....বলিয়া সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিলেন, ট্রামের রাস্তা আর কতদূর?

এই যে মোড়টা ফিরলেই—

ট্রামে চাপিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এই প্রৌঢ়াকে সামান্য কেরানীর অশিক্ষিতা স্ত্রী ভাবিয়া এতক্ষণ নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু কথাবার্ত্তায়

ধরণে তাঁহার সম্বন্ধে রীতিমত সজাগ হইয়া উঠিলাম। দারিদ্র্য মানুষের মর্য্যাদাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করিতে পারে না—এমন সুশিক্ষার পরিমণ্ডল না থাকিলে—সর্ব্বাপেক্ষা গভীর শোককে বুকে চাপিয়া সহায়-সম্বল-হীন স্ত্রীলোক এমন সহজ ভাবে চলাফেরা করিতে পারে! ধনী আত্মীয়ের বাড়ি হইতে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও—হা-হুতাশে তিনি ভাঙ্গিয়া পড়েন নাই। আত্মপ্রত্যয়ে কণ্ঠস্বর তাঁহার অবিকৃত বা অকম্পিত রহিয়াছে।

তিনিই প্রথমে কথা কহিলেন, ওঁদের কাছে সাহায্য চাইতেই এসেছিলাম—কিন্তু গলগ্রহ হ'তে আসিনি। ওঁর আপিসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ড কিছু আছে। এত শীঘ্র তো সে টাকা পাওয়া যাবে না, তাই উপস্থিত কারও কাছে ধার নিয়ে কাজ-কর্ম্মগুলো সারতে চাই। আচ্ছা বাবা, তোমার সন্ধানে এমন লোক আছে—যিনি কম সুদে টাকা ধার দিয়ে থাকেন?

কলকাতায় আমি তিন দিন হ'লো এসেছি।

ঠিক—ঠিক, পোড়া মনের ভুল দেখ! যে ডুবছে তার কি হুঁসপর্ব্ব কিছু থাকে! একগাছা তৃব্বো ধ'রেও বাঁচতে চায়। আচ্ছা, একটু চেষ্টা তুমি দেখো বাবা। একটু থামিয়া বলিলেন, তোমার ওপর যথেষ্ট জুলুম করছি, কিন্তু উপায় নেই। তুমি ভগবানের দেওয়া, নৈলে অমন সময় আর কাউকে না পেয়ে তোমাকেই বা পাব কেন! বাবা, তুমি ভগবান মান তো?

আমার মানামানিতে কি এসে যায়?

তোমার না আসুক, আমরা মায়েরা কিছু ভরসা পাই।

আমরা ভগবান মানলে আপনাদের ভরসা কিসের?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমার মা আছেন তো? তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রো—তিনি এর উত্তর দেবেন।

আপনিই বলুন না।

নিজের পুত্রের একখানি হাত বাঁ হাতের মুঠার মধ্যে তুলিয়া লইয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, সব মা কি চায় না যে নিজের ছেলেটির গায়ে কাঁটার আঁচড় না লাগে? ছেলে ঈশ্বর-বিশ্বাসী হ'লে তার দীর্ঘ জীবন আর সুস্থ শরীর লাভ হয়—এ কথা সব মা-ই জানেন।

এমন পরিপূর্ণ বিশ্বাসের উপর তর্ক চলে না। চুপ করিয়া ময়দানের পানে চাহিয়া রহিলাম। চৌরঙ্গীর প্রশস্ত ও আলোকোজ্জ্বল পথ হইতে পলাইয়া যত রাজ্যের অন্ধকার ময়দানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেখানেও আলোর তীর তাহাকে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে—তবু শাখা-পুষ্ট বৃহৎ বট-অশ্বত্থের ছায়ায় ঘন হইয়া তাহারা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে। রাত্রির আকাশ বিস্তীর্ণ;—তারা-কণ্টকিত নীল সমুদ্র অন্ধকারে কালো ভেলভেট পর্দ্দার মতই বিলম্বিত। শহরের ঊর্দ্ধমুখীন আলোর ছটা খানিকটা শূন্য পর্য্যন্ত ধূসর হইয়া শূন্যেই মিলাইয়া গিয়াছে। ছায়াপথের ধূসরতার মত এপার ওপার পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া নূতন সৌন্দর্য্যে কারুশিল্পের বেসাতি খুলে নাই। প্রথম রাত্রিতে তো ছায়াপথ পরিস্ফুট হইয়া উঠে না—শহরের আলোক-উৎসারিত ধূসরতার কিছু রমণীয়তা দেখা যায় বৈকি।

বাড়ির দুয়ারে আসিয়া রমণীর পায়ের গোড়ায় অবনত হইবার উপক্রম করিতেই তিনি আমার চিবুক ধরিয়া বলিলেন, অশৌচে প্রণাম নিতে নেই, এমনিতেই আমি আশীর্ব্বাদ করছি। কাল একবার আসবে বাবা?

ছেলেটিও বাড়ির কাছে আসিয়া সহজ হইয়া আসিয়াছে। হৃদ্যতাভরা কণ্ঠে বলিল, ওই ওঁর ঘর, না আসেন তো ধরে নিয়ে আসব না!

মা হাসিলেন, পাগল ছেলের কথা শোন!

৭

সমস্ত শুনিয়া অতুলদা বলিলেন, বাংলায় পথে ঘাটে মা সস্তা, চাকরি সস্তা নয়।

তাহ'লে ওঁদের সাহায্য ক'রব না?

সে তুমি জান। বিশেষতঃ সৎবৃত্তির অনুশীলনে বাধা দেওয়া যখন অন্যায়। সে অন্যায়ের শাস্তিভোগও লেখা আছে। শুক্রাচার্য্যের একটি চোখ নেই।

আপনি ঠাট্টাই করুন আর যাই করুন—

ঠাট্টা ক'রব কেন। তবে যে জলে ডুবে ম'রছে তাকে বাঁচাতে গেলে — সাঁতারু হওয়া চাই। নইলে—

কিন্তু এখানে আপনার উপমা অচল।

বেশি মাত্রায় সচল। সংসারটা পুকুরের চেয়ে ঢের বেশি বড়, এখানে সাঁতার কাটা ঢের দক্ষতার কাজ।

ওসব কথা রাখুন। ওঁদের জন্যে অল্প সুদে টাকা ধার কোথাও মিলবে কিনা বলুন?

যেন তোরই দায়—এমনি হাঁপিয়ে উঠেছিস। টাকা ধার জিনিসটা অত সোজা নয় রে—যে সুদের লোভ দেখালেই যে-সে টাকা দেবে।

সুদ ছাড়া টাকা ধার দেওয়ার আর কি উদ্দেশ্য?

টাকাটা যাতে সুশৃঙ্খলে আদায় হয়—সেদিকে সতর্ক দৃষ্টিও রাখা চাই যে! ওঁদের কি এমন সম্পত্তি আছে—যা বাঁধা দিয়ে—

অতুলদা।

অতুলদা হাসিলেন। বলিলেন, সংসারের বাস্তব দিকটা উপেক্ষা করবার নয়।

জানি। কণ্ঠে একটু জোর দিয়া বলিলাম, শুধু বাস্তব নিয়েই তো মানুষের কারবার নয়।

নয়—মানি। তবে চোখে ঘোর লেগে থাকলে ঠিকমত পথ চেনাও দুষ্কর। কাল থেকে তোর এখানকার মেয়াদ শেষ।

আমাকে কি ওইখানে গিয়ে থাকতে হবে?

নিশ্চয়। ওঁরা আত্মপরিবার-ভুক্ত করেই লোক রাখেন। তা ছাড়া তুমি হ'লে গিয়ে মর‍্যাল টিচার।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলাম, কি মর‍্যালিটি ওদের শেখাব আমি! সাদা চোখে সংসারকে বুঝে নেবার উপায় বাৎলে দেব?

তাই বা কম শিক্ষা কি। এক সময় ছিল—যখন সদা সত্য কথা বলার নীতি অলঙ্ঘ্য ছিল; যখন নিজে উপোসী থেকে পরের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া ছিল প্রশংসার বিষয়; যখন আকাশের উপর ঈশ্বরকে কল্পনা করে বন্দীজীবন যাপন করত মানুষ—এই পৃথিবীতে।

এখন বুঝি মর‍্যালিটির সে ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই? ঈষৎ ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করিলাম।

মর‍্যালিটির ষ্ট্যাণ্ডার্ড আবার আছে নাকি! যুগ ধর্ম্ম অনুসারে নীতি বদলায়। ধর কালাপানি পার হওয়া, ধর স্ত্রীশিক্ষা, বেদে সর্ব্বজাতির অধিকার, কো-এডুকেশন—

থাক আর বলতে হবে না। ভাবিলাম, হয়ত আমাদের ভারতীয় মনই এই নীতিরক্ষার জন্য বেশি দায়ী। ভারতীয় মনের কথাও হয়ত তত বুঝি না—যেমন বাঙ্গালী-মনকে জানি। কোমল মৃত্তিকা, স্যাঁতসেঁতে জলা, অল্প পরিশ্রমে প্রচুর শস্য ফলে, আলস্যের অবকাশ প্রচুর, আকাশও সদা বর্ষণশীল;—এমন পরিবেশে ভাবালুতার বাষ্পে মন যদি অহরহ মেদুরই হইয়া থাকে—নীতিকে যদি ধর্ম্মচর্চ্চার অপরিহার্য্য অঙ্গই

বিবেচনা করি—যদি উপরের মেঘস্তরের ওপিঠে বৈকুণ্ঠ-অধিপতির সদা-জাগ্রত চক্ষুকে শাসনকর্ত্তার রক্তচক্ষু কল্পনা করিয়া জীবনের ক্ষেত্রকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করিয়া নিতান্ত ভাল মানুষটির মত সেই বৃত্তের মধ্যেই ঘুরপাক খাইয়া মোক্ষ লাভ করি—তাহাতে কাহারই বা কি ক্ষতি! তা ছাড়া 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই নীতিতে বিশ্বাসবান হইয়াও 'সবার উপরে আমিই সত্য'—এই মনোভাবের দ্বারা চালিত হইতেছি। কাজেই আমার পাশে যে অন্ধ করুণ-সুরে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছে—তাহার ধ্বনি কানে পৌছিতেছে না, প্রতিবেশীর আর্ত্তিকে মন দিয়া গ্রহণ করিবার সামর্থ্য নাই। উলঙ্গ বাস্তব মানুষকে প্রতিনিয়ত আঘাত করিয়া সুকুমার বৃত্তিগুলিকে কঠিন করিয়া দিতেছে।

অতুলদা একদৃষ্টে হয়ত আমার কুঞ্চিত ললাটের পানে চাহিয়া আমার চিন্তার গতিধারা লক্ষ্য করিতে ছিলেন। কাঁধে একটা চাপড় মারিয়া কহিলেন, আর মুখ ভার করে থাকিস নে—আমি ওর ব্যবস্থা করব।

কি ব্যবস্থা করবেন আপনি?

ব্যবস্থা তো টাকা? তাই দেওয়া যাবে'খন। তবে কড়ার এই প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পেলেই যেন গরিবের দিকে নেকনজর করেন। বিলোবার মত যথেষ্ট পয়সাকড়ি আমার নেই।

না, চাইনা আমার টাকা।

তোকে হ'লে দিতাম না—কেননা, বেকারদের আমি বিশ্বাস করি না। বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ওঁদেরও তো বাঁধা রাখবার কিছু নেই।

ওই ফাণ্ডের কথাটা না বললে সেই ধারণাই হয়ত থাকতো—হয়ত দয়াবৃত্তির অনুশীলন হতো না।

কিন্তু—অভিমানে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম।

আমার পিঠে ঝাঁকুনি দিয়া অতুলদা বলিলেন, Be practical. অত সেন্টিমেণ্টাল হলে টিকবি কি করে রে?

চোখে এক ফোঁটা জলই হয়ত আসিয়াছিল, জামার খুঁটে মুছিয়া ফেলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

১

মিঃ দাশ অর্থাৎ নীতিশবাবু তখন সুসজ্জিত ভাবে কোথায় বাহির হইতেছিলেন। আমায় দেখিয়া অভ্যর্থনা করিলেন, আজই বাইরে চলেছি যে—কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তা আপনি—

মাথা নীচু করিয়া বলিলাম, আমাকে আর আপনি কেন?

বলব না? বলিয়া উচ্চহাস্য করিয়া নীতিশবাবু বলিলেন, সত্যি বলতে কি—আমারও যে বাধ-বাধ না ঠেকে তা নয়, কিন্তু আপনার তো—এই তোমারও তো রাগ হ'তে পারে।

রাগ হবে কেন?

ওটা যে বয়সের দোষ। আমার তো হতো। তখন আমার বয়সই বা কত! ভ্রূকুঞ্চন করিয়া খানিকক্ষণ উর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিলেন, এই বড় জোর দশ কি এগারো। বড়বাবু না বলে শুধু বাবু বলেছিল বলে ছোট্টু চাকরটাকে গুনে দশ ঘা বেত মেরেছিলাম।

অবাক হইয়া তাঁহার পানে চাহিলাম।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, অবাক হয়ে ভাবছ, আমি সেই মানুষ কিনা? হাঁ, সে মানুষ তো নয়ই। সেই ছিপছিপে চেহারার বালক আর এই মেদ-মাংসের স্তূপে অনেক তফাৎ। বাইরের যেমন তফাৎ—তেমনি তফাৎ মনেরও হ'য়েছে বৈকি। একটু থামিয়া বলিলেন, দশ-বার বছরের বালকের মনে অমন মর্য্যাদাবোধ জন্মায় কি করে—তুমি হয়ত ভাববে! কিন্তু জন্মায়। রূপোর চামচে মুখে পুরে জন্মায় যে ছেলে....

কথা তাঁহার শেষ হইল না, বর্ত্তুলাকার সেক্রেটারি প্রবেশ করিয়া কহিল, বড় সুটকেশ, একটা হোল্ডঅল, আর একটা জলের কুঁজো মোটরে তুলে দেওয়া হলো। ফলের একটা টুকরিও।

ব্যস—ব্যস! দেশের কাজ করতে গিয়ে এর চেয়ে বেশি দুঃখ ভোগ করলে চলবে কেন! কি বল হে তুমি? আমার পানে চাহিয়া পরম কৌতুকভরে ঘাড় দোলাইয়া তিনি হাসিয়া উঠিলেন। চিবুকের মাংসস্তূপে তরঙ্গ জাগিল।

সেক্রেটারি অপ্রতিভ না হইয়া কহিল, মিঃ দাশগুপ্তের দেখুন গে—একটা রাজ্য সঙ্গে চলেছে। সেলুন হলেই ভাল হয়।

আমারও সেই ব্যবস্থা করলেন না কেন? একসঙ্গেই কাশীবাস হতো। আবার সেই প্রাণখোলা হাসি ও মাংসস্তূপের তরঙ্গ। অকস্মাৎ হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, মিঃ দাস, তাঁকে—অর্থাৎ কি নাম—হাঁ, হাঁ, সুপ্রিয়—নেহাৎ গদ্যময় জীবন বলেই অমন পদ্যময় নামটি ভুলে যাই—। হাঁ, এই সুপ্রিয় বাবু—ইনি অরু আর তরুকে দেখাশোনা করবেন। ওদের লেখাপড়াটা যাতে—

ঘাড় নাড়িয়া সেক্রেটারি বলিল, উনি জানেন তো—এ বাড়ির প্রাইভেট টিউটর হলে—এখানেই থাকতে হবে?

নীতিশবাবু বলিলেন, কথাটা আপনার কিছু রূঢ় শোনালো না, মিঃ

দাস ? আমরা প্রাইভেট টিউটর বলে কাউকে রাখি কি ? ছেলেমেয়েদের সঙ্গী হিসাবে—। আচ্ছা, সেদিন বলিনি আপনাকে—তোমাকে যে, এখানে এক-পরিবারভুক্ত হয়ে না থাকলে অসুবিধে হ'তে পারে ?

মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম।

এক বাড়িতে থাকার মানে কি জান ? আপন হয়ে যাওয়া আর কি। তুমি মাইনে নিয়ে আসবে ছেলেদের শিক্ষা দিতে—ওরাও মাষ্টার মশায় এসেছেন বলে মুখ শুকিয়ে বই বগলে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ নিয়ে ঘরে ঢুকবে—আরে হেসো না, সত্যি পর পর মনে হয় না কি ? আড়ষ্ট ভাবটুকু কাটতে যেন চায় না। নিজে ছেলেবেলায় যা মোক্ষমভাবে অনুভব করেছি—ওটা আর পরের স্কন্ধে চাপাতে চাই নে। আবার সেই প্রাণখোলা হাসি।

সেক্রেটারি বলিল, আপনার ট্রেনের সময় হ'য়ে এলো।

পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া তিনি সময় দেখিলেন। পরে একখানি হাত প্রসারিত করিয়া আমার একখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া তাহাতে ঈষৎ দোলা দিয়া কহিলেন, শুধু ওদের শিক্ষা দিয়েই তোমার ডিউটি শেষ হবে ভেব না। আমার পানেও একটু নজর রাখতে হবে। তবে অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারে আমায় খুব মন্দ ছেলে ঠাউরো না, এক কালে বৃত্তিটৃত্তিগুলোও নেড়ে চেড়ে দেখা গেছে। বলিয়া আবার একটা দমকা হাসির দ্বারা কক্ষ কাঁপাইয়া বহির্গমনের উদ্যোগ করিলেন।

সেক্রেটারি বলিল, ওঁকে কি দোতলার দক্ষিণ দুয়ারী ঘরটায়—

না, না, কবি মানুষ। বরঞ্চ তেতলায় একদম নিরিবিলি ঘরখানা দিয়ো। খোলা আকাশ আর তার নীচেয় খোলা শহর—

ওখানায় আপনি তো মাঝে মাঝে—

কাব্য-বিলাস করি। সেইজন্যই তো ওখানা ওঁর প্রাপ্য। সারারাত্রি

মাথা খোঁড়াখুড়ি করে যাঁকে ওঘরে আনতে পারিনি—মাথা ধরাই আমার সার হ'য়েছে, দেখিনা, একজন সত্যকারের কবির আহ্বান তিনি কেমন করে না শোনেন। ভয় পেয়ো না, সুপ্রিয়, বর্ষাকালে বাজের ডাক শুনলে ভয়ে মা বা ঠাকুরমার কোলে মুখ লুকোবে, ততটা ছেলে মানুষও তুমি নও, আর ঘরখানাও ঠিক ততটা নির্জ্জন নয়। হাসির প্রারম্ভেই সহসা ব্যস্ত হইয়া হাত তুলিয়া বলিলেন, আচ্ছা, চলি। সঙ্গে সঙ্গে দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন।

মোটর চলিয়া গেলে সেক্রেটারি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, আপনি তৈরী হয়েই এসেছেন তো ?

হাঁ।

অল রাইট। কিন্তু একলা থাকতে যদি অসুবিধা বোধ করেন—আমি না হয় বলে কয়ে—

না, অসুবিধে আর কি।

না, তাই বলছি। আমার পানে কয়েকবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি পরম উদাসীনের মত গম্ভীরভাব ধারণ করিলেন।

সত্য বলিতে কি—প্রথম দিন হইতে এই সেক্রেটারিকে আমার তেমন ভাল লাগে নাই। চোখের দেখার একটা ক্ষণ আছে। পলকের দেখায় লোকটিকে নিখুঁতভাবে চিনিয়া লওয়া দুষ্কর; তবু, দৃষ্টি মনকে বলিয়া দেয়, অমুকের চেহারাটা তুমি ইচ্ছা করিলে খানিকক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পার। মন বিচার-বিশ্লেষণ না করিয়াও হয়ত কাহাকে আঁকিয়া রাখে, হয়ত কাহাকে ছাঁটিয়া ফেলে। কিন্তু এই পছন্দ-অপছন্দর মধ্যে মনের গভীর সক্রিয় অনুভূতি প্রায়ই ক্ষণমুহূর্ত্তের নিকষে ভুল-যাচাই করিয়া বসে না। সেক্রেটারির অতি ব্যস্ততার মধ্যে প্রসাদকণিকা লাভের যে আগ্রহ সেদিন পরিস্ফুট দেখিয়াছি, সেই অশোভনতাটুকু মন ঠিক প্রসন্নভাবে

গ্রহণ করিতে পারে নাই। অথচ আমিও চাকরি-প্রত্যাশায় সেই প্রসাদ-কণিকা লাভের আশায় এখানে আসিয়াছি। সত্য বলিতে কি, প্রতিযোগিতার কথা এখানে উঠিতেই পারে না। একজন ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া ফসল ফলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, আর একজনের ভাগ্যে ভূমিস্বত্ব লাভই ঘটে নাই।

সেক্রেটারি ততক্ষণ চেয়ারে বসিয়া প্যাড টানিয়া লইয়া কি লিখিতেছেন। আমি যে পুরা পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া চিন্তাগ্রস্তের মত তাঁহার পরবর্ত্তী নির্দ্দেশের প্রতীক্ষা করিতেছি—সে কথা তিনি বুঝি ভুলিয়াই গিয়াছেন। পাঁচ মিনিট পরে মুখ তুলিয়া ঈষৎ চমকিত হইয়া যেন আমাকে প্রথম দেখিলেন—এই ভাবে বলিলেন, ওঃ, তা দাঁড়িয়ে আছেন কেন? ওই তেতলার ঘরখানিই তাহলে—, কলিং বেলে তাচ্ছিল্যব্যঞ্জকভাবে একটা ঘা দিলেন। বেলটা ঈষৎ ক্রিং করিয়া উঠিল। পরে দেখিয়াছি তিনি—অমনই ধীরে বেল বাজাইয়া ভৃত্যদের ডাকিয়া থাকেন। এবং তাহারা প্রথম আওয়াজ শুনিতে না পাইলে যথেষ্ট ভৎ´সিত হয়।

ভৃত্যকে দেখিয়া তিনি আদেশের ভঙ্গিতে বলিলেন, নতুন মাষ্টার-বাবুকে তেতলার ঘর দেখিয়ে দে। আর শোন! ভৃত্য দাঁড়াইলে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, আপনার ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে আজই আলাপ করবেন কি? না, আজ বিশ্রাম করে—

ডাকুন না তাদের।

অরুণবাবু আর দিদিবাবুকে নিয়ে আয়। ভৃত্য চলিয়া গেলে আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, ঐ যে মিঃ দাশ বললেন আপনি কবিতা না কি লেখেন—

লজ্জিত মুখে বলিলাম, বাবা কবি ছিলেন বলে—

আপনিও লেখেন? তা কি জানেন, বংশানুক্রমিক ধারাটা সব দেশেই অচল, অর্থাৎ ট্রাডিশনটা বজায় থাকে না। নামকরা কবি বলুন, পণ্ডিত বলুন, দেশনেতা বলুন,—যা প্রতিভা এক পুরুষেই শেষ। কেবল ব্যতিক্রম হ'লেন, জহরলাল।

কথা কহিলাম না। নীরবে এই আঘাত গ্রহণ করিলাম। গ্রহণ না করিয়াই বা উপায় কি?

তিনি বলিতে লাগিলেন, আমাদের দেশে প্রথমে লোকে খোঁজে বংশপরিচয়। যেন মহাবিদ্বানের ছেলেও মহাবিদ্বান হবে—এমনি তাদের ধারণা। তা যদি হতো তাহ'লে, বিদ্যাসাগরের ছেলে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ছেলে, গান্ধীর ছেলে—

তাঁহার কথা শেষ হইল না, বসন্তকালের দক্ষিণা হাওয়ার মত দুইটি হাস্যমুখ বালক-বালিকা কক্ষমধ্যে ঢুকিয়া কলকণ্ঠে কহিল, কই মাষ্টার মশায়?

মিঃ দাস গম্ভীর ভাব পরিত্যাগ করিয়া হাসিবার মত মুখভঙ্গি করিয়া কহিলেন, এই যে, ইনি—প্রণাম কর।

বসন্ত বাতাস কি আড়ষ্ট হইয়া উঠিতে পারে, না ভারি হওয়া তাহার রীতি? ঠেলাঠেলি করিয়া দুই ভ্রাতাভগ্নী পায়ের কাছে উপুড় হইয়া পড়িল, বাধা দিবার অবসর পাইলাম না।

ছেলেটি কহিল, কে আগে আপনার পা ছুঁয়েছে মাষ্টার মশায়?

মেয়েটি কহিল, আমি।

ছেলেটি কহিল, ইস, আমি।

মেয়েটি কহিল, মিথ্যুক কোথাকার।

ছেলেটি কহিল, বাঁদরী কোথাকার।

মিঃ দাস বলিলেন, ছিঃ, ও কথা বলিতে আছে? ও তোমার দিদি হয় না!

দিদি হ'লে ভাইকে কেউ বুঝি মিথ্যুক বলে! ঠোঁট ফুলাইয়া ছেলেটি আমার পানে চাহিল।

তাই বলে দিদিকে বাঁদ্‌রী বলবি? কি বিচ্ছেই হ'চ্ছে ছেলের!

টেবিলের উপর ব্লটিং পেপার-মোড়া রুল তুলিয়া ছেলেটি প্রহারোদ্যত ভঙ্গিতে বলিল, অ্যাইসা রদ্দা লাগাব—

মেয়েটি সরিয়া গিয়া মুখ ভ্যাংচাইয়া বলিল, অ্যাইসা রদ্দা লাগাব!

হুড়াহুড়ি করিতে করিতে দুইজনেই বাহির হইয়া গেল।

মিঃ দাস হাসিয়া বলিলেন, নমুনা দেখলেন? পারবেন তো সামলাতে?

দেখা যাক।

কিন্তু যেন কবিতা-টবিতা শুনিয়ে ওদের মাথাটি খাবেন না। যদিও নীতিশবাবু সে কাজ অনেকটা এগিয়ে রেখেছেন।

ছেলেদের উনি বড্ড আদর দেন বুঝি?

ছেলেকে আর আদর দিলেন কই! টাকার চেয়ে লোকে সুদের কদর করে বেশি, জানেন তো? এ দু'টিও তাই।

ওঁর ছেলে নয়?

ওঁর ছেলেদের বয়স অনেক।

তাঁদের তো দেখলাম না।

দেখবেন বৈকি। কিন্তু আপনার কবিতার কথাই বলুন। খাতায় পচ্‌ছে, না, কোথাও ছাপা-টাপা হ'য়েছে?

যে কথা গোপন করিবার ইচ্ছা ছিল, বার বার খোঁচা খাইয়া তাহা গোপন রাখিতে পারিলাম না। আত্মসম্মান উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিলাম, বেরিয়েছে বৈকি দু'একটা।

বেরিয়েছে? কোন্ কাগজে?

কাগজের নাম করিলাম। মিঃ দাসের ওষ্ঠে কৃপামিশ্রিত মৃদুহাস্য ফুটিয়া উঠিল। বহুক্ষণ ধরিয়া আপন মনে কি যেন উপভোগ করিয়া বলিলেন,—ওঃ, প্রবাসী, কি ভারতবর্ষে বুঝি চেষ্টা করেন নি? না তারা ফেরৎ পাঠিয়েছে?

ঈষৎ উষ্ণস্বরে জবাব দিলাম, চেষ্টা করিনি। করলে বোধ হয় ফেরৎ আসতো না।

বেশত, চেষ্টা করুন না। মিঃ দাশ করাচী থেকে ফিরে এসে এই মাসের প্রবাসীতে যদি আপনার একটা লেখা দেখতে পান তো ভারি খুশী হবেন। ওঁর নিস্ফলা ঘরের দুর্ণামটাও কাটবে।

লোকটার মুখে আবার সেই মৃদুহাস্য। সে যে অবজ্ঞার হাসি, ক্রোধে চোখ কান উতপ্ত হইয়া উঠিলেও, সে হাসি চিনিতে ভুল আমার হয় নাই।

আমায় ঘরটা দয়া করে দেখিয়ে দেবেন কি? নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই কেমন যেন অসহায় ঠেকিল। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলে মানুষ কি অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়ে?

কলিং বেলে ক্রিং করিয়া একটা মৃদু আওয়াজ উঠিল। কেহ আসিল না। ক্রিং ক্রিং আওয়াজ উঠিতেই পূর্ব্ব কথিত ভৃত্যের আবির্ভাব ঘটিল। মিঃ দাস রাগিয়া বলিলেন, এই উল্লু, তোম শুনা নেই। বাবুকো কামরা দেখলাও।

আদেশ দিয়া তিনি আর আমাদের পানে চাহিয়াও দেখিলেন না। টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কি যেন লিখিতে লাগিলেন।

সুখ-সুবিধার যত কিছু আয়োজন হওয়া সম্ভব—এ ঘরে তাহার কোন কিছুরই অভাব ছিল না। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে অতিকায় এমন একখানি ঘরে একাকী রাত্রি যাপন করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু নীতিশবাবুর বাড়িতে কোন জিনিসটারই খর্ব্বায়তন চোখে পড়িতেছে না। সুউচ্চ ছাদ, চকচকে পালিশ-করা মেঝে, ফিকে নীল রঙের উপর লতাপাতার আলিপনায় সীলিঙ ও দেওয়াল সুদৃশ্য, কার্নিশের কারুকার্য্যও দু'দণ্ড চাহিয়া দেখিবার মত। সীলিঙে বৈদ্যুতিক পাখা আছে, তিন চার রকমের শোভন শেড্ দেওয়া আলোর ব্যবস্থাও আছে। সারি সারি আলমারিতে সোনার জলে নাম লেখা বইগুলি যেন হাসিতেছে। পূর্ব্ব দিকের বড জানালাটার ধারে প্রকাণ্ড একখানা সেক্রেটারিয়েট টেবিল পাতা—তার উপর লিখিবার সরঞ্জামগুলিরই বা কি শোভা! এক কোণে একখানা ইজিচেয়ার ও বেতের মোড়া পাতা আছে। ক্লান্তি অপনোদনের মুহূর্ত্তে এগুলির অবশ্যকতা আছে। ছবি যে ক'খানি আছে—সুনির্ব্বাচিত। কতকগুলি আমার জানা ছিল, তকগুলিকে ঠিক চিনিতে পারিলাম না। কোন পরিচয়-লিপি সেই চিত্রগুলির নিম্নে উদ্ধৃত ছিল না। হয় তো বিখ্যাত কবি বা শিল্পীর পরিচিতি অনাবশ্যক বলিয়াই নীতিশবাবু সে ব্যবস্থা করেন নাই। দক্ষিণ খোলা জানালার কাছে—সুদৃশ্য পালঙ্ক, যে সোনার খাটে রূপকথার রাজকুমারীরা বিশ্রাম লাভ করেন—এই দুগ্ধফেননিভশয্যা-অলঙ্কৃত পালঙ্ক বুঝি তাহারই অনুকৃতি। রূপকথার রাজকন্যাদের কালে বিদ্যুতের ব্যবহার কথা শোনা যায় না, এ পালঙ্কের—মাথায় ছোট পাখা ও বেডসুইচ-সমন্বিত বিজলী আলোর ব্যবস্থাও আছে। টেবিলের উপর একটি ধ্যানী বুদ্ধ-মূর্ত্তি,

লাল মখমলের খাপে ঢাকা ছোট একখানা কুক্‌রী বা ছোরা, কয়েক খণ্ড নানা আকৃতির প্রস্তর, প্রকাণ্ড একটা গ্লোব এবং আরও টুকিটাকি বহু জিনিস পরিপাটি করিয়া সাজানো। মোরাদাবাদী রূপার মীনা-করা ফুল-দানিতে টাটকা ফুলের তোড়া হাসিতেছে। সেই গন্ধে সারা গৃহ আমোদিত। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য্য হইলাম, এই গৃহের সজ্জাকে অতিক্রম করিয়া যে সৌন্দর্য্য বাতায়ন-বাহিরে পড়িয়া আছে তাহার পানে চাহিয়া। নীলাকাশ বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত, রাজপথ বহুদূর পর্য্যন্ত বিসর্পিত। শহরের বুকের উপর অসংখ্য ইষ্টকস্তূপে-গড়া বাড়ি সারি বাঁধিয়া এই জানালার সম্মুখে শুইয়া যেন প্রণতি জানাইতেছে। অদূরের পাঁচতলা হোষ্টেলটি পথ রোধ না করিলে—আরও অসংখ্য ভক্ত সৌধের প্রণাম-নিবেদন দেখিবার সৌভাগ্যলাভ হয়ত ঘটিত। পায়ের তলায় ট্রাম চলিতেছে—ঈষৎ খর্ব্বাকৃতি, রৌদ্র-কিরণে চক্‌চকে ইস্পাতের বন্দী লাইন হয়ত বা মুক্ত আকাশের স্বপ্ন দেখিতেছে, আকাশের প্রতিবিম্ব বুকে করিয়া তারের গুচ্ছ তার বুকের উপর দুলিতেছে। অতিকায় বাস ছুটিতেছে, মোটর ছুটিতেছে, ফিটন-ব্রুহাম-জুড়ি-ছ্যাকড়া গাড়ি ছুটিতেছে, রিকশ ছুটিতেছে, গোযানও চলিতেছে। গতির একটা প্রতিযোগিতা সকাল হইতে মধ্য রাত্রি পর্য্যন্ত চলিয়াছে। শব্দ—হাঁ, এই ত্রিতলের উচ্চতায়ও শব্দের তরঙ্গ অনতিরূঢ় আঘাত হানিতেছে কানে; মন চঞ্চল হইবার পক্ষে সে আঘাত যথেষ্ট বৈকি। তবু এখানকার নির্জ্জনতার মূল্য আছে। মেসের কক্ষে যে বিচিত্র শব্দের সমাবেশ ছিল—এখানে তাহা নাই। কলতলার শব্দ, রান্নাঘরের শব্দ (এবং গন্ধও), বস্তিবাসিনীদের কলহ-কোন্দলের শব্দ, ফিরিওয়ালার বিচিত্র কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণ-বৈষম্যের শব্দ, সহকক্ষ-বাসীদের সু-উচ্চ সমাজ বা রাজনীতি চর্চ্চাজনিত শব্দ, পাশের বাড়ির কচিছেলের উচ্চৈঃস্বরে পাঠ আবৃত্তির ও ক্রীড়া নৈপুণ্যের শব্দ, এবং

সর্ব্বোপরি রেডিও রাক্ষসীর প্রমোদ-প্রসাধনজনিত গান, গল্প, বক্তৃতা, বাদ্য ইত্যাদির উদ্গার শব্দ। তা ছাড়া কচি ছেলের ককাইয়া ওঠা, কাংস বাসনের ঝনৎকার, চেয়ার টেবিল টানিবার ঘর্ষণ ঘুৎকার, শাশুড়ী বধূর—চাপা কলহ বা সংসার সম্বন্ধে নাতিউষ্ণ উপদেশামৃত দান, স্কুল-পালানো ছেলের সিনেমা-ষ্টার লইয়া সোৎসুক আলোচনা, সিনেমার দুই একটি গানের দুই এক কলির চাপা উচ্চারণ, গ্রামোফোন রেকর্ডের উৎপাত ইত্যাদির মিশ্র শব্দে নিদ্রা এবং শান্তিকে একরূপ বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছিলাম। আর সেই রোদনের ধ্বনি।

সে কথা এই প্রাসাদে বসিয়া আর বলিব না। এখানে শুধু একটি শব্দ, ঐ ট্রাম বাস দৌড়ানোর শব্দ। প্রচণ্ড গতি আর প্রবল প্রতি-যোগিতার শব্দ।

রাত্রিতে ঘুম আসিল না। আসিবে কি করিয়া? উন্মুক্ত বাতায়ন দিয়া শুধু নীলাকাশ বা শুধু সৌধতলশায়িত জনপদের মূর্ত্তিই তো চোখে পড়িতেছে না, সারা স্নায়ুর মধ্যে কেমন যেন শিহরণ জাগিতেছে। উত্তেজক পানীয় পানে দেহে যেমন উত্তেজনা জাগে—তেমনই আর কি! শয্যায় শুইয়া আছি, কি শূন্যে দুলিতেছি ঠিক অনুভূত হইতেছে না। শয্যার যে এমন উত্তাপ হইতে পারে—সে কথাই কি কোনদিন ভাবিতে পারিতাম? এমন উষ্ণ ও অতি কোমল শয্যায় শুইয়া যে সকল চিন্তা আজ মনের দুয়ারে ভিড় করিয়া উঁকি মারিতেছে, তাহাদের চেহারাও তো কোনদিন কল্পনা করি নাই। সেক্রেটারিকে মনে হইল, ভদ্রবেশী বর্ব্বর। সূর্য্যের চেয়ে সূর্য্যোত্তপ্ত বালুকার মত উহার আচরণ। আমাকে মনে করিয়াছে, ধনীর প্রসাদলাভ করিয়া ও ধন্য হইয়া গেল! জীবনে এমন অট্টালিকা, এমন বৈভব, এমন ঘরের সান্নিধ্যে আসিবার সৌভাগ্য বুঝি আমার হয় নাই! হয় নাই—সে কথা সত্য; তবু, ওই বর্ব্বরটার

উপেক্ষা আমায় এমন তীব্রভাবে বিঁধিতেছে কেন? এমন চন্দ্রালোকিত রাত্রির মধ্যে মন কেন দূর সীমায় বিচরণ না করিয়া সঙ্কীর্ণ গহ্বরের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িল! বার দুই উঠিলাম, কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া চোখে মুখে দিলাম, তবু নিদ্রার দেখা নাই। না, এই উত্তপ্ত শয্যা ত্যাগ না করিলে—তিনি হয়ত আসিবেন না। কোনখানে কিছু না পাইয়া বিছানার তলা হইতে টানিয়া একখানি শতরঞ্জি বাহির করিলাম। একটা বালিশ উঠাইয়া জানালার ধারে শয্যা রচনা করিলাম। অন্ধকার ঘর বিদ্রূপহাস্য করিল কিনা জানি না, আকাশ সুনীল ও সুস্নিগ্ধ হইয়া আমার পানে চাহিয়া রহিল। আমিও আকাশের পানে চাহিয়া কখন এক সময়ে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

৩

প্রভাতে উঠিয়া নিজের অবস্থানটুকুকে ঠিকমত বুঝিতে আরও কিছুক্ষণ সময় গেল। অপূর্ণ নিদ্রার ঘোর হয়ত বা স্বপ্ন রচনা করিয়াছে; আমার অবচেতন মনের গুহা হইতে সুপ্ত কামনা সকল স্বপ্নরাজ্যে স্বচ্ছন্দ বিচরণের সঙ্গে আমার আজন্মের বৃত্তিগুলিকে ভিন্নমুখী করিয়া কৌতুক বোধ করিতেছে। বাহিরে যখন দারিদ্র্য ভোগ করিতেছিলাম, তখন মনে সম্পদ সঞ্চয়ের নেশার ঘোর গভীরতর হইতেছিল? দৃষ্টিতে নিরাবরণ স্বল্পতার মধ্যে নিত্য অসন্তোষের খুঁৎখুঁতানি জন্মলাভ করিতেছিল; সে দৃষ্টির গভীরে ছিল আত্মরতিপরায়ণ এক ভোগদুর্ব্বল মন। দুর্ব্বল বা কোমল মুহূর্ত্তে সেই উড়িয়া-যাওয়া মনকে মাটিতে টানিয়া নামানো কি কম সময়সাপেক্ষ!

দুয়ারে করাঘাতে মন ভূমিসংলগ্ন হইল। অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া শয্যা

ত্যাগ করিলাম। এবং নিজের পরম দুর্ব্বলতাকে ঢাকিতে তাড়াতাড়ি শতরঞ্জি ও বালিশ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে করিতে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, কে ? কে ?

আমি হরিশ, একবার দোরটা খুলুন না বাবু ?

দুয়ার খুলিয়া দেখি, সম্মার্জ্জনী হস্তে একজন চাকর দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া সে আভূমি নত হইয়া কহিল, ম্যানেজারবাবু ডাকছেন, এজ্ঞে। দোতলায় বড় বৈঠকখানায় ব'সে আছেন তিনি।

ভৃত্যের নির্দ্দেশে হল-ঘরে ঢুকিতেই সেক্রেটারি বলিলেন, আপনি কি রোজই এমনি বেলায় ওঠেন ? বসুন।

না, মুখ হাত ধুয়ে—

হরিশ—হরিশ, বাবুকে বাথরুম দেখিয়ে দাও। যান মুখহাত ধুয়ে আসুন, কথা আছে।

মুখহাত ধুইয়া চেয়ার গ্রহণ করিবার পর সেক্রেটারি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আপনাকে ওই অভ্যাসটি ছাড়তে হবে। রাত জেগে কবিতা লেখা কর্ত্তা পছন্দ করলেও, বেলায় ওঠা পছন্দ করেন না।

আমি বেলায় উঠি না।

তাই নাকি! আমাদের এখানে আটটাকে অনেকখানি বেলাই বলে। অন্ততঃ দু'ঘণ্টা বেলা তো বটেই।

আমার পাঁচটায় ওঠা অভ্যাস।

না, না, অতটা কৃচ্ছ্র সাধনার দরকার নেই। আরও একঘণ্টা গ্রেস আপনাকে অনায়াসে দেওয়া যেতে পারে। বলিয়া তিনি মুচকিয়া হাসিলেন।

মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিলাম, আমার সকালের প্রোগ্রামটি কি ?

বাঁধাধরা রুটিন ওয়ার্ক খানিকটা থাকলেও সবটা নয়। প্রোগ্রাম খানিকটা নির্ভর করে আপনার ওপর, খানিকটা কর্ত্তার ওপর, আর খানিকটা খোকাখুকুর ওপর।

স্পষ্ট করে বলুন, বুঝতে পারছি না।

এক কথায় বোঝাবার ব্যাপারও নয় তো। পড়ার রুটিনটা তৈরী করতে হবে আপনাকে, কর্ত্তা করবেন গল্প-আলোচনার একটা সময়কে নির্দ্দিষ্ট, তবে সেটা নির্দ্দিষ্ট বলার চেয়ে—অনির্দ্দিষ্ট বলাই যুক্তিযুক্ত; আর আপনার ছাত্রছাত্রী খেলা বা বেড়ানোর সময়টি নির্দ্দিষ্ট করবেন।

পড়াশোনা বাদে যে সময় থাকবে তাইত ওদের বেড়াবার বা খেলবার পক্ষে আপনি নির্দ্দিষ্ট হয়ে যাবে।

এতো আর পাশ করবার জন্য পড়াশোনা নয়—নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ওদের বাঁধবেন কি করে?

চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি টেবিলের উপর টোকা দিতে দিতে বলিলেন, সত্যিই কি কাল কবিতা লিখছিলেন, না গল্পের প্লট ভাঁজছিলেন?

কবিতা বা গল্প লেখা খুব সহজ মনে করেন কি?

যাঁরা লেখেন তাঁদের পক্ষে শক্তই বা কি। এই ধরুন আমার কথা। এক সময়ে—কিনা যখন কলেজে পড়তাম—প্রবন্ধে আমার হাত ছিল ভাল। ইংরেজী, বাংলা, দু'টোই ভাল আসতো। প্রফেসার মিত্র বলতেন, বিনয় তোমার যুক্তিগুলো যেমন জোরালো তেমনি বলবার ভঙ্গিটিও সহজ। একবার আইনষ্টাইনের থিয়োরী অব্ রিলেটিভিটি নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম খুব সোজা করে। প্রফেসার মিত্র বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিলেন, তাঁর ধারণাই ছিল না ও বিষয়ে অমন সংক্ষিপ্ত ও সহজ করে লেখা যায়। সেটা মডার্ণ রিভিয়ুতে পাঠাতেও চেয়েছিলেন।

একটু খোঁচা দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। কহিলাম, না পাঠিয়ে অন্যায় করেছেন।

অন্যায়? কেন?

অমন সুন্দর জিনিসটি থেকে সাধারণকে বঞ্চিত করলেন তো।

বিনয়বাবু আমার খোঁচাটি হয়ত অনুভব করিলেন না, কিম্বা অনুভব করিলেও গায়ে মাখিলেন না। হাস্যমুখে বলিলেন, প্রবন্ধ ছাপিয়ে নাম জাহির করবার ইচ্ছে আমার কোন কালে হয় নি, হয়ত হবেও না। লিখেই আমার তৃপ্তি। খানিক মৌন থাকিয়া হয়ত বা সেই তৃপ্তিতে আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া কহিলেন, আজকালকার ছোকরাদের হ'য়েছে কি জানেন? লিখতে যত পারুক আর না পারুক—নামটা ছাপার হরপে দেখতে পেলেই চতুর্ব্বর্গ। আর কি সব লেখা—কবিতা, গল্প, রঙ্গকথা—স্রেফ ট্র্যাশ!

তাঁহার বিকৃত মুখের ধিক্কারটা যেন আমার মুখের উপরেই সবেগে নিক্ষিপ্ত হইল। কর্ণমূল আরক্ত হইল, বুকের রক্ত দ্রুত চলিতে লাগিল, তবু চুপ করিয়া রহিলাম। আমি হাওয়া হইতে নামিয়া এখনও ভূমি স্পর্শ করিতে পারি নাই তো!

তিনি বলিলেন, আজকাল লোকে গুরুতর বিষয় নিয়ে চিন্তা করতে ভালবাসে না। তাই কাগজে কাগজে এত লঘু-সাহিত্যের হাল্‌কা সুর। দেশের অধোগতির এ একটা মস্তবড় লক্ষণ।

হবে।

হবে নয়—এ ধ্রুব সত্য। সত্যকার জীবিত যে জাতি—তার সাহিত্যও জীবন্ত। লঘু তরল জিনিস নিয়ে কোন জাত কি টি'কে থাকতে পেরেছে? ইতিহাসে এরকম নজীর একটা বার করুন দেখি? রোমক সভ্যতার পতন হবার কারণগুলো গিবনের বইতে পড়েছেন তো?

শ্রোতা নিরুপায় হইলে গিবনের তথ্য তো দূরের কথা, মোহ-মুদ্গরের ব্যাখ্যাও কানে ভরিয়া দেওয়া চলে। আমাদের মতকে যথার্থভাবে ব্যক্ত করিবার সাহস ও সুবিধা জীবনের কম সময়েই ঘটিয়া থাকে। অবস্থা অনুকূল হইলে সত্য কথা বলার ভঙ্গিই বদলাইয়া যায়, আবার প্রতিকূল অবস্থায় সত্য কথা বলার বিপদ পদে পদে। তবু বিনয়বাবুর কথার প্রতিবাদ করিতে পারিতাম, কিন্তু পায়ের তলায় মাটি না ঠেকিলে কণ্ঠের জোর আসিবে কোথা হইতে?

পুরা একটি ঘণ্টা বসিয়া বসিয়া আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের রসাতল-গমনের ইতিহাস শুনিলাম, কংগ্রেসের মূল আদর্শ বিশ্লিষ্ট হইল, জগৎ-পরিস্থিতির একটা সঙ্কটময় অশুভ মুহূর্ত্ত যে অত্যাসন্ন বুঝিলাম এবং বাঙ্গালী জাতির শঠামি ও সঙ্কীর্ণতা যে কত ভীষণ তাহাও কথঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করিলাম। আমার ছাত্রছাত্রী আসিয়া আমাকে বিনয়বাবুর উপদেশ-সমুদ্রের মাঝখান হইতে উদ্ধার করিল।

মাষ্টার মশায়, এঘরে আসবেন না?

যাবেন বৈকি। ওই পাশের ঘরেই আপনাকে পাঠশালা বসাতে হবে। যান, আইন-কানুন তৈরী করুন গে বসে বসে। আমি ততক্ষণ রিপোর্টটা লিখে ফেলি।

তিনি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন, ছাত্রছাত্রী লইয়া আমি কক্ষান্তরে আসিলাম।

ইহাদের দুষ্টামিভরা চোখের পানে চাহিলে বুদ্ধিদীপ্তির কিছুটা মিলে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের অধ্যায়ে সংলগ্ন হইলে সেই উজ্জল দৃষ্টি যেন স্তিমিত হইয়া আসে। অত্যন্ত সহজ প্রশ্নটাও—তখন মূঢ়বিস্ময়ে মৌন হইয়া উত্তরের গোলোক ধাঁধায় ঘুরপাক খাইতে থাকে। উত্তর বলিয়া দিলে মাথা চুলকাইয়া বলে, ওঃ—হাঁ। বুঝিলাম, ধনীর দুলালকে শিক্ষা দিতে

হইলে—বুদ্ধির চারিদিকে যে জটপাকানো গ্রন্থি আছে সেইগুলি সর্ব্বপ্রথম উন্মোচন করিতে হইবে। দাহ্য পদার্থ আছে, অগ্নি উৎপাদনের প্রণালী-টুকু জানাইতে হইবে।

সেই চেষ্টায় মাত্র আধ ঘণ্টা কাটিয়াছে ছেলেটি চঞ্চল হইয়া উঠিল, বড্ড মাথা ধরেছে স্যার, চলুন না একটু বেড়িয়ে আসি।

মেয়েটিও সুর ধরিল, হাঁ চলুন না।

কিন্তু এই পড়াটা মুখস্থ কর আগে। বইখানা সম্মুখে খুলিয়া ধরিলাম।

বাঃ রে, মাথা ধরলে বুঝি পড়তে ভাল লাগে! দাদু তো বলেন একটু বেড়িয়ে এলে উপকার হয়।

কিন্তু এটা না মুখস্থ করলে ভুলে যাবে যে।

মাথা ধরলে কিছু মুখস্থ হয় নাকি? ও বেলা পড়ব এখন। এখন ছুটি দিন।

ছুটির প্রার্থনা, না আদেশ? যে মাথা ধরিয়াছে প্রথমদিনেই তাহা লইয়া বেশি নাড়াচাড়া করিতে সাহস হইল না। রুটিন বাঁধিয়া দিবার মালিক আমি, কিন্তু রুটিন অনুযায়ী কাজ করা-না-করা উহাদের মর্জ্জি। তা ছাড়া ছেলেদের মনে-ধরার উপর মাষ্টারের স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। খেলার সময় খেলা আর পড়ার সময় পড়া এ নীতি সাধারণ ছেলের জন্য। যাহারা টাকা দিতে পারে অকৃপণভাবে, মাষ্টারকে চালাইবার ক্ষমতাও তাহারা রাখে। ছেলের অভিভাবকেরা এ বিষয়ে কতটুকু বোঝেন, জানি না, কিন্তু ছেলেরা পরানুগৃহীতের মূল্য বোঝে। আব্দারের মধ্য দিয়া আদেশটিকে ধ্বনিত করিয়া তুলিতে তাহারা পটু।

প্রকাণ্ড মোটরখানা গেটের সামনে দাঁড়াইয়া হর্ণ বাজাইতে লাগিল। ছেলেটি আমার হাত ধরিয়া কহিল, বাঃ আপনি যাবেন না? আসুন।

শুধু আদেশ নয়—করস্পর্শে হৃদ্যতাও অনুভব করিলাম। উৎফুল্ল কটাক্ষে বিনয়বাবুর কক্ষের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। মোটরে চড়িবার আহ্বান ইতিপূর্ব্বে আসে নাই বলিয়াই কি গৌরব বোধ করিতেছি?

ছেলেটি মোটরের কাছে দাঁড়াইয়া কহিল, ছোট্ট গাড়িখানা এনেছ কেন রামসিং? আট সিলিণ্ডারের পন্টিয়াক্‌খানা কোথায়?

বড় বাবু কাল বালিগঞ্জে নিয়ে গিয়েছেন, তিনি এখনও ফেরেন নি।

নাঃ, দাদুকে বলে আমরাও একখানা বড় মোটর কিনব। তিনজনে বসা যায় এতে?

আমি তো আরাম বোধ করিলাম। বসিবামাত্রই পুরু গদির থানিকটা বসিয়া গেল, মাথাটি পিছনের গদিতে গিয়া এলাইয়া পড়িল। সারা দেহে সেই শিরশিরানি ভাব—কাল রাত্রিতে শয্যাস্পর্শকালে যেমনটি অনুভব করিয়াছিলাম। এই সুখবোধ মন হইতে উঠিতেছে, না মজ্জা দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, কে জানে। যেন ঘুম আসিয়াও আসিতেছে না। চৈতন্য হরণের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে মিষ্ট অনুভূতিতে পরিশ্রান্ত ইন্দ্রিয়গুলি—অপরাহ্ন-বেলার পদ্মফুলের মত নিমীলিত হইতেছে বুঝি! ফাঁকা মাঠের দিগন্তে সূর্য্য অস্ত যাইতেছে, কিংবা জাগরণ-ক্লান্ত শরীরে ভোর বেলার মিঠা বাতাস লাগিতেছে। ক'দিন আগেকার দেখা কলিকাতার চেহারা এক নিমিষে বদলাইয়া গেল। মসৃণ রাজপথে শব্দহীন অষ্টিন পিছলাইয়া যাইতেছে, মসৃণ সেই গতিতে মনও আকাশে উঠিয়াছে। সমস্ত বৃত্তিই পরিষ্কৃত হইয়াছে। কে আমি ভুলিয়া গেলাম, কোথায় চলিয়াছি ভুলিলাম, কাহাদের লইয়া চলিয়াছি মনে রাখিবার কথা নহে। তবু তাহাদের অজস্র উৎসারিত ছেলেমানুষি কথার উত্তরে অনেক কিছু বলিলাম। বাগ্‌বাহুল্যে কিছু অসম্বৃতও হয়ত হইলাম।

ছেলেটি প্রকাণ্ড একটা গেট-সমন্বিত বাগান দেখাইয়া কহিল, এটা কি বলুন তো মাষ্টার মশায়? জানেন না?

মেয়েটি টপ্ করিয়া বলিল, লাট সায়েবের বাড়ি।

তুই বললি যে! এমন মুখভঙ্গি করিল, যেন প্রথম-বলার গৌরব হইতে উহাকে বঞ্চিত করার অধিকার মেয়েটির নাই। দ্বিতীয়বারে মেয়েটিকে সে সুযোগ না দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি আমার হাত টানিয়া বলিল, অক্টারলনি মনুমেণ্ট দেখেছেন? ওই দেখুন।

মাঠের বুকে প্রোথিত একটা শ্বেত গোঁজের মত মনুমেণ্ট দেখিলাম।

মেয়েটিই বা আনাড়ী মাষ্টারকে সহরের দ্রষ্টব্যগুলি চিনাইয়া গৌরব-ভাগিনী না হইবে কেন? সে আর প্রশ্ন করিল না, সরাসরি বলিল, ওই দেখুন হোয়াইটঅ্যাওয়ের দোকান-বাড়ি!

ভারি তো বাড়ি, ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরিটা কোথায় বল দিকি?

এই প্রতিযোগিতায় আমার লাভ এইটুকু হইল—শহরের নাম-করা কতকগুলি জিনিস চেনা গেল। মন্থরগতি মোটরের সুখাসনে বসিয়া এই যে জানাশোনার পালা—এ পালাকে উপভোগ করা যায়, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন। সুখাবেশে যে দৃষ্টি অর্দ্ধনিমীলিত—সেই দৃষ্টির আয়নায় প্রকৃত ছবিটি কোনকালেই কি যথার্থ ফুটিয়া উঠিবার অবসর পায়? প্রতিবিম্ব চিরকালই নিখুঁত।

রাস্তায় যাহারা পথ চলিতেছে—তাহাদের চেয়ে আমারা যে কত উঁচু সে ধারণার বর্ণ কি মনে আসিয়া লাগিতেছে? একটু একটু যেন লাগিতেছে। একজন অসাবধান পথিক মোটরের সম্মুখে আসিয়া কোন্ দিকে সরিয়া নিরাপদ হইবে—ভাবিয়া পাইল না। চারিদিকে 'গেল' 'গেল' একটা রব উঠিল। দক্ষ চালক মোটর রুখিয়া লোকটাকে

বাঁচাইয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে ঈষৎ অস্পষ্ট ও তীব্র একটা মন্তব্যও করিল। লোকটি ছুটিয়া ফুটপাথে গিয়া উঠিল।

ছেলেটি বিরক্ত মুখে বলিল, এমন কানা হয়ে পথ চলে সব! এইসা চাবুক হাঁকড়াতে হয়—বাছাধন মজাটি বোঝেন।

আমিও ভাবিলাম, লোকটারই দোষ। মোটরের হর্ণ বাজিতেছে ঘন ঘন; তাড়াতাড়ি রাস্তা পার হইবার এত কি দরকার তোমার ছিল বাপু? যদি আজ মোটরের চাকার তলায় পড়িতে....

মেয়েটি মন্তব্য করিল, ধর্ম্মতলার রাস্তাগুলো ছাই। যেমন ছোট—তেমনি পুরোনো বাড়ি সব।

অনেক ঘুরিয়া অনেকখানি বেলাতেই মোটর আসিয়া গৃহদ্বারে লাগিল। গেটের কাছে কয়েকজন উৎকণ্ঠিত লোক দাঁড়াইয়া আছে ও আঙুল দিয়া মোটর দেখাইয়া কি সব মন্তব্য করিতেছে—দূর হইতে নজরে পড়িল। মোটর থামিতে-না-থামিতে তাহারা একসঙ্গে কলরব করিয়া উঠিল, এই যে খোকাবাবু আর দিদিমণি।

চওড়া পাড় শাড়ি পরা মোটাসোটা গোছের একজন বয়স্থা স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া কহিল, মাষ্টার না হয় নতুন মানুষ, তোরই বা আক্কেল কি রাম সিং? সেই কোন্ সকালে বেরিয়েছিস—দুধের ছেলেদের টো টো করে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছিস? দিদিমণি বলে রেগে দশখানা হ'য়েছেন।

অপরাধীর মত একপাশে মাথা নীচু করিয়া দাঁড়াইলাম। রাম সিং অপরাধস্খালনের জন্য বলিল, তা হামি কি করবে, ওনারা মাষ্টার মশাকে কোলকাত্তা পচাস্তে লাগিয়েছেন। হামি বোলে—

থাম্, আর বক্ বক্ করিস নি। হাড়পিত্তি জ্বলে যায় কথা শুনলে! বেলা দশটা বাজে—ওরা ওষুধ খেয়েছে? ডালিম বেদানা খেয়েছে? দুধ খেয়েছে, না, মাংসের সুরুয়া খেয়েছে?

মেয়েটি স্ত্রীলোকটির কাছে আসিয়া কহিল, খিদে না পেলে ওসব খাওয়া যায় বুঝি? আমাদের বলে খিদেই পায় নি!

না, তোমরা পাকা হত্তুকী খেয়েছ কিনা, তাই খিদেতেষ্টা নেই! বলগে না— দিদির কাছে, এখুনি ডাক্তার ডাকিয়ে এনে তবে আর কাজ!

আহা, ডাক্তার প্রায় আসছে না! খাবনা ওষুধ—তার কি!

খেয়ো না বাপু, খেয়ো না। খেয়ে আমার মাথা রক্ষে করো না। এখন দর্শন দিয়ে ওদের প্রাণ জুড়োও গে।

ছেলেটি বলিল, মাষ্টার মশাই, দুপুর বেলায় আমাদেব গল্প বলতে হবে কিন্তু।

নিরুৎসাহভাবে মাথা নাড়িলাম। উহারা বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেলে স্ত্রীলোকটি আমার কাছে আসিয়া নরম গলায় বলিল, নতুন লোক আপনি, জান না তো, দিদিমণির হুকুম ছাড়া ওদের চৌকাটের বাইরে যাবার জো নেই। বড় শক্ত মেয়ে তিনি। একটু থামিয়া দেখিল, তাহার কথার আশঙ্কায় আমার মুখভাব বিবর্ণ হইয়াছে কিনা। পরে একটু হাসিয়া বলিল, চাকরি করতে এসে তোমার অত হাঙ্গাম পোহাবার দরকার কি বাপু? একখানা চিঠি লিখে দিদিমণির হুকুমটা নিয়ে— তবেই না হয় বেরুলে।

ভাগ্যে বিনয়বাবু উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার মুখের মৃদু বক্রহাসি দেখিলে আমার লজ্জার সীমা থাকিত না।

৪

খুশীর স্বর্গে খানিকটা বাস্তব-মাটি লাগিয়া রহিল। মোটর থাকিলেই —সময়ের স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া খুশীমত বেড়ানো চলে না। বড় বাড়ির

নিয়ম কানুনও বড়। বাঁধিয়া মাপিয়া সব জিনিসের দান-প্রতিদান চলিতেছে। সম্মুখ দিয়া কিছু উচ্ছি্রত হইবার জো নাই। কিন্তু সম্মুখ দিকটাই বড় বাড়ির সবখানি নহে। আরও কিছুদিন পরে অবশ্য সেকথা বুঝিলাম। পিছনে সুবিস্তীর্ণ যে পটভূমি পড়িয়া আছে, তাহাতে অন্ধকার যেমন গাঢ়, ছিদ্রও তেমনি বৃহৎ। সে ছিদ্র বৃহৎ বলিয়াই দেখা যায় না, অথবা মহত্ত্বে মণ্ডিত হইয়া লোকের মুখে মুখে রূপকথার মত বিস্ময় জাগায়।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা—সুবেশ ও সুসজ্জিত এক প্রৌঢ় প্রকাণ্ড একটি বাদামী রঙের মোটর হইতে নামিয়া হলঘরে আসিয়া ঢুকিলেন ও সরাসরি আমায় প্রশ্ন করিলেন, চেকটা আমার ক্যাশ করানো হ'য়েছে ?

আমি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলাম, আমাকে কোন চেক তো আপনি দেন নি ?

দিই নি ? অবাক করলে যে বিনয়। I mean—

বিনয়বাবু তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া দ্রুতপদে এ ঘরে আসিয়া বলিলেন, টাকাটা কি এখনই নেবেন বড়বাবু ?

নিশ্চয়ই। অথচ তুমি বলছ—আমি তোমায় চেক দিই নি! এই কি আমায় বিশ্বাস করতে বল ?

আজ্ঞে, আপনি নতুন মাষ্টার বাবুর সঙ্গে কথা কইছিলেন ?

মাষ্টার! এতক্ষণে তিনি আমার পানে চাহিলেন। লাল টক্‌টকে জবাফুলের মত দুটি ঢুলু ঢুলু নেত্র। সে দৃষ্টিতে পরিচয় বহনের ক্ষমতা নাই, অথচ প্রসন্নতা আছে। হাত বাড়াইয়া কণ্ঠস্বর চড়াইয়া কহিলেন, Excuse me, sir, আমি মনে করেছিলাম—I mean—মনে করেছিলাম—

আসুন আমার সঙ্গে, বলিয়া বিনয়বাবু তাঁহাকে ধরিলেন। তিনি

কিন্তু টলিতে টলিতে বলিতে লাগিলেন, ভেরি—ভেরি সরি, মাষ্টার। I mean—

হরিশ চাকর হাসিয়া বলিল, কদিন থেকে মাইফেল চলচে কিনা, কর্ত্তাবাবু বাড়ি থাকলে এতটা বাড়তে পায় না।

উনি কে?

কর্ত্তাবাবুর বড় ছেলে। আমাদের ঘরে হ'লেই দোষ—বড়লোকের মাহিত্তির।

খোকাখুকি কি এঁরই—?

না, ওনারা হ'লেন মেজবাবুর ছেলে মেয়ে।

মেজবাবু কোথায় থাকেন?

আর বাবু, পোড়া ভগমানের এমনি বিচার—ভাল জিনিসটিকে ভোগ করতে দেন না! আজ দু' বছর হ'ল জুড়ি গাড়ি থেকে পড়ে তিনি মারা গিয়েছেন। জিজ্ঞাসার অবসর না দিয়া নিজেই আরম্ভ করিল, তাই তো কর্ত্তাবাবু রাগ করে অত সাধের জুড়ি গাড়িগুলো বেচে দিলেন। অমন আরবি ঘোড়া গুলি করে মেরে ফেললেন। কম শোকটা পেয়েছেন উনি।

ঘরে বসিয়া ভাবিতেছিলাম, অর্থ থাকিলে অনেক দুঃখ যেমন ঠেকানো যায়, অনেক দুঃখকে তেমনি গ্রহণ করিতে হয়। ক্ষমতা ঠিকমত প্রযুক্ত হইয়া অনর্থকে নিবারণ না করিতে পারিলে—সে দুঃখের বুঝি তুলনা থাকে না। এই বাড়ি নিয়মের নিগড়ে বাঁধা। মনকে সুস্থ রাখিবার ইহার অনেক আয়োজন আছে, দেহকে সবল রাখিতে বহু ঔষধ, পথ্য ও চিকিৎসা বিদ্যমান; তবু, অসতর্ক ক্ষণে মৃত্যু এখানে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে। পথের মোটর চাপা না পড়িয়া—নিজের গাড়ির তলাতেই প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে।

বিনয়বাবু ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আজ সকালে তো একটি কাণ্ড বাধিয়েছিলেন! এ ভাবে কক্‌খনো ওদের বেড়াতে নিয়ে যাবেন না। ওদের মার অনুমতিটি আগে নেবেন, না হলে অনর্থ হবে।

আমি তো জানতাম না।

জেনে রাখুন। মেজবাবুর মৃত্যুর পর ওদের মা ওদের বিষয় দিনরাত চিন্তা করেন। তাঁর ধারণা, মার অনুমতি নিয়ে না বেরুলে ছেলেমেয়ের বিপদ ঘটবেই।

কেন এমন ধারণা?

মেজবাবুর যেদিন মৃত্যু হয়—সেদিন কর্ত্তাবাবু বলেছিলেন, সুজিত, আজ তুমি বিকেলে বেরিয়ো না। মেজবাবু বললেন, কেন বাবা? কর্ত্তাবাবু বললেন, মাঘ মাসের বিষ্যুদবারের বারবেলাটাকে আমি চির কালই ভয় করি। আমি দেবতা মানি না, সব রকম কুসংস্কারকে ঘৃণা, করি কিন্তু মাঘ মাসের বিষ্যুদবারের ভয় কাটিয়ে উঠতে পারি নে। ওই দিন বাবা অপঘাতে মারা গিয়েছিলেন, মা ছাদ থেকে পা ফসকে পড়ে তিনমাস শয্যাগত ছিলেন—তারপর মারা যান। তোমার গর্ভধারিণীও শ্রীপঞ্চমীর স্নান করতে গিয়ে আর ফিরে আসেন নি। মেজবাবু হেসে বললেন, আচ্ছা, আমি হেঁটে যাব না। তোমার ভাল জুড়িটা করে শ্যামবাজার থেকে একবার ঘুরে আসব মাত্র। শেয়ার মার্কেটের আজ একটা খবর আছে, মিঃ সিনহা তা জানেন। সেটুকু না জানতে পারলে—প্রায় লাখ খানেক টাকা নষ্ট হবার চান্স। কর্ত্তাবাবু শুধু বললেন, লাখ টাকা কি এমনই বেশি—যে তোমার যাওয়া আবশ্যক? মেজবাবু হেসে বললেন, যাব আর আসব। হাঁ, বেশি দেরি হয় নি—মিনিট দশেক পরেই তাঁর রক্তমাখা প্রাণহীন দেহ ফিরে এসেছিল।

বিনয়বাবু আজ অনেকখানি সহজ হইয়া গল্প করিতে লাগিলেন।

শোক সর্ব্বব্যাপী বলিয়াই হয়ত মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবধানকে কিছু কমাইয়া আনে। শোকের ম্লান ছায়ায় বক্তা ও শ্রোতা একটু ঘেঁষা-ঘেঁষি হইয়াই বসে। এক হৃদয় হইতে যে হাওয়া বহিতে থাকে আর একটি প্রাণকে তা ধীরে অথচ গভীর ভাবেই স্পর্শ করে। একই মেদুরতায় দুইজনের চোখেই দৃষ্টির দরদ ফুটাইয়া তোলে। সমুদ্রের জলে ও আকাশের মেঘে যেমন অন্তরঙ্গতা—তেমনই নিত্যসম্বন্ধের বন্ধনকে বিস্তার করে ও গাঢ় করে। শোকে জীবন বিস্বাদ লাগে—অথচ জীবনের তলদেশ পর্য্যন্ত চাহিবার ক্ষমতাও আয়ত্ত হইয়া যায়।

দাসী আসিয়া বলিল, খাবার জায়গা হয়েছে মাষ্টারবাবু।

একটু পরেই না হয়—

বিনয়বাবু বলিলেন, না মশায়—ঘড়ির সঙ্গে সব নিয়মই এখানে বাঁধা। একটু পরে হলে অনেক কিছুরই ওলোট-পালোট হবে।

আপনি খাবেন না?

আমি? না। একটু থামিয়া বলিলেন, আপনাদের বাংলা খাবার-গুলো আমার ঠিক পরিপাক হয় না।

কিন্তু এইটিই না-খাইবার হেতু কিনা বুঝিলাম না।

কাল যেখানে বসিয়া আহার করিয়াছিলাম—আজ সেখানে আমার আসন পাতা হয় নাই। একেবারে অন্দর মহলে ঢুকিতে গিয়া ইতস্ততঃ করিলাম বৈকি।

দাসী বলিল, আসুন না? চোখ কান বুজিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। কি জানি, কেমন যেন মনে হইল, নব আগন্তুক সম্বন্ধে কোন অন্তঃপুরই কোনকালে নিস্পৃহ নহে। অপরিচিতের পায়ের শব্দ উঠিলেই সেখানকার জানালাগুলি আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়,

কিন্তু তাহার অন্তরালে প্রাণগুলি চঞ্চল হইয়া উঠে। সেখানকার চক্ষুগুলির পালকের মধ্যে নূতনের প্রতিচ্ছবিটি বন্দী হইয়া বিশ্লিষ্ট হইতে থাকে। সেখানের বিচারশালাটিতে প্রথম দেখার ক্ষণ হইতে লোকটি সম্বন্ধে সওয়াল-জবাব বাদ-প্রতিবাদ সুরু হইয়া যায়। অন্তঃপুর খাঁটি নিকষ পাথর—মানুষের মূল্য যাচাই সম্বন্ধে তার নির্দ্দেশকে শঙ্কা-মিশ্রিত আনন্দের সঙ্গেই গ্রহণ করিতে হয়।

শুধু কি চোখের দৃষ্টি পায়ের পাতায় রাখিয়া পথ চলিতেছিলাম? আমার ইচ্ছা না থাকিলেও—দৃষ্টি অলক্ষ্যে উঠা-নামা করিতেছিল। দৃষ্টি চিরদিনই মনের হাত ধরিয়া চলে! এই চঞ্চল মনকে বশীভূত করিবার জন্য গীতায় একটা অধ্যায়ই লিখিত হইয়াছে। অর্জ্জুন বলিতেছেন, মন চঞ্চল। কৃষ্ণ স্বীকার করিতেছেন, মন চঞ্চল। চঞ্চল মনকে বশীভূত করিবার উপায় অভ্যাস—শুধু অভ্যাস। সে অভ্যাস, সে সংযম, সংসার-ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ প্রৌঢ় অর্জ্জুনের মনকে বহু আয়াসে আশ্রয় করিয়াছিল। সংসার-প্রবেশ-মুখী উৎসুক মন আমাদের—যৌবন-চাঞ্চল্যে বহির্মুখী। আমাদের মনকে বাঁধিবার জন্য গীতার শ্লোক আছে, স্বয়ং রচয়িতা নাই। সুতরাং গীতা মনে আসে নাই, অন্তঃপুরের গোপনচারিণীদের পদধ্বনিই সেখানে বাজিতেছিল। অন্দরমহলের দু'টি রূপ দেখিলাম। যে কাল চলিয়া গেছে আর যে কালের মধ্যে বাস করিতেছি। যে কাল আসিবে তাহার আভাষও যেন এই দুই কালের মধ্যবর্ত্তী তরল ছায়ায় ফুটিতে চাহিতেছে। চওড়া দালানের একধারে চেয়ার, ভোজন-টেবিল, কাঁটা চামচ, প্লেট, ফ্লাওয়ার ভাস, বারান্দায় ঝুলানো লতা, বিলাতী ছবি—একটা খৃষ্টের শেষ নৈশ-ভোজনের, একটা চির রহস্যময়ী মোনালিজার, একটা কাবুলযুদ্ধে নিহত ষোল হাজার বৃটিশ সৈন্যের একমাত্র জীবিত সৈনিক ডাঃ ব্রাইডনের

পরিশ্রান্ত মূর্ত্তি, একখানি দার্জ্জিলিং শৈলের অপূর্ব্ব দৃশ্য—কাঞ্চনজঙ্ঘার ধবল শিখর শ্রেণী। আরও অনেকগুলি ছবি দৃষ্টির দুটিপাশ দিয়া সরিয়া গেল—লাজুক দৃষ্টি তাহাদের পরিচয় লইতে পারিল না। এদিকের জানালায় জানালায় সুদৃশ্য পর্দ্দায় ফুলছবি আঁকা, এদিকের বায়ু উগ্র পুষ্পসার সুরভিতে ভারাক্রান্ত। সীলিঙ বিচিত্রিত, পঞ্চমুখী ব্রোঞ্জ বা পিতলের সুদৃশ্য ঝাড়ে বাহারী ফানুসের মুখে বৈদ্যুতিক বাতি লাগানো, অসলারের পাখা অল্প অল্প ঘুরিতেছে। একটা খাঁচায় কয়েকটা ক্যানারি জাতীয় পাখী—আর একটা খাঁচায় এ-দেশীয় বুল্‌বুল্‌। দাঁড়ে একটা হীরামন আর একটা চন্দনা পাখী বুলি কপচাইতেছে। তবে এগুলি বারান্দার প্রান্তদেশে—ভোজন-টেবিল হইতে অনেকখানি দূরে অবস্থিত। বারান্দার উপরে যেমন ঝুলানো লতাগাছ, নীচেয় টবে বসানো তেমনি সারি সারি রজনীগন্ধা, গোলাপ ও ক্রোটন শোভা পাইতেছে। এই অংশকে বর্ত্তমান বলিতে পারি।

এই সীমানা পার হইয়া যে সীমানায় আসিলাম, তাহাই বুঝি অতীত। বারান্দা তত চওড়া নহে, টেবিল চেয়ারের বিন্দুবাষ্পও নাই। ফুল গাছ নাই, ছবি নাই, পাখী নাই, বৈদ্যুতিক পাখাও নাই। বারান্দার রং গৈরিক অর্থাৎ এলামাটির প্রলেপ। জানালাগুলি খড়খড়িযুক্ত, দুয়ারের মাথায় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা বিনায়কের মূর্ত্তি। উগ্র পুষ্পসারসুরভি নহে—মিষ্ট তাজা ফুলের গন্ধই বায়ুমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। হয়ত কোথাও পূজাগৃহ আছে, ধূপধূনা গুগ্‌গুলের গন্ধও আসিতেছে। প্রকাণ্ড একখানা কার্পেটের আসন দালানের একপ্রান্তে পাতা। আসনের সম্মুখে প্রকাণ্ড বগিথালায় চূড়াকৃতি অন্ন আর তাহার চারি পাশে নানা আকারের অনেকগুলি ঝকঝকে কাঁসার বাটিতে অনেক প্রকারের ব্যঞ্জন। অন্ন হইতে ধূম উঠিতেছে, ব্যঞ্জন হইতে সুগন্ধ উঠিতেছে। আসনে বসিয়া

ক্ষুধা অনুভব করিলাম। কেমন যেন একটা পরিতৃপ্ত ভাবও মনের মধ্যে জাগ্রত হইয়া উঠিল। এত উপকরণ—এত আয়োজন, তবু এ যেন বাহুল্যে উপচিত হইয়া পড়িতেছে না. সামর্থ্যের অভ্যর্থনাকে ছাপাইয়া আড়ম্বরকে প্রকাশ করিতেছে না। পারিপাট্যে ইহা গৃহের সামান্য উপকরণের মতই প্রসন্ন।

আমি জানি, সম্মুখে অন্ন সাজাইয়া অন্তরালে অন্নপূর্ণারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন। ভোজনের যেখানে এমন ঐকান্তিক আয়োজন, অন্নপূর্ণার উপস্থিতি সেখানে ধ্রুব। তাই কোন্ ব্যঞ্জনটি প্রথম গ্রাসের সঙ্গে মুখে তুলিব—সেও এক সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন লইয়া এমন বিপদে পূর্ব্বে পড়ি নাই, নির্জ্জন ভোজন কক্ষ হইলে এ বিভ্রাট বাধিত না। খোলা বারান্দা, সম্মুখে একজন পরিচারিকা হাত-পাখা লইয়া বাতাস করিতে বসিয়াছে। ও যদি না থাকিত—তাহা হইলেও বা কথা ছিল। কুণ্ঠাশূন্য হাত যে বাটিতে ঠেকিত নিয়ম পালনের দায়িত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া খুশীমনে যা কিছু গ্রহণ করিতে পারিতাম।

কে জানে, ইতস্ততঃ করিতে কতক্ষণ আমার কাটিয়াছিল! একবার মুখ তুলিয়া পরিচারিকাকে বলিলাম, বাতাস করিবার প্রয়োজন নাই। দায় হইতে মুক্ত হইয়া সে একটু দূরে গিয়া দাঁড়াইল; আমার কখন কি প্রয়োজন হয়—তাহারই অপেক্ষায় হয়ত। মাঝখানের একটা বাটিতে হাত দিতেছিলাম—লঘুপদে কে যেন আমার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল অনুভব করিলাম। লজ্জা গাঢ় হইল—মুখ তুলিতে পারিলাম না। একটা পরিচারিকা আমার আনাড়ীত্ব লইয়া উপহাস করিবে—একথা মনের মধ্যেও স্থান দিলাম না। রুচিজ্ঞানের দোহাই দিয়া আমার ভুলকে সংশোধন করিয়া লইব—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। সেই বাটিটাই টানিয়া লইলাম।

সামনের বাটিতে সুক্তো আছে—আগে ওইটে নিন।

রুচিজ্ঞানের দোহাই দিয়া হয়ত বলিতে পারিতাম, সুক্তো আমি খাই না। কিন্তু সুমিষ্ট অথচ সম্ভ্রমপূর্ণ কণ্ঠস্বরে মিথ্যা কৈফিয়তে ভুল সংশোধনের চেষ্টা করিলাম না। কৌতূহলবশে মাথা তুলিয়া চাহিতেই তিনি সম্মুখে আসিয়া—দাসী-পরিত্যক্ত পাখাখানা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে আমার সন্নিকটে বসিয়া পড়িলেন।

প্রথমটা লজ্জা হ'য়েছিল—সামনে আসতে পারি নি। কিন্তু দেখলাম আপনি—আমার ছোট ভাইয়ের বয়সী। আপনাকে লজ্জা করা মানে, নিজেকেই খাটো করা। বলিয়া হাসিলেন।

বয়স কতই বা তাঁহার। দেহের লাবণ্য ও বর্ণের মধ্যে বয়স আত্ম-গোপন করিয়া আছে। বয়সের কৌতূহল ছাপাইয়া—তাঁহার সজ্জা আমাকে ঈষৎ পীড়া দিল বুঝি! এমন বয়সে—শাদা পাড় ধুতি পরা হয়ত মানায় না। কিন্তু দৈবের কাছে বেমানান বলিয়া কোন বস্তু নাই, এবং আমিও এই মুহূর্তে বেমানান কিছু দেখিলাম না। কাছে বসিয়া মিষ্ট কথায় আহারের জন্য সস্নেহ অনুরোধ, এ যেন শুভ্রবসনধারিণীদেরই মানায়। কেহ হয়ত হাসিয়া বলিবেন, একটু আগে অন্নপূর্ণার সঙ্গে ইঁহাদের তুলনাটা তবে মনে জাগিয়াছিল কেন? সে প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু শুধু বলা যায়, ভিখারী শিবের সম্মুখে উপবিষ্ট অন্নপূর্ণার ছবি টাঙানো আছে আমাদের ঘরের দেওয়ালে—তাই অন্ন-আয়োজনের মধ্যে কল্পনার চোখে তিনিই একবার উঁকি দিয়াছিলেন মাত্র। সেই ঘরেই যখন আহারে বসি—শুভ্রবসনধারিণী মা আসিয়া পরিবেশন করিয়া যান। শরীরী মূর্তির শুভ্রবসনটাই তাই আমার বাস্তবকে অন্নদায়িনীর সৌন্দর্যের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। তাই ইঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে, অন্নথালির সম্মুখে বীজনরতা আর কোনও মূর্তির তেমন সৌন্দর্য্য বুঝি

চোখের দুয়ার দিয়া মনকে এমন প্রসন্ন করিয়া তুলিতে পারিত না। পীড়া যা পাইয়াছিলাম পরে, ভোজন-তৃপ্তির পর চিন্তার অবকাশ-মুহূর্ত্তে।

তিনি বলিলেন, কোন্‌টার পর কোন্‌টা খেতে হয়—এটুকু বলে দেবার ভার আমাদের ওপর। ওতে আর লজ্জা কিসের। তা ছাড়া আজ একটু বিশেষ আয়োজনে আপনাকে—, একটু থামিয়া—একটু হাসিয়া বলিলেন, একটা কথা বলব?

বলুন না।

কথাটা এই—লজ্জা করব না আর। আগেই বলেছি না—আমার ছোট ভাই দেবুর বয়সী তুমি।

বেশত বলুন না।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, ওই তো বলা হ'য়ে গেল। দেবুকে তুমি বলি—তোমাকেও আপনি বলতে পারলুম না আর।

শেষ সঙ্কোচটুকু এমনই সহজভাবে তিনি ঘুচাইয়া দিলেন। পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলাম, এঁটো হাত না হ'লে—

প্রণাম করতে? না, যে জন্যে তোমাকে আমার খাওয়ানো—তাহলে তা সার্থক হবে না। তুমি যে আজ আমার ব্রাহ্মণ।

আমি তো চিরকালই ব্রাহ্মণ। আজ বিশেষ করে—

আজ যে বিশেষ দিন, ভাই। বাইরের অনেকের নিমন্ত্রণ হ'য়েছে। তাঁদের জন্য অন্য ব্যবস্থা আছে। কিন্তু তোমাকে প্রথম খাওয়ানোর মানে, এ বাড়িতে তুমি আর ত কখনো খাওনি।

কেন, কাল তো খেলাম।

কাল যা খেয়েছ—তা নিমন্ত্রণ খাওয়া নয়, বা আমাদের হিন্দুপ্রথামত খাওয়া নয়। হোটেলের খাওয়াকে কি নিমন্ত্রণ মনে কর?

কাল তো হোটেলে খাইনি।

হাঁ, বিলটা চুকোওনি বটে, তবু সে খাওয়াকে আমি খাওয়া বলি না;—আমাদের বাড়িতে আজ তোমার প্রথম খাওয়া।

চমৎকার কথাগুলি—অত্যন্ত সহজভাবে ও গভীর ভাবেই মনকে স্পর্শ করে। এ বাড়ির বাহিরের সমৃদ্ধিটা আমার পক্ষে রীতিমত ভয়ের কারণই ছিল, এইক্ষণে বুঝিলাম, বড়বাড়ির বড়ত্ব বাহিরে যেমন সুপ্রকট, ভিতরে তেমনই সুলভ। তবে বাহিরের খোলসটার ঔজ্জ্বল্য কিছু বেশি বলিয়াই—ভিতরটাকে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন

কিছু বলছ না যে? বলিনি ঠিক কথা?

আপনি এমন করে ভাবতে পারেন!

কেন, বাইরের ভড়ং দেখে মনে করেছ ভাবনাচিন্তা গুলোও দেউড়ি পেরুতে সাহস পায় না?

না, তা বলিনি।

তুমি না বল—ওরকম ধরণের কথা প্রায়ই শুনি কিনা। আমার বৈধব্যের মধ্যেও তারা অফুরন্ত সুখেব সন্ধান পায়

হাতের অন্ন মুখে উঠিবার কালে ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। সেটুকু তিনি লক্ষ্য করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, সুখের সন্ধান পাবে না-ই বা কেন? এমন প্রাসাদ ও অনেক টাকার কোম্পানীর কাগজ একজন বিধবার পক্ষে যথেষ্ট সুখ কি বহন করে আনতে পারে না। ওষ্ঠপ্রান্তে তাঁহার ক্ষীণ-হাসির রেখা মিলাইয়া গেল।

বেদনা অনুভব করিলাম।

ওকি, এরই মধ্যে পেট ভরে গেল! না, না, তা হবে না। আজ আমি নিজের হাতে রেঁধেছি, সব জিনিস না খেতে পার—চাখতেও হবে অন্তত।

সেই তো মুশকিল!

জান, না খেতে পারলে ব্রাহ্মণ-ভোজনে অর্দ্ধেক ফল!

ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, তাতো জানি না।

জেনে রাখ। না হ'লে ভবিষ্যতে নিমন্ত্রণ জোটা ভার হবে। বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

খাওয়া শেষ হইলে—যাইবার উদ্যোগ করিতেছি, তিনি বলিলেন, একটু দাঁড়াও—আমি আসছি।

অনতিবিলম্বে পানের ডিবা ও রেকাবি হস্তে ফিরিয়া আসিলেন। পান নাও। খাও না? মশলা দু'টি নাও। ডিবা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, আরও আছে— হাত পাত। পাত হাত! আঃ, লজ্জা দেখ! বলিয়া আমার সঙ্কুচিত করের মধ্যে একটি টাকা গুঁজিয়া দিলেন।

এসব আবার কেন? মূঢ়ের মত বলিলাম।

ব্রাহ্মণ ভোজনের দক্ষিণা। দক্ষিণা না দিলে কি কার্য্যসিদ্ধি হয়! বলিতে বলিতে গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া একটি প্রণাম মাটির উপরে রাখিলেন।

দুই পা পিছাইয়া গিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, এ কিন্তু অন্যায়।

মৃদু হাসিয়া তিনি বলিলেন, অন্যায় কিসের? এই প্রথা। তোমাকে ভাই বলে ডাকলাম—কিন্তু তারও উপরে তোমার ব্রাহ্মণত্বকে তো ভুলতে পারি নে।

সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, একটু আগে বললেন, এ বাড়িতে আজ আমার প্রথম খাওয়া। কিন্তু আমি তো দেখছি, এ খাওয়া নয়—নিমন্ত্রণ।

নিমন্ত্রণটা কি খাওয়া নয়? ওতে আহ্বান আছে, আন্তরিকতা আছে —মর্য্যাদাও আছে তো।

সবই আছে, শুধু নিমন্ত্রণ খেয়ে ভাই হওয়া চলে না।

তিনি একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, হার মানলুম ভাই। আজ বিশেষ দিন বলে এই অত্যাচারটা হ'ল, কাল থেকে আর....সহসা কি ভাবিয়া বলিলেন, কাল থেকে তো সাহেবি খানা, আমার কথা দেওয়া-না-দেওয়া সমান কথা।

আপনার ভাইটিকেও কি সাহেব মনে করেন?

না, কিন্তু এ বাড়ির আইনকানুন কিছু কড়া। তা ছাড়া আমি তো দু'দিনের অতিথি। আমার বিস্মিত ভাব দেখিয়া বলিলেন, কাল তোমায় ডাকিয়ে গল্প করব'খন। না হয়, খাবার নিমন্ত্রণই রইলো—যদি অসুবিধে না হয়।

অসুবিধে হবে কেন?

এখানে মাছ-টাছের হাঙ্গামা নেই তো, খাঁটি বিধবার আশ্রম।

বলিয়া দুয়ারের দিকে কিছু অগ্রসর হইলেন। বুঝিলাম, বিদায়ের ইঙ্গিত। আমিও অগ্রসর হইতে হইতে বলিলাম, বাড়িতেও আমার জন্য মাছের ব্যবস্থা নেই। কালেভদ্রে মা জোর করে রাঁধতেন।

কেন, বাঙ্গালী বাড়িতে অমন প্রথা?

বাবা অনেকদিন মারা গেছেন বলে--

থাক, থাক, বুঝেছি। দুর্ভাগ্য নইলে—ত্যাগের সুযোগ আমরা পাই না তো। অস্ফুট স্বরে অনেকটা আত্মগত ভাবেই যেন কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

ত্যাগের কথা কি বলছেন?

সাধারণের কথা নয়, আমার ধারণা। ওই যে ব্রাহ্মণরা সব আসচেন। বলিয়া ব্যস্তভাবে পিছন পানে চাহিলেন।

হাত তুলিয়া কি বলিতে গিয়া দেখিলাম, তিনি খানিকটা দূরে চলিয়া গিয়াছেন।

পরিচারিকা বলিল, আসুন বাবু।

অতীত মুছিয়া গিয়াছে—আবার বর্ত্তমানের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। টেবিল-চেয়ার-সমাকীর্ণ—পর্দ্দা-বিলম্বিত—আধুনিক রুচিসজ্জিত বারান্দাটা অতিক্রম করিতেছি।

৫

বিনয়বাবু বাহিরের ঘরেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমাকে দেখিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, ব্রাহ্মণ-ভোজন হ'লো ?

হাঁ, বলিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলাম।

বসলেন কেন, একেবারে শুয়ে পড়ুন গে। ব্রাহ্মণ-ভোজনের পর ডিউটিটুকু বজায় রাখা চলে না, শয়নই সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ পন্থা।

আপনি জানলেন কি করে ?

গল্প অনেক শুনেছি—চোখেও দেখেছি অনেক। আমাদের এক প্রতিবেশী ছিলেন, তাঁরা রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে প্রায় চেঁচিয়েই হিসাব করতেন। কোথায় কোন্ দিন নিমন্ত্রণ হতে পারে, কি কি আইটেম, ঢালাও মিষ্টান্ন না গোনা মিষ্টান্ন, কত দক্ষিণে—এই সব হিসাব। বলিয়া মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

প্রথম দিন হইতেই তাঁহার হাসিটা আমার ভাল লাগে নাই। ব্যঙ্গ-মিশ্রিত সে হাসির চাপা রূপটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি না হইলে হয়ত ধরা পড়ে না, এবং ধনীর বাড়ির সেক্রেটারিত্ব পাইয়াই হয়ত বা সেই হাসিটুকু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অধোগতি লইয়া এই ইঙ্গিতটুকু আমার অন্তরে বিঁধিল। একটু তীব্র কণ্ঠেই বলিলাম, তাঁরা গরিব বলেই হয়ত ওই রকম হিসাব করতেন।

ভুল করবেন না। অনেক পয়সাওয়ালা ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণের নামে

আনন্দ প্রকাশ করতে দেখেছি।

কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিলেও—কোন প্রত্যুত্তর করিলাম না। চোখ নামাইয়া টেবিলের উপর সংবাদপত্রখানা টানিয়া লইয়া তাহাতেই মনঃসংযোগ করিলাম। মনঃসংযোগ আর করিতে পারিলাম কই? চোখের সম্মুখে কাগজখানা পড়িয়া রহিল, মনশ্চক্ষে দেখিলাম, হাস্য-পরিতৃপ্তমুখে বিনয়বাবু আমার অবনত ও আঘাতপ্রাপ্ত শুষ্ক মুখের পানে চাহিয়া আছেন। আমাদের জন্মগত দারিদ্র্যের প্রতি এই কটাক্ষ? কিন্তু উষ্ণ হইলে চলিবে না। উষ্ণতার মধ্য দিয়া আমার দুর্ব্বলতাকে প্রকাশ করিবার সুযোগ দিয়া কেন উঁহার উপভোগকে বিলম্বিত করিয়া তুলিব?

বিনয়বাবু হাসি থামাইয়া বলিলেন, যদি ব্যথা দিয়ে থাকি, মাপ করবেন।

ব্যথা কিসের? প্রসন্ন ভাবেই তাঁহার পানে চাহিলাম।

তিনি ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, কি জানি আমার মনে হ'লো—

ব্যথা পাব কেন! জোর করিয়া হাসিলাম ও কণ্ঠকে সতেজ করিয়া কহিলাম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম বহুকাল ভারতবর্ষ থেকে লুপ্ত হ'য়েছে। সব দিকেই শূদ্রশক্তির প্রভাব। এমন দিনে এইটাই হওয়া সম্ভব নয় কি?

অন্তর্নিহিত শ্লেষের সুরটি তিনি ভুল বুঝিলেন না। উত্তর দিলেন, তবু পৈতে দেখিয়ে এ ভণ্ডামি আর কতদিন চলবে বলতে পারেন?

মনে মনে খুশী হইলাম। উষ্ণ জবাবে বুঝিলাম, আঘাতটি ঠিক জায়গায় পড়িয়াছে। হাসিমুখে বলিলাম, অন্তত যতদিন শূদ্রশক্তি প্রবল থাকবে। ধনের লালসা আর ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দুটোই ওর বিশেষত্ব কিনা।

বিনয়বাবু ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, ধনের লালসা আর ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কোনকালে ছিল না শুনি?

বলিলাম, লালসা আর আড়ম্বর সবকালেই ছিল, সবকালেই থাকবে। কিন্তু তা ছাড়াও যে নির্লোভিতা আর ত্যাগের দৃষ্টান্ত পাই—

কি করে জানলেন তা সত্যিকারের নির্লোভিতা বা ত্যাগ? বাহাদুরি নেবার ফন্দী-ফিকিরও তো হ'তে পারে সেগুলো?

হতে পারতো—যদি না আজীবন দারিদ্র্যকে তাঁরা সঙ্গী হিসেবে নিতেন। কোন বিশেষ ক্ষণে প্রলোভনকে জয় করার মধ্যে বাহাদুরি হয়ত আছে, সর্ব্বক্ষণের জন্য তাকে এক পাশে সরিয়ে রাখার মধ্যে সে সন্দেহ যে আসতেই পারে না। একটু থামিয়া বলিলাম, কিন্তু শূদ্রপ্রধান দেশে—এ ব্রাহ্মণ্য মনোবৃত্তিকে বোঝানোও তো কম দুষ্কর নয়।

তিনি বলিলেন, নিজের কথা বলছেন, না কারও প্রতিধ্বনি করছেন?

প্রতিধ্বনি হ'লেও—কথাগুলো কি মিথ্যে?

মিথ্যে না হোক, কথাগুলো আপনার নিশ্চয়ই নয়। যেন আমার কথা হইলেই বিনয়বাবুর পরাজয়ের গ্লানিটা কিছু গাঢ়তর হইত!

বলিলাম, না, কথাগুলো আমার নয়। আমাদেরই কোন এক শ্রেষ্ঠ কবির কথা।

তাই বলুন! বলিয়া সহজ হইবার চেষ্টায় বলিলেন, ওগুলো উপমার ক্ষেত্রে চলে বটে। নৈলে পৈতে নিয়ে ব্রাহ্মণত্বের বড়াই যাঁরা করে তাঁরাই ব্রাহ্মণ।

গুণ-কর্ম্মের বিভাগটা তাহলে মানেন না?

যথা? কৌতুকে চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তিনি হাসিলেন।

গীতায় যে চারটি বর্ণের উল্লেখ আছে—

গীতাও পড়েছেন? আর কি পড়েছেন?

তাঁহার ব্যঙ্গ যে এমন নিষ্করুণ হইতে পারে ও এতটা হীন মনোবৃত্তিকে প্রকাশ করিতে পারে—সে ধারণা আমার ছিল না। লোকটিকে কিছু-

পূর্ব্বে মনে হইয়াছিল অনেকখানি সরল, কিন্তু তর্কের ক্ষেত্রে দেখিলাম তিনি নিষ্ঠুরও বটে! অথবা এই নিষ্ঠুরতা বুঝি মানুষের স্বভাবজাত। বেদনার ক্ষেত্রে বৈদগ্ধ্যকে প্রকাশ করিবার আবশ্যক হয় না। বেদনা সমস্ত বৃত্তিকে আঘাত-জর্জ্জর করিয়া সুকোমল এক সর্ব্বজনীন মেঘলোকে মনকে টানিয়া আনে। সেখানে প্রশ্ন নাই, বিশ্লেষণ নাই—শুধু অনুভূতির গাঢ় প্রকাশ। অশ্রু-করুণ মুহূর্ত্তে সব-ভাসাইয়া-দেওয়া অনুভূতি। সেখানো তো খাটো হইবাব প্রশ্ন জাগে না ; আঘাত লওয়ার সহিষ্ণুতার মধ্যে আঘাত কবার নিষ্ঠুরতা আসিবে কেন?

ক্ষেত্রান্তরে মানুষ ইস্পাতের মত কঠিন হইতে পারে। অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি তার থাকুক চাই না থাকুক, গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধার সৌধ সে নির্ম্মাণ করিয়াই চলে। নিজের তৈয়ারী জিনিসের নিন্দায় চিরকালই সে অসহিষ্ণু, সেই অসহিষ্ণুতা হইতেই আঘাত-পটুতার জন্ম। বিনয়বাবুকে এমন এক জায়গায় আঘাত করিয়াছি—যাহার বেদনা বিস্মৃত হইবার জন্য প্রতি-আঘাত না করিয়া উঁহার শান্তিলাভ হইতেছে না।

উত্তর না দিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতেছিলাম, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, আজ সন্ধ্যাবেলায় যদি বেড়াতে যান—আমি অনুমতিটা না হয় আনিয়ে রাখি।

না, আজ আর কোথাও যাব না।

গুণ-কর্ম্মের বিভাগটা আমায় বুঝিয়ে দিন না? মুখে তাঁহার সেই ব্যঙ্গ-রঞ্জিত মৃদুহাসি।

ঈষৎ বেগের সঙ্গে বলিলাম, গীতা না পড়লেও—ও বিভাগটা আপনি ভাল করেই জানেন। সঙ্গে সঙ্গে স্থানত্যাগ করিলাম।

খোলা জানালার সামনে মধ্যাহ্নের আকাশ প্রসারিত। প্রখর

সূর্য্যকিরণ কার্ত্তিকের মাঝামাঝি ভাদ্র মাসের মত দাহ বা ধূমরেখা বিস্তার করিতেছে না। অয়নপথের পরিবর্ত্তন হওয়াতে—একটা আসন্ন শীতের আলস্যে মধ্যাহ্ন যেন মন্থর হইয়া উঠিতেছে। চেয়ারে গা ঢালিয়া —পায়ের উপর একখানি পাতলা চাদর ঢাকা দিয়া এই স্বপ্লায়ু মধ্যাহ্নে খানিকটা স্বপ্নজাল বুনিতে ভালই তো লাগিতেছে! নানা ব্যঞ্জন উপকরণে সৌরভিত অন্ন গ্রহণের পর—উদরের সঙ্গে মনেরও তৃপ্তি আসিতেছে, দু'টি চক্ষু তন্দ্রায় বুজিয়া আসিতেছে। আকাশে চংক্রমনরত চিলের ডাক —এবং নিম্নের স্তিমিত-কোলাহল-ছন্দিত রাজপথের রাগিণী সেই তন্দ্রাকে গভীর করিয়া আনিতেছে। সমস্ত পরিপূর্ণতার উপর নূতন-পাতানো সম্বন্ধের মাধুর্য্যটি প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। নিদ্রা আসিতেছে, এবং স্বপ্ন দেখাও চলিতেছে। এমন মধ্যাহ্ন জীবনে কতবারই বা আসে!

চোখ চাহিলাম—সুমিষ্ট কাহাদের হাস্যধ্বনিতে। মৃদু অথচ কোমল সৌরভে মধ্যাহ্ন যেন অপরাহ্নমুখী হইয়াছে, আকাশের নীল ফুটিয়াছে, রাজপথের বুকে বড় বাড়ির ছায়াটা দীর্ঘতর হইয়াছে। রাত্রি-অভিমুখী শহর-জীবনে বুঝি জাগরণ আসিল অকস্মাৎ। তেমনই কোলাহল— তেমনই যান-বাহনের গতির প্রতিযোগিতা। তবু, এ বুঝি স্বপ্নই হইবে। আমার এই কক্ষে—ও কাহারা চলিয়া বেড়ায়? পুষ্পসার সুরভি কি উঁহাদেরই সযত্ন-প্রসাধিত সর্ব্বদেহ হইতে বাহির হইতেছে? না, বিচিত্র বসনের অনুপম বিন্যাসের রেখায় রেখায় সেই সৌগন্ধ তরঙ্গিত? দিব্য উঁহাদের হাসিগল্প চলিতেছে—বাতাসে-ওড়া বেলুনের মত লঘুছন্দে উঁহারা ঘরের এ-প্রান্ত হইতে ও-প্রান্ত পর্য্যন্ত ভাসিয়া বেড়াইতেছেন। ইজি চেয়ারে ডুবিয়া আছি বলিয়া—আমাকে কি উঁহারা লক্ষ্য করেন নাই? না, রিক্তসজ্জার মানুষকে লক্ষ্য করা রীতি নহে বলিয়া অলজ্জ ও অকুণ্ঠ হইতে উঁহাদের বাধে নাই।....যেমনই হউক,

আমার তন্দ্রার ঘোর ভাঙ্গিয়া যাওয়া হয়ত উচিত হইবে না। জাগিয়াছি; মধ্যাহ্ন আপরাহ্ণের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহাকেও অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যার হাত ধরিয়া রাত্রিকেই সে হয়ত টানিয়া আনিবে—তবু—আমার জাগিবার সুযোগ হয়ত মিলিবে না। জানি না এখানকার রীতি। রীতি না জানিলেও সহজ ভদ্রতাবোধের মুখোস খুলিয়া উঁহাদের সলজ্জ করিয়া আমার লজ্জাই হয়ত কালো হইয়া ফুটিবে। বেশি লাল তো কালোরই নামান্তর।

কিন্তু উঁহারা আমাকে লক্ষ্য করিয়াছেন। একজন তরুণী বলিতেছিলেন, ভদ্রলোককে জাগা না, ইলা। ওঁর কাছেও তো চাবি থাকতে পারে।

হয়ত ইলাই কথা কহিল, দাদু আলমারির চাবি কাউকে দেন কিনা! বই অন্ত ওঁর প্রাণ।

তা যাই বল ভাই—এদিকে হাত দরাজ হলে কি হবে—তোর দাদু বিদ্যে-কৃপণ!

বাঃ রে, বিদ্যায় কার্পণ্য চলে নাকি! চোরডাকাতে যা কেড়ে নিতে পারে না, দান করলে যা বাড়ে—সে বিষয়ে লোকে কৃপণ হবে কোন্ দুঃখে?

তবে আলমারির চাবি নিজের কাছে রাখেন কেন? আর কাউকে পড়তে দিলেও তো পারেন।

দাদু বলেন, প্রত্যেক মানুষের টেষ্ট আলাদা। প্রত্যেক মানুষের চিন্তার জগৎ আলাদা। তাই নিজের রুচি অনুযায়ী একজন যা সংগ্রহ করেন, অন্যের কাছে তা খানিকটা অর্থহীন। অর্থহীন বলেই—বইগুলোকে তেমন যত্ন তাঁরা করেন না।

ভাল বই সবাইর ভাল লাগে। আমার টেষ্টে না মিললে সে বই আমি নেবই বা কেন!

তাই কি হয়? টেষ্টে না মিললেও লোক-দেখানো পড়া অনেকেই পড়েন। একটা শো।

তাই নাকি হয়?

হয় বৈকি। ওই যে কোণের মেহগ্নি কাঠের কালো নক্সা-কাটা আলমারিটা দেখছিস—ওটাও আমার এক দাদা মশায়ের। তিনি একজন অ্যাকাউণ্টস্ অফিসার ছিলেন। প্রায়ই তাঁর বৈঠকখানায় বড় বড় অফিসার আসতেন, হাল্কা জলযোগ ও হুইষ্ট চলতো। তাঁরা নাকি ওঁর কালেকশনের প্রশংসা করতেন। একটু থামিয়া বলিল, একদিন দাদু ওখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন। জানই তো—উনি পুস্তক-কীট। আলমারির কাছে গিয়ে মুগ্ধকণ্ঠে বললেন, বাঃ চমৎকার!

দাদা-মশায় হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চমৎকার? বইগুলো, না আলমারিটা? না, ওতে গুছিয়ে রাখার ব্যবস্থাটা?

দাদু বললেন, সবটা মিলে সুন্দর। তবু প্রশংসা করতে হলে—তোমার রুচির প্রশংসাই করতে হয়। আমার রুচির সঙ্গে হুবহু মিলে যায়।

দাদা-মশায় হেসে বললেন, কারণ রুচিটা আপনারই—আমার তো নয়।

অর্থাৎ? দাদু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

আলমারি খুলে খানকতক বই বার করে টেবিলের উপর রেখে দাদা-মশায় বললেন, বই খুললেই টের পাবেন। হাতের দাগে একখানা পাতাও ওদের ময়লা হয়নি।

দাদু প্রায় চেঁচিয়া উঠলেন, বল কি! তবে এগুলো কেনবার মানে?

মানে? হেসে বললেন তিনি, মানে ওগুলি আমার সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বাহন। লক্ষ্মী আর সরস্বতী এক জায়গায় থাকেন না শুনেছি, চির-

কালের বিসম্বাদ দুজনের। অথচ একজনের হাত ধরে আর একজন আমার ঘরেই রইলেন— বন্দিনী হয়ে। আপনার মনে নেই, বছর দশেক আগে কন্টিনেণ্টাল লিটারেচারের একটা লিষ্ট চেয়ে পাঠিয়েছিলাম আপনার কাছে। এগুলি তারই ফল।

পড়বে না যদি তো লিষ্ট চেয়েছিলে কেন?

আরে মিল্‌নে সায়েব তখন সবে বিলেত থেকে—আমাদের উপরিওয়ালা হয়ে এসেছেন। অফিসারের ঘুঁটিতে যদি পাক ধরাতে পারি তারই সাধনা তো চিরকাল করেছি। শুনলাম, সায়েবের কে এক পূর্ব্বপুরুষ নামজাদা লিখিয়ে—সায়েবও সাহিত্য-রসিক। দু'চারবার সায়েবকে ঘরে এনে বসাবার পর—কল্প-বৃক্ষে ফুল ধরলো। যথাসময়ে ফলও ফললো। সেইদিনই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ দাদুকে তিনি আলমারি-শুদ্ধ বইগুলি উপহার দিলেন।

কলকণ্ঠে হাসির ধ্বনি উঠিল।

একটি মেয়ে কহিল, এমন লোকও থাকে, না তোর এটি গল্প ইলা?

ইলা বলিল, এমন লোক থাকেন বলেই তো—এমন গল্প তৈরী হয়।

ইহারা প্রসঙ্গান্তরে আসিলেন।

একজন বলিলেন, ভদ্রলোকের কি ঘুম।

মুখখানিতে আমার সমস্ত রক্ত আসিয়া জমিল। কেহ লক্ষ্য করিলে কপট নিদ্রাকে বিলম্বিত করা কঠিনই হইত।

উনি কে রে?

তরু-অরুর মাষ্টার।

ওঃ! স্বরটা যেন তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক। মাষ্টার নামধেয় জীবটি যেন কৃপার বস্তু। যে ভৃত্য গৃহসৌষ্ঠবকে নিখুঁত রাখিবার জন্য দিবারাত্রি

পরিশ্রম করে, যে পাচক সুরন্ধনের দ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করে, যে সোফার মসৃণ গতিতে মোটর চালাইয়া ভ্রমণকে সুখদ করে, যে দাসী প্রসাধনের সহায়তা করিয়া দেহ-লাবণ্য বিকাশের সহায়তা করে—মাষ্টার বুঝি তাহাদেরই সমগোত্রীয়। বিদ্যাদানে মনকে সুমার্জ্জিত ও সংস্কৃতিবান করাই তো শিক্ষকের ধর্ম্ম। মুখখানির সমস্ত রক্ত নামিয়া গেল। লক্ষ্য করিবার কেহ ছিল না।

মুক্ত বসন্ত হাওয়ার মত আমার ছাত্রছাত্রীরা প্রবেশ করিল।

ও—মাষ্টার মশাই—মাষ্টার মশাই, বাবাঃ, কি ঘুম আপনার।

চক্ষু-মার্জ্জনা করিয়া—একটা শব্দ করিলাম। অর্থাৎ আমি যে জাগিলাম—তাহা জানাইয়া উঁহাদের কক্ষত্যাগের অবসর দিলাম। কিন্তু মাষ্টার নামধেয় তুচ্ছ জীবটিকে লজ্জা করিয়া উঁহারা কেন কক্ষত্যাগ করিবেন? সমানে হাসিগল্প চলিতে লাগিল।

ছাত্রছাত্রীরা আমার ইজিচেয়ারের হাতলে বসিয়া কহিল, কটা বেজেছে, জানেন? সাড়ে পাচটা। আজ বুঝি বেড়াতে যাবেন না?

ও বেলার কথা মনে নেই বুঝি? ভয় দেখানো আমার মিথ্যা, উহারা হাসিয়া উঠিল।

ছেলেটি কহিল, মা তো অমনিই করে। আবার বেড়াতেও বলে।

মেয়েটি কহিল, অসভ্য কোথাকার। করে! করেন বলতে পার না?

দিদি বলে নাকি করেন! ভারি তো জানিস তুই।

মেয়েটি বলিল, জানেন মাষ্টার মশায়, দিদি বড় বলেই তো মাকে করে বলে। না দিদি?

ওদিকে গল্পরত দিদি সে কথার উত্তর দিলেন না। মেয়েটি আর একটু গলা চড়াইয়া ডাকিল, দিদি?

বেড়াতে যাবি তো ? তা যা-না।

বেড়াতে যাব কেন ! অরুণ বলে, তুমি মাকে তুমি বল বলে—

মেয়ের আবার অধিকারবাদ নিয়ে বিচার দেখ। বলি, পড়া-টড়া আজ কিছু হ'য়েছে, না এইসব বাজে তর্ক করে দিন কাটচে ?

ছেলেটি হাসিয়া বলিল, কেমন !

মেয়েটি মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিল।

ওই দিক হইতে শাসনের স্বর ভাসিয়া আসিল, অরু, হাসছ কেন ? খবরদার হাসবে না ! তোমার মাষ্টার মশায়কে বল—তোমরা যদি বেড়াতে যাও—

বা রে, এখন পড়া মুখস্থ করতে হবে না।

তাহলে বৈঠকখানায় গিয়ে বসগে।

ওরকম আদেশের পর আর ইজিচেয়ারে গা এলাইয়া পড়িয়া থাকা চলে না। উঁহাদের বৈঠকের পাশ দিয়া আমাকে কক্ষান্তরে যাইতে হইবে। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করিতে লাগিল। মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, সামান্য নিদ্রার ফলে চুলগুলি কিছু বিশৃঙ্খল হইয়াছে, জামাটাও মাধ্যাহ্নিক নিদ্রার উপযোগী অর্থাৎ ফতুয়া গায়ে দিয়া অমন ফ্যাশনেবল্ বৈঠকের পাশ দিয়া যাওয়া চলে না। চটিটা আছে ঘরের অপর প্রান্তে, খানিকটা খালি পায়ে না হাঁটিয়া সেটিকেও সংগ্রহ করা দুষ্কর। কেতা-দুরস্ত সমাজের এ এক বালাই ! সর্ব্বক্ষণ বাহিরটাকে মাৰ্জ্জিত ও ভব্যযুক্ত না করিয়া নিদ্রা যাওয়াও চলে না। একটু মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, গোল টেবিলটায় বৈঠক বসিয়াছে। গুটি চারেক মেয়ে অতি প্রগল্‌ভার মত রাজ্যের সংবাদ আলোচনায় ব্যস্ত। নিঃশব্দে চটি জোড়াটা সংগ্রহ করিয়া মান বাঁচাইবার পথটিও নাই। অথচ, অমন সুস্পষ্ট আদেশের পর এখানে থাকাও তো মুশকিল।

ছাত্রছাত্রীর আড়ালে চলিয়া যতটা মান বাঁচে—ততটুকু চেষ্টাই করিলাম। জুতাটা সংগ্রহ হইল, জামা বদলাইবার বা চুল ঠিক করিয়া লইবার সুবিধা হইল না। অনাত্মীয়া কয়েকটি মহিলার সামনে—চিরুণীসমেত আয়নার সম্মুখে গিয়া দাঁড়ানো বা নূতন জামা গায়ে দেওয়া কেমন যেন শালীনতা-বিরুদ্ধ। ইঁহাদের চক্ষে সে জিনিস দোষের কিনা জানি না, কিন্তু আমার কেমন যেন ঠেকিল।

বাহির হইতেছিলাম—সম্মুখেই এক সুবেশ যুবক। আমাকে দেখিয়া তিনি থমকিয়া দাঁড়াইলেন। এই অনধিকার প্রবেশের তাৎপর্য্যটি হয়ত বা হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ এইভাবের কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়তা হয়ত অসৌজন্যের নামান্তর ভাবিয়া ঈষৎ হাসিয়া শির নামাইয়া কহিলেন, মাপ করবেন, আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না ত!

তাঁহার কুণ্ঠিত ভাব কাটাইবার জন্য বলিলাম, আমি নতুন মাষ্টার—। ওই যে খোকাখুকু—

হাত বাড়াইয়া প্রসন্নহাস্যে তিনি বলিলেন—ঠিক, ঠিক, শুনেছিলাম বটে আপনি আসবেন, বাবা লাইব্রেরি ঘরটা আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছেন। তা ওরা এখানে হানা দিয়ে আপনাকে বিরক্ত করছে তো। করমর্দ্দনান্তে তিনি কক্ষ মধ্যে উঁকি মারিয়া বলিলেন, ইলা, এ কিন্তু তোমাদের অনধিকার প্রবেশ!

ইলা টেবিল হইতে উঠিয়া বলিল, উনি তো ঘুমুচ্ছিলেন।

সেই জন্যই তো তোমাদের এখানে আসা উচিত হয়নি।

বাঃ রে, রেবা যে জ্যা ক্রিসতফখানা নিতে এসেছিল।

আমি অস্থির হইয়া বলিলাম, আমার কোন অসুবিধেই হয় নি। তা ছাড়া, আমি যে নিদ্রিত ছিলাম না সেইটুকুই জানাইতেছিলাম।

তিনি রহস্যময় ইঙ্গিত করিয়া উহাদের উদ্দেশ করিয়া কহিলেন, তা

ছাড়া আরও অন্যায় করেছ—ওঁর সঙ্গে আলাপ না করে নিজেরাই আলাপ জমিয়ে।

মাপ চাইছি। মেয়েটির স্বর কেমন যেন প্রাণহীন।

মাপ চাওয়ার ওই রীতি নয়। এগিয়ে এসো—আপনিও আসুন। ইলা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী—কি নাম আপনার ?

রেবা হাসিয়া বলিল, ইনট্রোড্রাকশনের এমন নতুন ধারা কিন্তু আর দেখা যায় নি।

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

আমার হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, আসুন, ওদের প্রায়শ্চিত্তটা সম্পূর্ণ হোক।

অরুরা যে পড়বার ঘরে গিয়ে বসলো।

আপনি না গেলেই তো ওরা প্রাণ খুলে খেলা বা খুনসুটি করতে পারবে। ছেলেবেলায় মাষ্টারের মত ভয়ানক জুজু আর দু'টি আছে নাকি !

রেবা বলিল, আপনার মত সকলকে মনে করেন কেন ?

যেহেতু আত্মবৎ মন্যতে জগৎ প্রবচনটি আমার ভারি ভাল লাগে আঃ, আপনি এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন কেন ? বসুন, বসুন।

আলাপ চলিতে লাগিল। সে আলাপে যোগ দেওয়া আমার পক্ষে খানিকটা দুরূহ হইল বুঝি। কলেজের পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে—শিক্ষার যে জগৎ সুবিস্তীর্ণ—তাহার একাংশও তো এতদিন স্পর্শ করিতে পারি নাই। সে জগতের বর্ণাভাস—বা গন্ধাভাসে মন কিছু উৎসুক এককালে হয়ত হইয়াছিল, পরীক্ষা-সাগর পার হইয়া যে উৎসুক্যটুকু ফেনার মতই শুকাইয়া গিয়াছে। চাকরির লক্ষ্যবেধে অতঃপর যত্নবান হইয়াছি। বশম্বদ ভৃত্যের স্বাক্ষরযুক্ত কত আবেদনপত্র যে ডাকঘরের দক্ষিণা দিয়া

কত বিভিন্ন স্থানেই প্রেরণ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। আনুগত্যের এত শপথ-স্বাক্ষরেও লক্ষ্য কোথাও বিদ্ধ হয় নাই, ভাগ্যে অতুলদা' ছিলেন। ঠিক চাকরি না হইলেও, ভবিষ্যৎকে সুদৃঢ় নিগড়ে বাঁধিবার আয়োজন না থাকিলেও—চাকরি তো বটে! এই চাকরির কথা শুনিয়া অবশ্য মেসের অনেকে —নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া বলিয়াছেন, ওঃ, মাষ্টারি! তা মন্দ কি। পরে দেখে-শুনে একটা ভাল দেখে জুটিয়ে নিতে পারবেন। তাঁহাদের শিরা-প্রকটিত দুশ্চিন্তা-কালিমাগ্রস্ত মুখের পানে চাহিয়া, বা আটটার কাকস্নান করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম অবস্থায় দু'টি সিদ্ধ অন্ন মুখে তুলিয়া অসম্বৃত বেশবাসে অফিস ছুটিবার দৃশ্য অনুভব করিয়াও—কোন উত্তর আমার মুখে আসে নাই। মোটা চাকুরিতে নাকি কোলকুঁজা করিয়া চেয়ারে আরাম করিয়া বসিবার সুবিধা আছে, টেবিলে মাথা রাখিবার অবসর-মুহূর্ত্ত আছে। বিজলী বাতির আলোয় সে ঘর আলোকিত, বিজলি পাখার সঘূর্ণন গতিতে শ্রান্তি, ক্লান্তি ও ঘর্ম্ম মুহূর্ত্তে বিদূরিত হয়। চাপরাসী আসিয়া গ্লাসে জল ভরিয়া দেয়, সায়েব হাসিয়া আপ্যায়িত করেন। আরও অনেক সুখৈশ্বর্য্যের কাহিনী—পাঁচটার পর বিছানায় শুইয়া—এবং আহারের পর নিদ্রা আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন-ভাবে আলোচিত হইতে থাকে। এই মাষ্টারির পরিবেশটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। নামে চাকুরি, কাজে তো ভোজন, গল্প ও ছাত্রছাত্রীদের লইয়া মোটর ভ্রমণে একটা দিন বেশ কাটিল। বন্ধন নাই বলিয়াই কি পীড়নের জন্য মন উদ্‌গ্রীব হইতেছে!

যুবকটি আমার পানে চাহিয়া হাসিয়া বলিলেন, আরে, আপনি এমন ভাবে আছেন—যেন স্কয়ার পেগ ইন এ রাউণ্ড হোল! জীবন-অভিজ্ঞতার দুই একটা গল্পই না হয় বলুন?

ম্লান হাসিয়া বলিলাম, আমার আবার জীবন—তার আবার অভিজ্ঞতা!

তিনি বিস্মিত কণ্ঠে বলিলেন, কলেজ থেকে সবে বেরিয়েছেন—অথচ বলছেন····কি জানেন, দেশ বেড়ালেই অভিজ্ঞতা হয় না।

ইলা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, নিশ্চয়ই হয়।

তাহলে ছোড়দি এতবার ভারতবর্ষ চষে ফেলেছেন ওঁর কি অভিজ্ঞতা হ'য়েছে শুনি?

ইলা বলিল, তীর্থস্থানের মাহাত্ম্য এমন সুন্দর বলেন ছোট পিসিমা—

মাহাত্ম্য বলেন, কিন্তু ইতিহাস জানেন না।

রেবা বলিল, ইতিহাস বলতে আপনি কি বোঝেন? কতকগুলো রাজার লিষ্ট, যুদ্ধের সন তারিখ এই তো?

তা ছাড়াও—

রেবা হাসিয়া বলিল, তা ছাড়া যা আছে—তা ধোঁয়া। সে জিনিস আমাদের দেশের ইতিহাসের পাতায় উঠলো আর কই?

বুঝেছি—তুমি হয়ত গিবন সাহেবের কথায় বলবে, ঘরের নিচেয় যে ঘটনা ঘটলো—তার রিপোর্ট পাঁচজনে যখন পাঁচ রকম দিচ্ছেন—তখন সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করে ইতিহাস লেখার বিড়ম্বনা কেন! তাই রোমের ইতিহাস না লিখে রোম সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের কারণটুকু তিনি লিপিবদ্ধ করলেন মাত্র।

সেইটুকুই তো আসল ইতিহাস।

তেমন ইতিহাস আমাদের কে লিখবে?

আপনার বাবার মুখেই শুনেছি, তেমন ইতিহাসই আমাদের লেখা আছে। রাজনীতির চর্চ্চা যে দেশে অধ্যাত্মবাদকে ছাপিয়ে মাথা তুলতে পারে নি, সে দেশে যুদ্ধবিগ্রহ বা সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের মধ্যে সত্যিকারের ইতিহাস কোথায়?

বাবা বলেন বটে, আমাদের ইতিহাস—গীতায়, পুরাণে, গাথায়,

রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যে। আচ্ছা, রামায়ণ-মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ কতখানি আছে—সেটুকু তুমি বুঝতে পার?

রেবা মাথা নাড়িয়া বলিল, ঘটনাই তো ওর মধ্যে বড় স্থান জুড়ে নেই যে, তার চুলচেরা বিচার করব! সমবেত কুরুপাণ্ডবেরা ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রকে বেছে নিয়েছিলেন—তাঁদের শক্তি-পরীক্ষার ক্ষেত্র হিসেবে। সেখানে—

কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রেও তো অধর্ম্ম যথেষ্ট হয়েছিল।

আমার তর্কের পয়েণ্টগুলো আপনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন। অধর্ম্ম শুধু কুরুক্ষেত্রে হয় নি—তার অনেক আগে হ'য়েছিল। কিন্তু সেকথা এখানে অবান্তর। মোট কথা, আঠারো দিনের যুদ্ধটা মহাভারতের—একটা প্রধান অংশ নয়, একটা পরিণতির আংশিক বিকাশ মাত্র। একরাজ্য, এক ধর্ম্ম, এক সিংহাসন—এর মধ্যে ধর্ম্মটাই হচ্ছে প্রধান যাকে ধারণ করে আছে আর দুটো জিনিস।

নবীন সেনের রৈবতক থেকে এ আইডিয়াটি নিয়েছ, মিস সেন।

কোনটাই তো আমার কথা নয়, মিঃ দাশ। আমি শুধু আপনার বাবার কথার প্রতিধ্বনি করলাম।

সহসা আমার পানে ফিরিয়া স্মরজিৎ বলিল, আপনি কি বলেন সুপ্রিয়বাবু?

আমি ও বিষয়ে এমন করে ভাবিনি কখনো—যেমন মিস সেন বললেন। বাস্তবিক ভারি চমৎকার একটা দিক।

ইলা?

আমি ইতিহাসের ছাত্রী কোন কালে ছিলাম না—ওতে আমার ইণ্টারেষ্ট ক্রিয়েট করে না।

মন্টু?

সে বেচারী মাথাটি নীচু করিয়া টেবিলের উপর আঙুল দিয়া কি যেন লিখিতেছিল। আলোচনার জগতে সে হয়ত ছিলই না। কাজেই মাথা তুলিয়া অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া বলিল, ওসব আমি বুঝতে পারি না।

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, আর যিনি ইতিমধ্যে মুখের কাছে বই তুলে তাতে ডুবে গেছেন—তাঁকে কোন প্রশ্ন করতে পারি কি? মানে রিণি—

স্—স্। ঠোঁটের কাছে আঙুল চাপিয়া বই হইতে পলকের জন্য মুখ তুলিয়া মেয়েটি দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিল, সোনিয়ার কথাগুলি ভারি ভাল লাগছে। কথা কয়ো না।

কব না। কিন্তু উত্তর না দেওয়ার ক্রাইমটি যা করলে—তাতে তোমার পানিশমেণ্ট পাওনা রইল জেনো।

আচ্ছা, রাস্কল্নিকফ্ অমন ছোট্ট ঘরে যদি না থাকতো তো ওর মাথায় শয়তান নিশ্চয় বাসা বাঁধতো না। দু'দুটো খুন—

শুধু ছোট ঘরই দায়ী নয়—রিণি—

নিশ্চয় দায়ী। যার সামনে খোলা আকাশ—অবাধ আলো—মুক্তির হাওয়া—

দরিদ্র ছাত্র খোলা আকাশ বা মুক্তির হাওয়া পাবে কোথা থেকে? তার জট-পাকানো চিন্তার মধ্যে—

এই ছোট ঘর—মন যেখানে ছোট চিন্তায় সঙ্কীর্ণ হয়ে আসে। এত সঙ্কীর্ণ যে অন্যের বেদনা-বোধের দায়িত্বটুকু তার নেই।

নিজের বেদনা যার পর্ব্বত-প্রমাণ—অন্যের বেদনা বোঝবার অবসর তার কই? পৃথিবীর নিয়মই হচ্ছে—আগে বাঁচা—তারপর—

আচ্ছা মশায় থাকুন, সবটা না পড়ে আর তর্কের জের টানছি না। রিণি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়া ডষ্টয়েফ্স্কির সমস্যা হইতে আমাদের মুক্তি দিয়া গেল।

স্মরজিৎ উঠিয়া আলোর সুইচটা টিপিয়া দিয়া কলিং বেলে ঘা দিল। ভৃত্য আসিলে তাহাকে চায়ের ফরমাস দিয়া আমার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার কি ভাল লাগে? ফিক্‌শন না বায়োলজি, না—

হাসিয়া বলিলাম, য়ুনিভার্সিটির গণ্ডি সবেমাত্র উত্তীর্ণ হয়েছি—যাকে বলে সত্যিকারের লেখাপড়া তা এখনো সুরু করি নি।

স্মরজিৎ হাসিয়া উঠিল। ইলা সবিস্ময়ে কহিল, আপনি কি বলতে চান অ্যাকাডেমিক কেরিয়ারটা—

কিছু নয় বলিনি। চাবি খোলার পর - আলমারির মধ্যে যা আছে —তা না দেখার নিস্পৃহতা যদি আসে—তবে শিক্ষার গলদটাই কি চোখে পড়ে না?

বিদ্যার লক্ষ্য বিদ্যা না হ'লে—তাই বলা যায় বটে।

কিন্তু বিদ্যার লক্ষ্যকে বিদ্যায় স্থিত করার সৌভাগ্য তো সকলের হয় না। চাকরি যে বিদ্যার চরম উদ্দেশ্য—সে বিদ্যা নিষ্ফল তো বটেই।

ইলা জোর করিয়া হাসিয়া বলিল, সবাই কি আর চাকরি লক্ষ্য করে স্কুল-কলেজে পড়েন?

না, আরও কয়েকটি লক্ষ্য আছে। সহসা রেবা কথা কহিল। লক্ষ্য এই—চাকরি যদি নাই হয়—একটা দেখাবার মত ঐশ্বর্য্য তো ওর মধ্য থেকে মেলে।

যথা? সবিদ্রূপে ইলা ভ্রূ কুঞ্চন করিল।

যথা—যদি কাউকে বলা যায় আমি বি. এ. পাস তো খানিকটা সম্ভ্রম কি আমরা ওর থেকে আদায় করে নিই না?

তুই সিনিক্ হলি কবে থেকে রেবা?

রেবা উত্তর না দিয়া স্মরজিতের পানে চাহিল। স্মরজিৎ বলিল, চা

আসছে। এর পরেও যদি তর্ক চলে—ছটার শো-টা তাহলে মিস করতেই হবে।

কি বই?

লাইফ অব এমিল জোলা। চমৎকার পাট করেছে পল মুনি।

জোলা! যিনি ডাষ্টবিন ঘেঁটে,—ইলা ঠোঁঠ কুঞ্চিত করিল।

অনেকে তাঁর ওই বদ আখ্যা দেন বটে, তবু বিরাট সে জীবন। দেখলে একটা আস্বাদ পাবে।

তারপর যে আলোচনাটা আরম্ভ হইল, সেইটাই যেন জমিল বেশি। রিণির মুখ হইতে ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্টের বোঝা নামিল, অণুর টেবিল ক্লথের উপর অঙ্গুলি-আলিপনার নিবৃত্তি ঘটিল, ইলার মুখে তর্কোচ্ছ্বাস জমিল। রেবা চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শুধু বলিল, আমাকে যদি একটু আগে জানাতেন।

তাতে কি, এখুনি একটা ফোন করে দিচ্ছি বালিগঞ্জে।

ফিরবার যা সময় দিয়ে এলাম, ফোনে তা পিছিয়ে দেব?

যেন আর কখনো সময় পিছিয়ে দেন নি! ইলা বিদ্রূপ করিল।

না তো। বাবা জানেন যা স্থির করে বাড়ি থেকে আমি আসি, তা কদাচিৎ বদলায়।

বদলায় তো। সেই কদাচিতের একটা হ'লো না হয়।

কদাচিৎ তো এমন্ সহজলভ্য নয় ভাই। সিনেমা আর সঙ্কট অসুখ দুটোতে তফাৎ।

ইলা জোরের সঙ্গে বলিল, অত ভাল মেয়ে হওয়া—

বাধা দিয়া রেবা বলিল, ভাল মেয়ে হওয়া আজকালকার দিনে খুব গৌরবের নয় জানি, কিন্তু মিছিমিছি খারাপ হওয়াতেই বা কি লাভ!

লাভ এই—এমিল জোলা দর্শন। রিণি হাল্কাভাবে পরিহাস করিল।

এমিল জোলা তো আজই পালাচ্ছেন না—কলকাতা থেকে। পালাচ্ছেন কি, মিঃ দাশ?

না, কাল পরশুও চলবে।

তাহলে কালই যাওয়া যাবে। আজ তোমরা যাও। ভাল লাগে তো কালও না হয়—

যত ভালই লাগুক—এক বই পর পর দুদিন বোরিং লাগে।

রেবা গেল না। স্মরজিতের উৎসাহও কেমন যেন ম্লান হইয়া গেল। নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বলিল, তবে—আজ না হয় থাক।

পাগল! তোমরা আজ যাবেই। সুপ্রিয়বাবু আমার বদলে যান।

আমি ক্ষীণভাবে আপত্তি জানাইতেই স্মরজিৎ সহসা উৎফুল্ল হইয়া কহিল, তবে কালই যাওয়া যাবে একসঙ্গে। চল, লেকে একটা চক্কর দিয়ে তোমাদের বাড়ি পৌঁছে দিই।

৬

সৌন্দর্য্য ও সুবাস খানিকটা পড়িয়া রহিল, উহারা চলিয়া গেল। জানালা দিয়া আকাশের জ্যোৎস্না ঘরের খানিকটা ভরাইয়া দিয়াছে। হেমন্ত-কুয়াশায় আকাশ আজ তেমন ঘোলাটে নয়, উত্তর-প্রবাহিত বাতাসের মাধুর্য্যও অনুভব করিতেছি। রাত্রির আহার দেশী-বিলাতীর সংমিশ্রণেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। দিনের আত্মীয়তা মনের মধ্যে খানিকটা শিকড় নামাইয়াছিল, সন্ধ্যার আসর—ফুলেফলে সজ্জিত একটি মনোরম তরুর মতই মনকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। এই বুঝি প্রগতিশীল সমাজ। সর্দ্দিজ্বরের মুখে উষ্ণ চায়ের আস্বাদ। চাকরি-জীবনের এই সৌভাগ্যকেই বৃহৎ বলিয়া মনে হইতেছে। মন আনন্দে ফুলিয়া উঠিতেছে। কেন?

নিজের আনন্দই সব চেয়ে বড় আনন্দ পৃথিবীর—এ আনন্দের উৎপত্তি অপ্রাপ্যকে আয়ত্ত করিবার মুহূর্ত্তে সুপ্রকট। রূপকথার পৃথিবী যাহার চারিদিকে নামিয়া আসিয়াছে—কল্পনায় সে নিজেকে রাজপুত্র ভাবিয়া সেই গূঢ় ও গাঢ় আস্বাদে না মাতিবে কেন? এমন সেটি-কৌচ-সোফা-অটোম্যান-সুসজ্জিত কক্ষকে কোনকালে কি কল্পনা করিয়াছিলাম? এমন সরস অথচ বৈদগ্ধ্যসঞ্জাত হাস্যালাপ, মৃদু অথচ তীব্র এসেন্সের গন্ধ-মাখা সুশোভন বিচিত্র শাড়ি-ব্লাউজের সমাবেশ, বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, শাণিত ঝকঝকে তলোয়ারের মত কথা, অকুণ্ঠিত চলাফেরা—ইহার ছন্দই যে স্বতন্ত্র। নিতান্ত ভালমানুষের মত এক পাশে বসিয়াছিলাম, মন তো ভালমানুষের মত নির্ব্বিকার থাকিতে পারে নাই। সে কল্পনা করিয়াছে, উপভোগ করিয়াছে, আনন্দ পাইয়াছে। এত প্রবল কল্পনা যে রাত্রির নিদ্রাকে টুটাইয়া চাঁদের আলোয় মাতাল হইয়া উঠিতে চাহিতেছে।

তাছাড়া রোমান্স-বিলাসী তরুণ বয়সটা। কলেজ ছাড়িয়া কিছুকাল তো কল্পলোকে বাস তাহার চলেই। কঠিন বাস্তব স্থূল হস্তাবলেপে তার রংকে অকরুণভাবেই মুছিতে চেষ্টা করে, রসকে নিংড়াইয়া লয়, স্বাদে আনে কটুতা, আনন্দে আনে সংশয়। বেকার-বৃত্তির প্রথম বাধাটি তত প্রবল ভাবেই অনুভব করি নাই, তাই অবস্থা বৈষম্যকে ছাপাইয়া মন ইহাদের স্বপ্নক্ষেত্রেই পা রাখিয়া সেইমুহূর্ত্ত হইতে স্বপ্নচারণা সুরু করিয়া দিয়াছে। বর্ষার পর সুপ্রসন্ন শরৎই আসিয়াছে। মেঘহীন সুনির্ম্মল শরৎ।

প্রথমে রেবাকেই ভাবিতে লাগিলাম। নূতন যুগের মেয়ে, অথচ শ্রী ওর মুখে, বুদ্ধি ওর চোখে শাণিত ইস্পাতের মতই বিচ্ছুরিত, কথা-বার্ত্তায় সেই ইস্পাত-দৃঢ়তা। সে ফুটিয়াছে—তড়াগে, বায়ু হিল্লোলে দুলিতেছে, জলশায়ী না হইবার দৃঢ়তাও সে বৃন্তে আছে। এমিল জোলার আকর্ষণকে অনায়াসে তুচ্ছ করিল!

তারপর রিণি। দেহে এবং মনে ও বালিকা কাল উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। চোখে চঞ্চল হাসির ঢেউ উথলাইয়া উঠিতেছে—ওর চির-বালিকা প্রাণের অজস্র শক্তিকণার মত। সে শক্তি সংহত হইয়া কেন্দ্রাভিগ নয়, চারিদিকে ছিটকাইয়া—ছড়াইয়া সে কেন্দ্রাতিগ। সোনিয়া ওর মনে তরঙ্গ তুলিতে পারে, যতক্ষণ বইয়ের মধ্যে ও সোনিয়ার সান্নিধ্যে আছে। বাহিরের রূপালী পর্দ্দায় এমিল জোলা দেখার আগ্রহে সে সোনিয়া পর মুহূর্ত্তেই ম্লান হইয়া যায়।

অণু? টেবিলের উপর ঝুকিয়া ইতিহাসচর্চ্চা হইতে বহুদূরে তার কোমলতম মনকে লইয়া হয়ত বা দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল! অত্যন্ত তেজালো জমিতে সব গাছ তো প্রাণধর্ম্মে বিকাশলাভ করিতে পারে না। ওর চিন্তা জগতে তেমন সারবান জমির আবশ্যকতা হয়ত নাই। ফুল ফুটাইবার জন্য অগভীর খানিকটা মাটি—যেমন টবের অল্প মাটি—তাই হয়ত ওর ক্ষুদ্র শিকড় মেলিবার পক্ষে যথেষ্ট।

ইলাকে কিছু উগ্র বলিয়া মনে হয়। যে সুসজ্জিত ঘরে বসিয়া উহাদের তর্ক জমিয়াছে, এমিল জোলা দেখার যে প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, বইভর্ত্তি আলমারির মধ্যে যে রত্নরাজির ইতিহাস ক্ষণপূর্ব্বে সে ব্যক্ত করিয়াছে—সবই যেন তাহার উগ্র মর্য্যাদাবোধকে বিকশিত করিবার পন্থা। বাহিরের সজ্জা-বিলাস, ভিতরের মর্য্যাদা-বিলাসের সঙ্গে সমান তালে পা না ফেলিয়া চলিলে ইলার ভারসাম্য রক্ষা করা বুঝি কঠিনই হইত!

স্মরজিৎকে ঠিকমত বুঝিতে পারি নাই। একবার মনে হইয়াছে সব বিষয়ই বুঝি সে আয়ত্ত করিয়াছে। পরক্ষণে মনে হইয়াছে—ভিতরে সে জ্ঞানের বর্ত্তিকা বেশিদূর পর্য্যন্ত বুঝি আলোকরশ্মি ফেলিতে পারে নাই। ব্যবহার সুমার্জ্জিত—হাসি নিখুঁত এবং সর্ব্বক্ষেত্রেই সে অত্যন্ত সচেতন।

ছায়াছবি আমার সম্মুখেই মনের পরদায় একের পর এক মিছিল সাজাইয়াছে। আশ্চর্য্য কথা, ইহাদের রূপটা যেন চিন্তার জগতে গৌণ হইয়া গেল! দৃষ্টি কি নিষ্ক্রিয় ছিল, না মনের উপর ভার দিয়া সে ভিতরে আত্মগোপন করিয়াছিল? প্রথম প্রতিফলন বুঝি দৃষ্টির মধ্যেই হয়, নিমেষে যদি মনকে তাহা স্পর্শ করিতে না পারে—সমাপ্তিও তার সেই দণ্ডে অনিবার্য্য।

রোমান্স আমি কাহাকে লইয়া রচনা করিতেছি? গোলাপকে ভালবাসিব, না গন্ধরাজকে আদর করিব—একদণ্ডের উদ্যান পরিভ্রমণের মধ্যে এ বিচার-বোধ হয়ত আসে না। সবটা মিলিয়া উদ্যানের যে সৌন্দর্য্য—সেই সৌন্দর্য্য দিয়াই মুগ্ধ দৃষ্টির স্তব বা আরতি করা চলে, একান্তে একটি তোড়া হইতে খুলিয়া না ধরিলে পৃথগীভূত সত্তায় অভিভূত হইবার শুভমুহূর্ত্ত আসিবে কেন?

আজ সকালে যে স্নেহস্পর্শটি পাইয়াছি, যাহা পাইয়া মনে হইয়াছে—প্রবাস বাসের পর জন্মভিটায় মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিলাম, জ্যোৎস্নার এই মায়ামুহূর্ত্তে সে অনুভবটি কোথায় চাপা পড়িয়া গেল। আশ্চর্য্য মন! বিশেষ করিয়া তরুণ মন। পরিবেশ অনুযায়ী কামনার রং বদল হয়। দিনে ভাবিয়াছি স্নেহের কথা, রাত্রিতে ভাবিতেছি রাত্রির মতই গোপনচারী এক রহস্যের কথা। এ জীবনেও সে কথা ভাবিবার অবসর আছে? অন্নচিন্তার দ্বারে মাথা বিকাইয়াও মানুষ ফুলের সৌন্দর্য্যকে বুকে ভরিয়া রাখিতে চায়!

আজও প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইল না। তবু উঠিলাম। ঘরখানিতে নাকি কবিতা লেখা চলিত! অন্তত কবিতা লেখার প্রয়াস চলিত। এখন সে কবিতা মালিকের স্কন্ধ হইতে নামিয়া আমার মাথায়

চাপিয়া বসিল বুঝি! নিদ্রা গেল, রহিল রঙ্গীন চিন্তা। সামনে খোলা আকাশ পাইয়া আকাশকুসুম চয়নটা মনের সাধ মিটাইয়াই চলিতে লাগিল।

মন অগ্রগামী, কিন্তু দেহ আলস্যপরায়ণ। অশ্ব-মনোরথ চিরকালই ছয় মাসের পথ ছয় দণ্ডে পৌঁছিয়া থাকে, দেহ—স্থূল দেহ, ক্লান্তিতে অবসাদে পথের পাশে বসিয়া দু'দণ্ড বিশ্রাম করিয়া লইতে চাহে।

তবু—চোখ রাঙাইয়া দেহকে চাঙ্গা করিলাম। ছাত্রছাত্রী দুয়ারের বাহিরে বই বগলে দাঁড়াইয়া আছে। আমাকে দেখিয়া অরুণ বলিল, আজ পড়াবেন মাষ্টার মশায়?

কথাটা সসঙ্কোচেই জিজ্ঞাসা করিল। কাল একবেলা ভ্রমণ, ভোজন আর একবেলা সান্ধ্য মজলিস—সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিবার হেতুটা অসমীচীন নহে।

বলিলাম, নিশ্চয়। তোমাদের চা খাওয়া হ'য়েছে?

হুঁ, আপনি চা খাবেন না?

চা? তা—ইচ্ছাটা, হইলেই বা ক্ষতি কি!

ছাত্রের হুকুমে ট্রে ভরিয়া চা আসিল—তার আনুষঙ্গিকও আসিল। উহাদেরও ভাগ লইতে আহ্বান করিলাম। বাড়ির কড়া নিয়ম লঙ্ঘন করিতে উহারা ইতস্ততঃ করিতেছিল। একখানা টোষ্ট তুলিয়া ছাত্রের হাতে দিতেই ছাত্রী আর অনুমতির অপেক্ষা রাখিল না। টোষ্ট গালে পুরিয়া চিবাইতে চিবাইতে কহিল, মা জানতে পারলে কিন্তু বকবে।

অরুণ বলিল, জানতে পারলে তো!

ভজুয়া যদি বলে দেয়?

দিক না। অ্যায়সা রদ্দা লাগাব! বলিয়া শূন্যে একটা কিল ছুঁড়িয়া কাঁটা দিয়া অমলেট বিচ্ছিন্ন করিতে লাগিল।

প্রাতরাশ নেহাৎ মন্দ হইল না। উদরের স্ফীতি ত বটেই, মনও স্ফীত হইয়া উঠিল। বলিলাম, আজ তো আর বেড়াতে যাওয়া হবে না।

বিকেলে যাব, সার। মাকে বলে রেখেছি।

সেই ভাল। খুব ভোর বেলাটাও বেড়াবার পক্ষে ভাল সময়।

ছেলেটি নাচিয়া কহিল, গাড়ি বার করতে বলব?

তোমার মা বকবেন।

ইস, দেরি করলে তো বকবে। শুধু একটা ট্রিপ ময়দানে দিয়েই ফিরব। হাত ধরিয়া টানিয়া কহিল, চলুন না?

এমনই মন! রক্তের মধ্যে প্রভুত্বের স্বাদ উচ্চতর হইয়া উঠিতেছে! আজ একবার অতুলদার সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা হইতেছে। একদিনে এত অতিরিক্ত পাওনা হইয়াছে—যাহার অংশ অন্যকে না দিয়া স্বস্তি পাইতেছি না।

মোটরে বসিয়া ভাবিলাম, শুধুই কি স্বস্তি? এই বাদামীরঙের বৃহদাকার মোটর সেই সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে যে গৌরব বহন করিয়া লইয়া যাইবে—সে গৌরবের ছটায় আমার মুখখানিই কি শুধু জ্বল জ্বল করিবে? বড় আপিসের বড় কর্ম্মীর দল—প্রসন্ন দৃষ্টিতে এ দিকে চাহিয়া বলিতে পারিবেন তো, বাঃরে, ছোকরা! না, শুষ্ক মুখে হাসি টানিয়া আনিয়া সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন করিবেন, ভাল ত? ভাল না হইলে কেহ মোটরে চড়িয়া দেখা করিতে আসে না। মোটরে চড়িয়া যাহারা সুখভ্রমণে চলে, তাহাদের কুশল প্রশ্ন করিয়া নিজেরই ভবিষ্যৎকে খানিকটা সরল করিয়া ফেলা নহে কি?

আর ভাল! শরীরটা তেমন জুৎ যাচ্ছে না! ভাল হজম হয় না।

ওষুধ-টষুধ খাচ্ছেন তো? প্রশ্নকর্ত্তার উদ্বেগের মধ্যে যেন সমস্তটুকু নির্ভর করিতেছে।

খেলাম তো অনেক, দেখেও তো গেছেন অনেকে—শহরের নামজাদা চিকিৎসক, তাঁদের চিকিৎসা-প্রণালী, পথ্যের রাজসিক বন্দোবস্ত,—ঐশ্বর্য্য বিস্তারের তো একটিই পন্থা নহে! মানুষ শোনে—মনোযোগ দিয়া না হউক—অবহেলায়ও শোনে। এবং মানুষ বলে—ইচ্ছা করিয়াও না হউক বলিবার জন্যই হয়ত বা বলে। দুই পক্ষই বোঝে এই আদান-প্রদানের অসারত্ব, দুই পক্ষই অথচ উপভোগ করে।

মোটর দাঁড়াইল। উহাদের মোটরে বসাইয়া উপরে উঠিয়া গেলাম। গলিটা পার হইবার সময়ে পাশের বাড়ির উপর অনিচ্ছাকৃত দৃষ্টিপাত করিলাম। আশ্চর্য্য মন! চড়াস্থরে বাঁধা পর্দ্দাটি অমনি কোমল খাদে নামিয়া আসিল। ভবানীপুরের প্রাসাদের ছবি জাগিয়া উঠিল। দুয়ার বন্ধ না থাকিলে সে বাড়িতে ঢুকিতাম একবার। দরজা বন্ধ হওয়াতে মন একটু প্রসন্ন হইল বৈকি। হাতে আমার সময় কম, উঁহাদের বক্তব্যও তেমন সংক্ষিপ্ত নহে। তা ছাড়া এই সকালে দুঃখ-বিলাসের আয়োজন করিয়া তো মোটরে চাপি নাই।

আরে, সুপ্রিয় যে! কেমন আছিস?

ভালই। তাঁহাকে প্রণাম করিতে হেঁট হইতেছি—তিনি আমায় সস্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিলেন।

মোটরে এসেছিস তো? হর্ণ দিসনি যে?

বাঃ, আপনাদের ঘুম ভেঙ্গে যাবে যে?

ভারি তো ঘুম! সারাদিন ছেলে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে—সারা দুপুরটা স্কুলে বসে ঝিমুই। একদিক ফাঁকি না দিলে—আর একদিকে টানব কি করে।

ফাঁকি দিয়ে মনটা খুঁত খুঁত করে না?

প্রথম প্রথম করত—এখন করে না। শিক্ষক ভাবে, এই ফাঁকিতে

আমার হলো জিত—ছাত্র ভাবে, আমিই জিতলাম। যাঁরা মাইনে দেন—তাঁরা ভাবেন সস্তায় মারলুম, যাঁরা মাইনে নেন—তাঁরাও ভাবেন ওই কথা। মোট কথা লুকোচুরি খেলায়—বুড়ি-ছোঁয়ার পালা তো আসে না, খেলা চলেই ?

নিজেকে খাটো হতে হয় না ?

কার কাছে ? একপক্ষ মহৎ হলে আর এক পক্ষের সমস্যা হতো বটে।

নিজেরও তো বিবেক আছে ?

বিবেক নিয়ে মাথা ব্যথা আছে ! তা আছে। আমার সুবিধা আদায় করবার সময় আমি বিবেকের দোহাই পাড়তে পারি, তোমার সুবিধার সময় তুমিও ভুলবে ও কথা। কিন্তু যাদের মাথার ঠিক নেই, তাদের মাথায় কখন ব্যথা ওঠে—কখন যে ওঠে না তাই ঠিক করাই তো মুশকিল। মোটরে চেপে দেখা করতে এসেছ ভায়া—ওসব মন-খারাপ-করা কথা কয়ো না। যাও ভায়া, নরেনদার সঙ্গে দেখা করে এসো।

তিনি উঠেছেন ?

এখনও দোল খাচ্ছেন। যাও না—শুভ দৃষ্টিটা হলে ভূমিকম্পের দোলে দোদুল দুলবেন।

আমার পোষাকটা কি-হকচকিয়ে দেবার মত হয়েছে ?

যদিও তা নয়, তবু লক্ষ্মী-ঠাকরুণ তোমার চিবুক ধরে আলগোছে যে একটু আদর করেছেন—তার চিহ্নটাও রয়েছে।

বলেন কি, দু'দিনেই এমন !

হয় ভায়া, হয়। পোলাও কালিয়া খাওয়ার বরাত থাকলেও, ধাতে সকলের সয় না।

আমার তাহ'লে সয়ে গেছে বলুন। বলিয়া হাসিতে লাগিলাম।

তা সয়েছে বৈকি! মনের ছোপ মুখে না ধরলে—এ-কথা বলতে পারতাম নাকি রে।

তাহবে। সকাল বেলায় এক পেট খেয়ে এলাম তো। তারও তৃপ্তি আছে।

হাঁ—আরও তৃপ্তি—কিসের তা বুঝতে পারছি নে। বলিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন।

সমস্ত মুখ খানাই রাঙা হইয়া উঠিল, লজ্জা ঢাকিতে একটু ঘুরিয়া দাঁড়াইলাম? বাহিরে মোটরের হর্ণ বাজিতেই অতুলদা' বলিলেন, ওই নাও, বাঁশী বাজছে।

তবে আসি।

আসাটা তোর বৃথা হোল—! একটু বেলা করে যদি আসতিস!

লজ্জিত মুখে বলিলাম, আসি তো বিকেলেই আসব একদিন, আর মোটরে চড়ে নয়।

তাই আসিস। পিছন ফিরিতেছিলাম, তিনি ডাকিয়া বলিলেন, একটা সংবাদ আছে রে? তোর সেই মহিলাটি—এ বাড়ি থেকে কাল উঠে গেছেন।

বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোথায় গেলেন?

তা কি করে জানব। গাড়ি বোঝাই জিনিসপত্র দেখলাম, তাঁদেরও উঠতে দেখলাম।

আপনি কেন তাঁদের ঠিকানাটা নিয়ে নিলেন না?

টাকা দিয়েছি বলে ঠিকানা নেওয়ার দায়টাও আমার! তোর অতুলদাকে এতই গরজে ঠাওরাস?

কিন্তু টাকা আপনার না-ও পেতে পারেন।

তাই নাকি ! তুই তো বলেছিলি—

আমার জন্যই—

মেটারের হর্ণ বারকয়েক বাজিয়া উঠিল। আমাকে ঠেলিয়া দিয়া অতুলদা হাসিতে হাসিতে বলিলেন, ভারি টাকা—তার আবার ভাবনা ' তুই—যা—যা।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে শুনিলাম—অতুলদা তখনও হাসিতেছেন।

৭

ভাবি নাই আজ অপরাহ্ণে স্মরজিতের দল আসিয়া আমার ঘরে হানা দিবে ! প্রথমে স্মরজিৎই আসিল। দুয়ারে টোকা মারিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল, আসতে পারি কি ?

অভিজাত-সুলভ আচার ব্যবহার, গলার স্বরটিও মধুর এবং মর্য্যাদা-যুক্ত। বাইশ-তেইশ বছরের এই সুদর্শন ছেলেটির প্রতি, প্রথম সাক্ষাতের সময় হইতেই, একটা আকর্ষণ অনুভব করিতেছি। সমবয়সের একটা আকর্ষণ তো আছেই ! স্মরজিৎ আসিতেই মনে হইল, উহার পিছনে একবিংশ শতকের খানিকটা দমকা বাতাস বুঝি চোখেমুখে আসিয়া লাগিল।

ঘরে ঢুকিয়া চেয়ারে বসিয়া স্মরজিৎ বলিল, মনে আছে তো ? আজ একখানা বেশি টিকিট কিনলাম।

কুণ্ঠিত হাস্যে কহিলাম, ছাত্রছাত্রীদের পড়া কামাই করিয়ে আমার যাওয়াটা কি—

খুব অন্যায় হবে না। আপনার ছাত্রছাত্রীরা ততটা সুবোধ ও মেধাবী নয়— যতটা আপনি ভাবছেন। তা ছাড়া—

একটু থামিয়া বলিল, বলা হয়ত উচিত হবে না, তবু না বলেও আমার নিস্তার নেই। রেবা কি বলছিল জানেন! বলছিল, ডিগ্রি নেওয়া ছাড়াও আপনার বাইরের পড়া শুনা দস্তুর মতো আছে—বিনয়-বশে যতই অস্বীকার করুন না কেন।

কি করে জানলেন উনি?

সেই তো ভাবি মাঝে মাঝে। আমার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে এমন সব কথা বলে—যা হয়ত আমি কোনদিন ভাবিনি। ওর বলার পর মনে হয়, আশ্চর্য্য—কথাগুলো তো মিথ্যে নয়। বোধ হয় ইনট্যুইশনটা ওর বংশগত।

কিন্তু আপনার সম্বন্ধে কি ভবিষ্যদ্বাণী উনি করেন?

একটা কি? আজ অবধি অনেকগুলিই তো বললে, মিললোও তা। আমার মনের পাতায় যা লেখা আছে—তা পড়ে ওই আমায় প্রথম জানিয়ে দেয়। একটা উদাহরণ দিই—শুনবেন? বোরিং লাগবে হয়ত।

না, না, আপনি বলুন।

একদিন বললে, আপনি নিজেকে জাহির করবার জন্য সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আশ্চর্য্য হয়ে গেলুম! কাউকেই তো এমন কিছু বলিনি যাতে করে ও এ-কথাটা ভাবতে পারে। সেদিন হয়েছিল কি জানেন? মোহন বাগানের খেলা নিয়ে একটু ক্রিটিসাইজ করেছিলাম; যাকে বলে ট্রেঞ্চাণ্ট ক্রিটিসিজ্‌ম। রেবা বললে, আপনার ক্রিটিসিজমের মূলে রয়েছে জেলাসি। আশ্চর্য্য! টেবিল চাপড়ে বললুম, প্রমাণ কর। ও হেসে বললে, এত লোকের সামনে? উত্তেজিত হয়ে বললুম, ক্ষতি কি। ও বললে, আপনারা সাক্ষী—আমার দায়দোষ নেই। পরে আমার পানে ফিরে বললে, আপনার রাগটা যেন দে'র পরেই বেশি বোধ হচ্ছে।

কারণ, আপনিও একদিন খেলোয়াড় হয়ে মোহন বাগানে নাম লিখিয়ে ছিলেন, আর ওই দে'সাহেব কোন খেলায়ই আপনার নামটি সিলেক্ট করেন নি। সবাই হেসে উঠলো। প্রথমটা ভারি রাগ হ'লো, পরে ভেবে দেখলাম, কথাটা মিথ্যা নয়।

আমি হাসিলাম।

হাসলেন যে! এটা অন্তর্দৃষ্টির কথা নয়?

বলিলাম, অন্তর্দ্দৃষ্টি তো বটেই। আমার হাসিটা অন্য কারণে—

কি কারণ?

বলিয়া তো মুশকিলে পড়িলাম দেখিতেছি। এমন ভাবে একস্‌পোজ্‌ও হওয়াতে অতিবড় সরল ও সত্যকামীরও রাগ হওয়া বিচিত্র নয়; চির-দিনের বন্ধুত্বে ফাটলও ধরে। তবু ক্রোধ আসিল না কেন স্মরজিতের! আসিল না, কারণ স্মরজিৎ হয়ত—হয়ত কেন, নিশ্চয়ই রেবার প্রণয়মুগ্ধ। প্রথমটা যে ক্রোধ উহার মনে জন্মিয়াছিল—তাহা অভিমানেরই ছদ্মরূপ। জাঁক করিয়া পাঁচ জনের সম্মুখে সত্য কথাটা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেও অপ্রত্যাশিত দিক হইতে এমন লজ্জাজনক পরিস্থিতির উদ্ভব হইতে পারে—তাহা হয়ত স্মরজিৎ ভাবিতে পারে নাই।

স্মরজিৎ ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিল, চুপ করে রইলেন যে?

মানে—, ইতস্তত একটু করিলাম—কি ভাবে কথাটা মানাইয়া বলা যায়। মানে আপনি—আপনার ক্রোধটা যে স্থায়ী হলো না তার কারণ আপনাদের আলাপ গভীর।

স্মিতহাস্যে স্মরজিতের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দীপ্তকণ্ঠে সে কহিল, আলাপ না বলে প্রণয়ও বলতে পারতেন।

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া বলিলাম, সে আপনি জানেন, আমি বলতে পারি কি?

স্মরজিৎও হাসিল। সেই হাসির সূর্য্যকিরণে আমাদের পরিচয়টা আর একটু নিবিড় হইল যেন।

স্মরজিতের কণ্ঠস্বর অতঃপর গাঢ় ও গদ্‌গদ্ হইয়া উঠিল। চেয়ারটা আমার পানে টানিয়া আনিয়া সে বলিতে লাগিল, আপনার কাছে লুকুবো না, ওকে আমি ভালই বাসি। এ ভালবাসা অবশ্য—একদিনে হয়নি। যতই ওর সঙ্গে মিশছি—যতই ওকে জানছি ততই যেন বিস্ময় আমার বাড়ছে। এমন অল্প বয়সে—

তাই হয়। জোয়ারের জল পুকুরে ঢুকলে পদ্মফুলের ডাঁটায় যেমন টান ধরে—তেমনি আর কি।

স্মরজিৎ উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল, তা'হলে আপনার সম্বন্ধে ওর ধারণাটি সত্য? আপনি কবিই বটে!

উপমাটা আমার নয়, ও একজন বড় কবির গল্প থেকে নেওয়া। আপনাদের দেখে আমার কবি হতে ইচ্ছা হয় বটে।

লিখুন না একটা কবিতা—রেবাকে নিয়ে। স্মরজিতের চোখের দৃষ্টি প্রদীপ-শিখার মতই উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বিদ্যুৎশিখা আরও উজ্জ্বল, কিন্তু চোখের দৃষ্টির সঙ্গে উহার তুলনা দেওয়া চলে না।

হাসিয়া বলিলাম, রেবাদেবীকে নিয়ে কবিতা লিখব—সে শক্তি আমার কোথায়? আপনার মনের রং—আপনার চোখের আলো আমি কোথায় পাব বলুন।

স্মরজিতের দৃষ্টি ম্লান হইয়া আসিল, কহিল, আমি তো কবিতা লিখতে পারি নে।

লিখবার দরকারও নেই। আপনাদের আলাপই কবিতার চেয়ে উত্তম প্রকাশ।

আপনি ঠাট্টা করছেন। আবার হাসিতে তাহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া

উঠিল। একটু থামিয়া বলিল, কয়েকটা ভাল ভাল কবিতা বলুন না, মুখস্থ করে রাখি।

তাতে আপনার মনটাকে কোথায় খুঁজে পাবেন!

ঠিক বলেছেন; নৈলে ধরুন না:

I send my heart up to thee, all my heart
In this my singing!

মন ওতে সায় দেয় না?

অদ্ভুত ভাবে। কিন্তু ওতো আর চেঁচিয়ে বলা চলে না। তাঁরা যা পেয়ে কথার মালা গাঁথলেন—আমরা তা পেয়ে অনুভবে মগ্ন হয়ে রইলাম। বললেই মনে হবে অভিনয় করছি।

কিন্তু অভিনয় তো করছেন না।

সত্য জিনিস বড় সুকুমার। অনুভবেই তো আনন্দ।

সিঁড়িতে পদশব্দ হওয়াতে আমাদের আলোচনা বন্ধ হইয়া গেল। স্মরজিৎ কহিল, তাহ'লে তৈরী হয়ে নিন।

কুণ্ঠিত স্বরে বলিলাম, আপনারাই যান। আমার জামাটামাগুলো সব আনা হয় নি।—জামা যে নাই সে কথা বলিতে পারিলাম না। এত কাছে আসিয়াও মানুষ কত দূরে সরিয়া থাকে!

উঠুন তো। আমাকে টানিয়া তুলিয়া স্মরজিৎ কহিল, আমার একটা সুট আপনাকে ফিট করবে হয়ত। পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুনরায় কুণ্ঠিত হাস্যে কহিলাম, ডবল প্রমোশন সইবে না, ধুতি শার্টই ভাল।

আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে। ওদের নিয়ে আমি দোতলায় চললুম।

মন স্মরজিতের পিছনে পিছনে ছুটিল। কে বলে—আমি রেবাকে

লইয়া কবিতা লিখিতে পারি না? স্মরজিতের মনের আলো ও প্রাণের রঙ ওযে একান্তভাবে আমারই, প্রতি রোমান্স-পিপাসু তরুণ-মনের সম্পত্তি। বিশেষ কোন রেবাকে ভাল বাসিয়া তরুণ-কবি কোন কালে কি প্রেমের কবিতা লিখিয়াছে? হয়ত তাহাদের জীবনে রেবারা আসিয়া থাকে, হয়ত আসে না। না আসিলেই বা ক্ষতি কি! কল্পনায় রঙীন হইয়া উঠা—ওযে তরুণদেরই একচেটিয়া অধিকার। বিশেষ কোন অভ্যুদয়ে মন তাহাদের ফুলিয়া উঠিতে পারে—সৃষ্টিকার্য্য চলে অকারণে। নহিলে বিশ্রী এক বাদলাদিনে ঝুলন-পূর্ণিমার চাঁদকে লইয়া তাহাদের এত মাতামাতি কেন?

এমিল জোলা মনে একটা ছাপ মারিয়া দিল। শুধু রূপালী পর্দ্দায় সু-অভিনয় নয়, অভিনয় দেখার আয়োজনটা যেন অভিনয়পর্ব্বকে ছাপাইয়া উঠিল। বিচিত্র-শাড়ী সজ্জিতা মহিলা-মধ্যবর্ত্তী হইয়া গন্ধে ও হাসিতে হিল্লোল বহাইয়া এমন চিত্র দেখিবার সুযোগ জীবনে বহুবার আসে না। এমন বহুজোড়া ঈর্ষাক্ষুব্ধ দৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া পরিপূর্ণ-ভাবে আনন্দ উপভোগ করিতে পারে কয়জন? মানুষের তীব্রতম—সুখই তো তীব্রতম বেদনার কেন্দ্র হইতে উৎসারিত। নিজের দুঃখ না হউক, পরের দুঃখ-সমুদ্রে আলোড়ন তুলিয়া তবে সে নিজেকে স্বর্গীয় ও সুখী মনে করে। মোটরের সুখাসনে বসিয়া আমার বার বার এইকথা মনে হইয়াছে, এয়ার কন্‌ডিশনড ঘরে বসিয়াও সেই আত্মপ্রসাদে স্ফীত হইতেছি। আমি যাহা নহি, তাহার অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিই কি এই স্ফীতির কারণ? আমার মত যাহারা এই সুখে বঞ্চিত—তাহাদের চোখে ক্ষোভের প্রকাশ তাই কি আমার এতই ভাল লাগিতেছে?

কেমন দেখলেন? রেবা কি রিণি কে যেন শূন্যে একটা মৃদু প্রশ্ন

ছুড়িয়া মারিল। কাহার উদ্দেশে ছুড়িল জানি না, আমিই সেটি লুফিয়া লইয়া উত্তর দিলাম, চমৎকার।

রিণিও প্রতিধ্বনি করিল, হাঁ, চমৎকার।

রেবা বলিল, শস্তা সেন্টিমেন্টের একটা গুণ—মনকে প্রবলভাবেই নাড়া দেয়।

ঈষৎ আহত হইয়া বলিলাম, শস্তা সেন্টিমেণ্ট মানে?

ওই—প্রাণ বাঁচানো-টাচানো আর কি।

এতো জোলার লাইফ। যা ঘটেছে—তাই, মানে ন্যায় বিচারের জন্ম জীবণ পণ।

আমি তো বলিনি—যা ঘটেনি তাই টেনে এনে চোখের জল বার করবার আয়োজন সিনারিও-লেখক করেছেন? আমি শুধু বলছি, শস্তা সেন্টিমেণ্ট—যত যুগের পুরোণো হোক তবু মানুষের মনকে টানে।

স্মরজিৎ বলিল, সে টানা কি দোষের?

রেবা হাসিয়া বলিল, দোষগুণের কথাও হয় নি। এক শতাব্দীর আগের মানুষের মন—আর আজকের মানুষের মনের কোন পরিবর্ত্তন কি হয় নি? রুচি কি কোথাও ঘা দেয় না, যুক্তিবিচার কোথাও আহত হয় না?

সকলেই সবিস্ময়ে রেবার পানে চাহিলাম। ইলা বলিল, একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—ধর., পুত্রশোক। ওর ব্যথা সব কালেই কি সমান নয়?

রেবা বলিল, যুক্তি মর্ম্মস্পর্শী হলো বটে, মননধর্ম্মী হলো না। মৃত্যু আনে ওলোট পালট, তার সামনে হৃদয় কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়, বিচ্ছেদের ভয়ে বাষ্পময় হয়ে ওঠে—রুচির সেইটিই তো সর্ব্বোত্তম দিক নয়। বিকারটাকে বিচার বলে ধরলে হবে কেন?

ইলা বলিল, ন্যায় বিচারের জন্য নির্দোষীকে বাঁচাবার জন্য যে চেষ্টা—সে চেষ্টা তো মহৎ—তার মধ্যে শস্তা—

হাসিয়া রেবা বলিল, ওরই মধ্যে শস্তা ভাববিলাসের বাসা। মানুষ অভিভূত না হলে—বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে? যুক্তিকে না ভাসিয়ে দিলে—জীবনকে তুচ্ছ করবার সাহস তার হবে কেন! একটু থামিয়া বলিল, পরের জন্য জীবনদান এই ক্ষুদ্র বিন্দু থেকে দেশের জন্য জীবন-দান—এই নদীর সৃষ্টি। দামামা বাজিয়ে যোদ্ধার রক্তকে উষ্ণ রাখতে হয়—যোদ্ধার যুক্তিকে ভাসিয়ে দিতে হয়।

রিণি মুগ্ধ কণ্ঠে বলিল, রাসকল্‌নিকফের ওই যে খুন করার যুক্তি—

রেবা বলিল, ডষ্টয়েফস্কির সঙ্গে জোলাকে জড়াস নে আর!

কেন, তুজনেই তো লেখক।

আমিও তো লেখক। 'অস্তাচলে' আমার একটা গদ্য কবিতা বেরিয়েছিল।

রিণি হাসিয়া বলিল, কবিতাটি একজনের তো বড় সুন্দর লেগেছিল, সেটা প্রায় মুখস্থ হয়ে গেছে? বলিয়া বক্রকটাক্ষে স্মরজিতের পানে চাহিল।

স্মরজিৎ গম্ভীর ভাবে বলিল, ওর কবি-প্রতিভাকে আমি অস্বীকার করি না, সম্পাদকেরাও করেন নি।

রেবা হাসিয়া বলিল, তবু তা যেমন রবিঠাকুরের কবিতার সমগোত্রীয় নয়, তেমনি জোলা আর ডষ্টয়েফস্কি। অমন তীব্র অনুভূতি আর যুক্তিবাদী মন নিয়ে কম লেখকই কলম ধরেছেন।

জোলা দেখতে এসে ডষ্টয়েফস্কির স্তুতিবাদ—কি ধান ভানতে শিবের গীত হচ্ছে না! স্মরজিৎ সস্মিতহাস্যে বলিল।

রেবা বলিল, ধান ভানার পরিশ্রম আছে, শিবের গীত গাইলে সেই

পরিশ্রমের অনেকটা লাঘব হয়। ভারার উপর ইট, চুন সুরকি তুলতে তুলতে কি মজুর-মজুরনীরা গান করে না?

ইলা বলিল, ধন্যি মেয়ে—হয় কে নয় করে তবে কাজ।

অনেককাল থেকে অনেক হয় নয় করা আছে, সেগুলো আমাদের বদলানো দরকার। গরুর গাড়িতে শুয়ে শুয়ে দেহে ব্যথা আর মনে অস্বস্তি নিয়ে ওপরের চাঁদকে দেখে আমরা কবিতা লিখতে পারি এ যুগে? পারি সুপ্রিয়বাবু?

একটু চমকিত হইয়া কহিলাম, বিশেষ করে এ প্রশ্নটা আমাকেই করলেন কেন?

মুখ টিপিয়া সে হাসিয়া বলিল, দুই আর দুয়ে চার হয় একথা মানেন তো? তেমনি আর কি।

না, খুলে বলুন।

তবু বলতে হবে? যাঁরা চুপ করে শোনেন—তাঁদের মুখে-চোখে সে কথা লেখা থাকে।

সে লেখা সবাই কি পড়তে পারেন?

পারেন বই কি। জ্যোতিষ-বিদ্যাটা কি ভুয়ো মনে করেন? আমাদের বাড়িতে ওর রীতিমত চর্চ্চা হয়।

বুঝেছি, থট রীডিং।

বুঝেছেন, তবে থট রীডিং নয়—আর কিছু। সুরজিৎ বাবুকে আমি জানি, কাউকে ভাল লাগলেই উনি নিঃশেষে দেউলে হয়ে বসেন।

উত্তর দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হাসিয়া বলিলাম, মহাজনেরা দেউলেদের মর্ম্মকথা জানেন কিছু কিছু।

আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তো—সুরজিৎ বাবু—সহসা রেবা থামিয়া গেল।

সকলেই উৎকণ্ঠিত স্বরে প্রশ্ন করিল, কি, কি?

আমি রেবার পানে চাহি নাই, স্মরজিতের পানেই চাহিয়াছিলাম। দেখিলাম, চোখে তাহার বিজলী-দীপ্তি বিচ্ছুরিত হইয়াই—গভীর একটি নিষেধের ইঙ্গিতে মিশিয়া গেল। কথাটা বলিবার পূর্ব্বে রেবাও সেদিকে চাহিয়াছিল, কাজেই অর্দ্ধপথেই সে কথার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

আর একদিন বলব।

আজ যদি মাথা ধরে ওঠে? রিণি হাসিয়া বলিল।

তাহ'লে ইউ-ডি-কলোন জল পটি দিয়ে লাগিও। হাওয়া করবার কেউ থাকে তো আরও ভালো।

সকলেই হাসিয়া উঠিল।

আলোচনা চলিতেছিল, একটা য়ুরোপীয়-অনুকৃতি দেশী কাফে বসিয়া। উর্দ্দিপরা চাপরাসী, মার্ব্বেল পাথরের টেবিল, স্বতন্ত্র বসিবার ব্যবস্থা, দেওয়াল-বিলম্বিত অর্দ্ধনগ্ন ছবির প্রাচুর্য্য, রেডিও সেট ছাড়াও—একটা অর্কেষ্ট্রা পার্টির কর্ণ-বিনোদনের ব্যবস্থা। তাছাড়া, ক্রোকারি-কাটলারি বিদ্যুৎ বাতিতে চোখ ঝলসাইয়া দিতেছে। প্রকাণ্ড একটা সাইন বোর্ডে—বহু অজানা ও নানা দেশীয় খাদ্যের তালিকা। রসনাকে লোলুপ করিবার পক্ষে সবগুলি যথেষ্ট না হইলেও—রসনার কৌতূহল উদ্রিক্ত করে। অজানাকে জানিবার কৌতূহল কোন্ ইন্দ্রিয়ের নাই?

রুটিতে মার্ম্মালেড মাখিয়ে নিন, সুপ্রিয়বাবু। ওকি, কাঁটা-চামচ ব্যবহার করুন তবে তো খেয়ে আরাম পাবেন। স্যাণ্ডউইচটা ঠেলে রাখলেন যে? গ্রেভি-কাট্‌লেট চলে তো? না হয় পটাটো চিপস্।

মেনুর অরণ্যে ক্রমশই দিশাহারা হইতেছি। রসনার কৌতূহল আছে, অজানাকে চাখিবার শঙ্কাও আছে। জিহ্বার রুচিটাকে একেবারে তুচ্ছ করা কত কঠিন—এইসব মুহূর্ত্ত যাহার না আসিয়াছে—তাহাকে বুঝাইব

কি করিয়া ? চিরদিন সুক্তোর নামে যাহার জিভে জল সঞ্চার হয়, গ্রেভি-কাটলেটের স্বাদে সে প্রলুব্ধ হইবে কেন !

অনভ্যস্ত হাতে-কাঁটা চামচ চালাইলাম, অন্যের প্লেটে নজর রাখিয়া মেনুগুলির নিখুঁত সম্পাদনাও করিলাম। মুখে তারিফ করার মত ভাব ফুটাইলাম, পরিতৃপ্ত না হইলেও মনে হইল, ইহার চেয়ে আর কিছুতেই বুঝি তৃপ্তিবোধ করিতে পারিতাম না।

সিগারটাকে অস্বীকার করিলাম শুধু। সভ্যতার খাতিরে ওটা স্কুল-যুগ হইতে অস্বীকার করিয়া আসিতেছি। অস্বীকৃতির হেতু আমার টী-টোটালার প্রকৃতি নহে, শ্বাসনালীর ধূম-বহন ক্ষমতার অভাব। মনে আছে, প্রথম কৈশোরে একবার গুরুজনদের লুকাইয়া এক পয়সার পাঁচটা টম্‌টম্‌ সিগারেট লইয়া আমরা বাঁশ ঝোপের আড়ালে গিয়া প্রথম পরীক্ষা করি। সে পরীক্ষায় অনেকেই সাফল্য লাভ করিলেও, অনবরত কাসির ধাক্কায় আমি বমি করিয়া ফেলিয়াছিলাম। পয়সা খরচ করিয়া এত উৎপাত সহ্য করিবার বীরত্বটুকু ঠিক পরিপাক করিতে পারি নাই। ভাগ্যে পয়সায় পাঁচটা সিগারেট নামধারী অতিকড়া টম্‌টমের উপর দিয়া পরীক্ষাটা সুরু হইয়াছিল। কাঁচি গোল্ডফ্লেকের পাল্লায় পড়িলে কি শ্বাসনালীর নিজস্ব একটা পিপাসা—ভালবাসার আকারে প্রকট হইয়া উঠিত না ? তবে ধূমপায়ীর সংখ্যা কম থাকাতে—স্মরজিতের একবার মাত্র অনুরোধের পর এই পশ্চাদপসরণের দৃশ্যটা অনালোচিতই রহিল।

বাড়ির দুয়ারে মোটর হইতে নামিতেছি, রেবা একটু সরিয়া আমার কানের কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে বলিল, আজ রাত্রিতেই—আজকের ব্যাপারটা নিয়ে একটা লিখে ফেলবেন।

একটু চমকিত হইলাম দেখিয়া বলিল, আমার নামটা যেন তার মধ্যে থাকে।

রাত্রির আকাশে কি রোমাঞ্চ জাগিল, না, নক্ষত্রগুলি সহসা অমন জ্বলজ্বলে হইয়া উঠিল? মৃদু এসেন্সের গন্ধে একটুখানির জন্য ঈষৎ যেন তন্দ্রাতুর হইয়া পড়িলাম।

৮

টিপয়ের উপর একখানা চিঠি পড়িয়াছিল। অজানা হস্তাক্ষর। লাইন-দুই পড়িতেই লেখিকাকে চিনিতে পারিলাম। লেখা ছিল:

ভাইটি, আজ তোমার খাওয়ার কথা বোধ হয় ভুলে গেছ? দিনের বেলায় ব্যস্ত ছিলাম বলে রাত্তেই কাছে বসে খাওয়াব ভেবেছিলাম। কিন্তু দেবুরা তোমাকেও সিনেমায় ধরে নিয়ে গেছে শুনলাম। খাবার হয় তো খেয়েই আসবে—তাই বেশি কিছু দিলাম না। নতুন খেজুর গুড়ের একটু পায়স—ঢাকা রইল। যত সাহেবীখানাই খেয়ে এসো, ঠাকুরের প্রসাদটুকু ফেলতে পারে না। কাল দিনের বেলায় আলোচালের ভাত খেয়ে খানা খাওয়ার প্রায়শ্চিত্ত করে যাবে নইলে…

তৃপ্তি—দিদি

ভারি মিষ্ট লাগিল চিঠিখানা। স্নেহ ও শাসনের সুরে মাখামাখি। প্রায়শ্চিত্ত না করিলে—আমারই অনুতাপের সীমা থাকিবে না। নূতন নলেন গুড় ও চাউলের ভুর ভুরে গন্ধে রসনা উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। তবু খাইবার স্পৃহা তেমন অনুভব করিলাম না। বাগানভর্ত্তি বিলাতী মরসুমী ফুল গাছের মাঝখানে একটি মল্লিকার শ্রীহীন চারা রোপণ করিতে বাধিল। অথচ স্নেহের দানকে অবহেলায় দূরে সরাইয়া রাখিতে মন সরিল না। খানিকটা আস্বাদ করিলাম। মুখহাত ধুইয়া খোলা জানালার ধারে চেয়ার টানিয়া বসিলাম। কার্ত্তিকের হিমের একটা পাতলা ধোঁয়ার চাদর বাড়িগুলির মাথায়। সন্ধ্যায় যে ধোঁয়া হিমের চাপে উপরে উঠিতে পারে না—তার কুশ্রীতা এখন যদিও নাই—তবু

প্রকৃতিকে রহস্যময়ী এবং বিষণ্ণ বোধ হইতেছে। ঘুম উত্তেজিত মস্তিষ্ক ভেদ করিয়া চোখের পাতায় এত শীঘ্র নামিবে না। একটা কবিতা লিখিব কি? এই বন্ধ্যা ঘরে বসিয়া—কল্পনাদেবীকে আরাধনা করিলে ক্ষতি কি?

স্মরজিৎ তো বলিয়াছিল রেবাকে লইয়া একটা কবিতা লিখিতে।

কাগজ কলম লইয়া টেবিলের সম্মুখে গিয়া বসিলাম। টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালিয়া আকাশের পানে চাহিলাম। নক্ষত্রজগতে আবার যেন শিহরণ জাগিতেছে, পাতলা কুয়াশা ভেদ করিয়া চাঁদের রহস্য-মধুর হাসিটিও উছলিয়া উঠিল। রাত্রির মধ্যযামে শহর বুঝি ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরিতেছে!

আপনি তো খাসা লেখেন

যা হয় একটা লিখলাম।

আচ্ছা, এ সব ঠিকমত অনুভব করে লিখেছেন, না এমনি?

আপনিও এক সময়ে কবিতা লিখেছিলেন—বোঝেন না?

বুঝি। কথার মধ্যে যথার্থ ভাবটিকে বেঁধে রাখা কম ক্ষমতার কাজ।

বেশ লাইন:

> নিশ্বাস মম ঘন হয়ে লাগে তোমার 'পরে,
> তুমি ভাব বুঝি উড়ে সে অলক দখিন বাতাস ভরে।

মুখখানি আমার রক্তিম বর্ণ ধারণ করিল।

আচ্ছা সুপ্রিয়বাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব? সত্যিই কি কোনও উড়ন্ত অলকের উপর কবির নিশ্বাস ঘন হয়ে পড়েছিল কোন দিন?

কল্পনার তো অবাধ গতি।

না, সবটা কল্পনা ভাবতে আমার ইচ্ছে করে না। মনের সুকুমার ভাবগুলো কল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া কি নিষ্ঠুরের কাজ!

একটা নিশ্বাসের দ্রুত পতন আমার গণ্ড স্পর্শ করিল। বড় চেনা চাপা একটা মৃদুগন্ধ বায়ুস্তরে ভাসিতেছে। আকাশ তারায় তারায় আবার রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। প্রবল একটা কম্পন সারা দেহে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি করিল। দেহে কেমন জ্বালা ধরিল।

চোখ মেলিয়া চাহিতেই—কোথায় সে কুয়াশা-রহস্যময়ী রাত্রির তারা-রোমাঞ্চিত আকাশ। রূঢ় রৌদ্রের রেখা টেবিলের উপর রক্ষিত মাথায় লাগিয়া জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। কালির দোয়াতটায় কলমটি ডুবানো. খাতায় আর দু'ছত্রের বেশি কবিতাও নাই।

হে রাণী, তোমার উতল বুকেতে যত আছে কথা গান
প্রেম সরসীর কমল হইয়া এ বুকে লবে কি স্থান ?

মাত্র এইটুকু ? এ লেখাটা ভালও লাগিতেছে না তেমন। যদিও মিষ্ট লাগিতেছে। নিজের লেখা কবে আর মিষ্ট না লাগে। মনে হয়, বার বার পড়ি। বহুদিন পূর্ব্বে স্থূলকায় মাসিক পত্রিকায় কয়েকটি কবিতাও আমার বাহির হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয়—সেই কবিতা ছাড়া মাসিক পত্রের আর কোন লেখা পাঠ করি নাই। মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল সে কবিতা—তবু শতবার পড়িয়াছিলাম। এইকটা ছত্র তেমনই ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাথায় পাক খাইতে লাগিল।

কাল রাত্রিতে নিমন্ত্রণের যে আভাস ছিল আজ তাহার কোন বার্ত্তাই কানে আসিল না। অথচ আজ বড় ইচ্ছা হইতেছিল, দিদির সঙ্গে খানিকটা গল্প করিয়া আসি। খাওয়ার অজুহাত না থাকিলে গল্পের অবসর পাওয়া এখানে সম্ভব নহে। খাওয়াটা তো যাচিয়া লওয়া যায় না।

অরুণকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার পিসিমা কোথায় গেছেন জান ?

পিসিমা ? পিসিমা তো সকালের ট্রেনে দেওঘর গেলেন।

তরু বলিল, জানেন না ? উনি তো বৈদ্যনাথ আর কাশীতেই থাকেন।

কেন, সেকথা জিজ্ঞাসা করাটা অশোভন বোধে নিরস্ত হইলাম। কাল বিলাতী কায়দায় খানা খাওয়ার প্রায়শ্চিত্তের ভয় দেখাইয়া আজ সকালে সহসা দেওঘর যাত্রা—কিছু যেন রহস্যের মতই ঠেকিল। ধনীর খামখেয়ালিপনার কি আর অন্ত আছে! মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতে লাগিল। কাল সিনেমায় না যাওয়া হইলে অনেক কথাই হয়ত ইঁহাদের সম্বন্ধে জানিতে পারিতাম। কিন্তু পরের সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার কৌতূহল কি মানুষকে সব সময় পাইয়া বসে? পরের সম্বন্ধে না জানিলেই বা ক্ষতি কি! কিছুই নহে। তবু পরকে ভালবাসিয়া যেমন শান্তি,—পরের অশান্তি দোষ—অভাব প্রভৃতি জানিয়াও মানুস একটু পরিতৃপ্তি লাভ করে। সে তৃপ্তি মানুষ যাহা কল্পনা করে—তাহার বেশির ভাগ বাস্তব-পথানুবর্ত্তী বলিয়া, খানিকটা বা অন্যের চেয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয় বলিয়া কিংবা দুঃখভোগের সমভূমিতে পা রাখিয়া দাঁড়াইবার কথা মনে করিয়া। শোকে যে সান্ত্বনা দিতে আসে-- খানিকটা শোক সে রাখিয়া যায় বৈকি। সান্ত্বনা দেওয়ার মধ্যে সান্ত্বনা পাওয়ার কথাটিই প্রধান, অথচ সেই কথাটিই উভয়ের মধ্যে গোপন থাকে!

কাল রাত্রির ছোট্ট চিঠিখানিতে মনের কোণে ঐ যে নরম একটু জায়গা দুই একগাছি শ্যাম দূর্ব্বায় সজ্জিত হইতে চাহিতেছিল—আজ দুপুরের আলোচনায় তাহা চাপা পড়িয়া গেল।

রেখা আজ একাই আসিয়াছে। একেবারে আমার এই ত্রিতলের কক্ষে ঢুকিয়া সোজাসুজি প্রশ্ন করিল, কৈ দেখি, কি লিখলেন ?

দুপুরেও অসমাপ্ত কবিতার পাদপূরণ-চেষ্টা চলিতেছিল। কয়েকখানি বই খাতার উপর চাপাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া কহিলাম, কই আর লিখলাম।

না, লিখেছেন। আপনার মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছে—মুড়ে আছেন।

হাসিলাম।

উঁহু, খাতাখানা চাপা দেবেন না। দেখি?

বাধা দিবার পূর্ব্বেই টানিয়া লইল খাতা।

ইস, কেটেকুটে কি করেছেন? সম্পাদকরা আপনার লেখা না পড়েই বোধ হয় ফেরৎ পাঠান।

সুর করিয়া কবিতার চার লাইন সে পড়িল। আমি আড়ষ্টের মত বসিয়া তাহার মুখভাব লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। সমস্ত রক্ত আমার মুখে আসিয়া জমিল। প্রশংসা পাইলেও যে রক্তোচ্ছ্বাস নামিবে না জানি। প্রশংসা না পাইলে গলাটা শুধু শুকাইয়া ওঠে—বুকের গোড়াটা অকারণে কাঁপিতে থাকে। ফাঁসির কাঠে ঝুলিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের অভিজ্ঞতা আমার নাই—কিন্তু লেখা পড়িয়া কঠিন বিচারক কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন তাহার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তকে তেমনই সঙ্কটজনক কল্পনা করিয়া লইতে পারি। রেবার মুখের আলো উজ্জ্বলতর হইল না. চক্ষের তারায় শুধু কৌতুক উছলিয়া উঠিল। চোখ বাহিয়া সেই হাসি স্ফুরিত ওষ্ঠে মৃদু প্রলেপ লাগাইয়া দিল। খানিক থামিয়া খাতা বন্ধ করিয়া সে কহিল, ভাগ্যিস সারারাত জেগে কবিতাটি শেষ করেন নি।

লেখার ইচ্ছা হলো না—তাই।

তাই নাকি! আমার তো মনে হয়—ইচ্ছা যথেষ্টই ছিল, কিন্তু ভাবের গভীরত্বই আপনার লেখার বাধা জন্মিয়েছে।

আপনি ঠাট্টা করছেন।

তবে বুঝি এমিল জোলা দেখে কল্পনা-বিরোধ ঘটেছিল।

তা কেন ঘটবে! আপনি তো বলেছিলেন, জোলার জীবনী শস্তা সেন্টিমেণ্ট্যাল—

নয় কি! ওই যে জাষ্টিস লিখতে লিখতে তিনি মারা গেলেন, ভাববিহ্বল না হলে শ্বাসরোধকর গ্যাস থেকে অনায়াসে পরিত্রাণ পেতে পারতেন।

অত সাবধানী হয়ে শ্রেষ্ঠ লেখা চলে না। আপনার যুক্তিবাদী ডষ্টয়েফস্কিরও তো মৃগীরোগ ছিল।

তাতে করে প্রমাণ হয় না যে,—সহসা থামিয়া বলিল, আচ্ছা জোলার মত লিখতে পারেন? অমনি সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে সত্যিকারের স্থায়ের জন্য প্রোপাগাণ্ডা করতে পারেন?

বিস্ময়ান্বিত হইলাম। বলিলাম, কিন্তু জোলাকে ভাবপ্রবণ বলে আপনি কালই তো নাকচ করে দিয়েছেন।

না। ভাবপ্রবণ বলেছিলাম, কিন্তু নাকচ করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। সব কালের ভাবপ্রবণতায় আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে—এইটেই আমি বলেছিলাম। তেমনি সব কালের অন্যায়ের জাতও কি এক! আশ্চর্য্য, যা অন্যায় বলে মনেপ্রাণে বুঝছে, তাকে শুধরে নিলে প্রেস্টিজের অখ্যাতি হবে এইটেই তাদের বড় ভয়। সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার ধ্বজাধারী ফ্রান্সের মনোভাব আর বহুঢক্কানিনাদিত তথা-কথিত ডেমোক্রেসি দুইই সমান!

চুপ করিয়া রহিলাম।

সত্যি, লিখুন না। জোলার মত অমনি প্রচার-সাহিত্য আমাদের বড় দরকার।

কিন্তু সাহিত্যের ধর্ম্ম প্রচারে নষ্ট হয়।

কি হবে সূক্ষ্ম কলা-কৌশল নিয়ে। চেখে চেখে রস ভোগ করবার অবসর আমাদের কোথায়?

রসিক মন সে কথা স্বীকার করবে না।

না, সুপ্রিয়বাবু, গলায় শেকল ঝুলিয়ে রসের সন্ধান যে রাখতেই হবে আমাদের তেমন কোন কথা নেই। বীণা বাজিয়ে প্রেম-সঙ্গীত, ঈশ্বর-সঙ্গীত এসব গাওয়া চলে, কিন্তু দেশ-সঙ্গীত শুধু শেকলের শব্দের সঙ্গেই মানায়।

কতটা সেন্টিমেণ্টাল হলে—মানুষ এমন কথা বলে?

রেবার গৌর মুখে দ্রুত শোণিত সঞ্চালনের বর্ণাবেশ হইতে লাগিল। বুঝিলাম, সে মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, এবং প্রাণপণে ক্রোধ দমনও করিতেছে। দাঁত দিয়া নিম্ন ওষ্ঠ ঈষৎ চাপিয়া ভ্রূভঙ্গ করিয়া কহিল, হু। ঠিক বলেছেন।

বেদনা পাইলাম। এই উচ্ছ্বাসের তরঙ্গে অনেক কাহিনীই হয়ত মুক্তার মত কৌতূহলের কূলে আসিয়া লাগিত, অনেক তরঙ্গেই হয়ত সূর্য্যকিরণ জ্বলিয়া উঠিয়া বর্ণ-বিভ্রম ঘুচাইয়া দিত—কিন্তু ঠিক মত প্রত্যুত্তর দেওয়ার অভ্যাস মানুষ ছাড়িতে পারিবে কেন? উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্যে যে যুদ্ধপিপাসা, অস্ত্রাঘাতের পিপাসার চেয়ে সে বৃত্তি কম তীক্ষ্ণতর নহে।

তাহলে লিখব—ওই রকম একটা কবিতা?

পারবেন? ম্লান হাসিয়া সে কহিল, না, কাজ নেই। ফরমাস দিয়ে সাহিত্য তৈরী হয় না। ভেতরে দাহ্য পদার্থ না থাকলে—আগুন জ্বলতে পারে না।

লোহায় পাথরে ঘষে আগুন জ্বলে তো!

জ্বলে—কিন্তু জ্বালিয়ে রাখতে গেলে সোনার সাহায্যও নিতে হয়। থাক ওসব কথা। আপনার কবিতা লেখার ক্ষতি করিয়ে যা-তা বকে মরছি শুধু। বলিয়া সে উঠিল।

না, না, বসুন। ক্ষতি যা হবার তা কাল রাতেই হয়েছে।

তাহ'লে সত্যি কথা বলব? ক্ষতি আপনার হয় নি।

হয় নি? আদ্ধেক কবিতা লিখে—বাকিটা না লেখার কষ্ট যে কি—

রেবা হাসিয়া বলিল, জানি বৈকি। চিত্ত-প্রসাধনের সবটা না শেষ হলে কষ্ট তো হয়ই। সেটা মানুষের ধর্ম।

তবে যে বলছেন ক্ষতি হয় নি?

চরম ক্ষতির কথা বলছি। আপনি কবি না হয়ে আর কিছু যদি হয়ে ওঠেন—তাই বা মন্দ কি।

কিন্তু এই মুহূর্তে কবি না হতে পেরে আমার যে কষ্ট—

কষ্ট? বলিয়া সে আবৃত্তি করিল :

> সেই হোমানলে হের আজি জ্বলে দুখের রক্ত শিখা
> হবে তা সহিতে মর্ম্মে দহিতে আছে সে ভাগ্যে লিখা।
> সে দুখ দহন—কর মোর মন

পারেন না সেই দুঃখকে পুড়িয়ে ফেলতে? বলিয়া হাসিতে হাসিতে রেবা চেয়ারের পিঠে এলাইয়া পড়িল।

৯

কিছুই স্পষ্ট বুঝিতেছি না, অথচ যেটুকু বুঝিতেছি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিবার সাহস আমার নাই। কখনও মনে হইতেছে—রেবার চারিদিকে যে কুয়াশার আবরণ তাহা বুঝি খসিয়া পড়িতেছে, কখনও মনে হইতেছে—সে কুয়াশা নূতন হিমকণায় গাঢ় হইতেছে। ছেলেবেলায় শুনিতাম, বৌ-কুয়াশা নামে ভোর রাত্রিতে, সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লজ্জাভীরু বধূও মুখ লুকায়। কিন্তু গিন্নী-কুয়াশার লজ্জার বালাই নাই, কাজেই বেলায় আসিয়া যাই-যাই করিয়াও তাঁর যাওয়া ঘটে না। তবু এক সময়ে গিন্নী-কুয়াশাও চলিয়া যান।

কোন্ হোমানলে—কি দুঃখের রক্ত শিখা জ্বলিতেছে? কেন জ্বলে সে শিখা? তার দহন সহ্য করিবার দুর্ভোগ কেনই বা আমাদের পোহাইতে হয়? এবং সেই দুঃখ দহনের পন্থা....খুব অস্পষ্ট তো নহে। তবু ফ্যাশন-বিলাসিনী মেয়েদের মুখে এ কথার কোন গূঢ় অর্থ আছে বলিয়া ভাবিতে পারিতেছি না। ভাব-বিলাসিতাকে যে শস্তা বলিয়া চিনিতে পারে, সেই ভাব-বিলাসের মর্ম্মচ্ছেদ করিয়া কৌতুক বোধ করে, আবার সেই ভাব-বিলাসেই ডুবিয়া মরিতে চাহে—সে মেয়েকে—সে মেয়েকে কেন—কোন মেয়েকেই তো আমি চিনিবার চেষ্টা করি নাই এযাবৎ! সাধারণ চাকুরী-সমস্যাজীবী যুবক—কলেজ সীমানা হইতে সংসার প্রাঙ্গণে পা দিয়া—কল্পনা-বিলাসে মাতিয়া কল্পিতাকে লইয়া কতটুকুই বা বিভোর হইতে পারে! কলেজ সীমানার মধ্যে রোমান্সের বীজ হৃদয়ে উপ্ত হয়। উচ্চ একটি পদ—উপযুক্ত সর্ব্বগুণান্বিতা এক সঙ্গিনী—জগতে অর্থাৎ বাংলায় খানিকটা যশগৌরব—এইগুলিই তো কামনা করিয়াছি। ইহার সঙ্গে বড় জোর বিলাতের সতত-ক্রন্দন-পরায়ণা প্রকৃতি, সাগর দোলার ঢেউ, বালিগঞ্জের একখানি ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের নিদর্শন কুটীর, একখানা অষ্টিন কার। রেডিও সেট সে বাড়িতে জগতের সংস্রবকে বাঁচাইয়া রাখিবে, সংবাদ পত্রে ও মাসিক পত্রিকায় সেই সংযোগকে সুমিষ্ট করিবে। এইটুকুই তো কামনা। তবে ভালবাসা যদি হয়—সে ভালবাসা পূর্ব্বরাগসঞ্চিত হওয়া চাই। শহরের পথেঘাটে শুনিয়াছিলাম, সেই পূর্ব্বরাগ অদৃশ্য জীবাণুর মত ছড়ানো আছে—বাতায়নের পরদায়, পার্কের লৌহ বেঞ্চের উপরে, ময়দানের শষ্পাসনে, ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধের সীমানায়, লেকের পরিবেশে। আধুনিক সাহিত্যের সংবাদও কিছু রাখিতাম, সবটা না বুঝিলেও সে-সাহিত্য যে একান্ত তরুণদেরই জন্য—সেই কথা ভাবিয়া

উৎফুল্ল হইতাম। তবে যেটুকু বুঝিতাম—তাহাতে কৈশোর-যৌবন সন্ধিক্ষণের চঞ্চল মত—আবেগে বিস্ফারিত হইয়া উঠিত। সত্যকার তরুণ নহিলে—উত্তপ্ত যৌবনের প্রথম জাগরণটিকে উপলব্ধি করিবার শক্তি কোথায়। মিথুনাসক্তির একটা ক্ষণ আছে; সেই পরম ক্ষণের উগ্র অনুভূতি উষ্ণ রক্তের ধারায় ধারায় সুরার মত প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্ষণকে ক্ষণের মধ্যেই বিলুপ্ত করিয়া দিয়া তবে তাহার তৃপ্তি। আর কিছুদিন পরে অবশ্য ক্ষণকে যুগে টানিয়া আনিবার সাধনা সুরু হয়।

তবু সেই তরুণ-সাহিত্য অন্তরে আলোড়ন তুলিলেও কল্পনায় আবদ্ধ ছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে অনেক প্রকার দুর্নীতি প্রশ্রয় পাইলেও, মিথুনাসক্তির পৌনঃপুনিকতা নাই। সে সুযোগও দারিদ্র্যের মধ্যে কম। প্রেমের উপরে অন্ন-সমস্যা শাণিত বলিয়া শোণিতের উষ্ণতা ডিগ্রি ডিঙাইয়া বিপর্যয় প্রায়ই ঘটায় না। নিশীথরাত্রির নিদ্রাহীন অবসরে মনকে তাহা ক্ষতবিক্ষত করিলে—প্রভাতে ওই বধূ-কুয়াশার মতই নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।

কাল রাত্রিতে তারায় তারায় যে শিহরণ জাগিয়াছিল—তার জন্য দায়ী বিলাস-আরাম স্পৃষ্ট আমার বহুদিনের ক্ষুধিত মন। যেইমাত্র তাহার দারিদ্র্য-মোচনের জয় ডঙ্কা বাজিয়া উঠিয়াছে—তুরঙ্গের মত তাল ঠুকিয়া সে পা নাচাইতে আরম্ভ করিয়াছে। রেবা-রিণি-অনুদের লইয়া নক্ষত্রের সভায় সে রস-রচনার সম্ভারে সমৃদ্ধ হইতে চাহিয়াছে।

অনেকক্ষণ ধরিয়াই ভাবিতে লাগিলাম, রেবাও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতে লাগিল আপন মনে। এই চিন্তা ও হাসির শেষ পরিণাম কি হইত—যদি না স্মরজিৎ আসিয়া পড়িত!

সে-ও একটু অবাক হইয়া দুজনের পানে চাহিয়া বলিল, চুপচাপ বসে কি ভাবছেন—সুপ্রিয়বাবু?

রেবা ত্বরিতে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, উনি কবিতা লিখছেন।

স্মরজিৎ বলিল, মূর্ত্তিমতী বাধাকে নিয়ে কবিতা লেখা!

মুশকিল তো বেধেইছে, বোধ হয় মাথাটা ওঁর ধরেছে। একটু বেড়িয়ে এলে—খানিকটা সুস্থ বোধ করতেন তো।

চলুন—যাবেন?

না।

লজ্জা কি, একটা মীটিং আছে হরিশপার্কে—দেখে আসবেন।

কিসের মীটিং?

সত্যাগ্রহীদের কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ,—না, বন্দী-অনশনের ঠিক মনে হচ্ছে না।

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, তবে নাই বা গেলে!

বাঃ রে, দেশের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে হলে—সেখানে কি ঘটছে না-ঘটছে সেগুলো জানা দরকার নয়?

যদি বলি, এই জানার চেষ্টা তোমাদের বিলাস ছাড়া আর কিছু নয়?

বললেনই বা। কোন্‌টাই বা আমাদের বিলাস নয়! ঘটা করে বিলিতী কাপড় পোড়ানো, পিকেটিং করা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন-আন্দোলন, মিছিল করে বাছা বাছা শ্লোগান আওড়ানো, কোন্‌টা নয়?

আন্দোলন মাত্রেই খারাপ নয়, আড়ম্বর না হলে লোককে টানে না।

তাই নাকি! কিন্তু সে টানা তো যতক্ষণ জাঁকজমক। যে স্রোত সমুদ্রের মধ্যে ফিরে যায় তার টানই যে সর্ব্বনাশা। কবি কি বলেন?

কবি সম্বোধনে সারা মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই রেবা বলিল, চলুন না, রাতের আকাশ আর দিনের ময়দানে কতটা তফাৎ দেখে আসি গে। না গেলে মনে করব রাগ করেছেন।

রাগ তো করিয়াছিলামই, কিন্তু না গেলে সে ক্রোধের প্রকাশটা

অশোভন হইয়া পড়িবে বলিয়াই বুঝি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম, না, রাগ কেন।

করেন নি তো! বলিয়া এমন ভাবে সে হাসিল—যেন রাগ না হওয়াটাই অশোভন।

স্মরজিৎ আমার বিব্রত ভাব লক্ষ্য করিয়া বলিল, আর দেরি করলে মীটিং বা সিনেমা কোনটাই দেখা হবে না।

আজও সিনেমায় যাবেন?

নিশ্চয়, মেরি এণ্টয়নেটের শেষ দিন। ধনিকতন্ত্র উচ্ছেদের চিত্র দেখতে বেশ লাগে।

কিন্তু আপনারা তো ধনী। ফস করিয়া মুখ দিয়া কথাটা বাহির হইয়া গেল।

রেবা রাগ করিল না। স্নিগ্ধ হাসিয়া কহিল, কেমন স্মরজিৎবাবু?

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, কথাটা অবশ্য ওভাবে বলিনি। মানে—

রেবা বলিল, উনি জানেন। ধন থাকাটা তো অপরাধের নয়—সেত বহুজন্মের সুকৃতি।

আপনি জন্মান্তর মানেন!

ঘাড় হেলাইয়া সহজ সুরে রেবা বলিল, মানি বৈকি! ঈশ্বর আছেন এ সান্ত্বনায় মন যতটা না ভরে, জন্মান্তরবাদে অনেক দুঃখই ভুলতে পারি।

কি করে ভুলবেন?

কেন ভুলব না? মানুষ যেমন চলছে, সুখ দুঃখও তেমনি চলছে। কালের অবিরাম প্রবাহে—একজায়গায় কোন কিছু দাঁড়িয়ে থাকছে কি? অজেয় রোম সাম্রাজ্য ধ্বংস হবে—কেউ ভেবেছিল কোনদিন! অথচ সে খ্যাতি আজ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ছড়ানো। তেমনি যদি ভাবি

আজকে যে ভারতে আছি, জন্মান্তর পেরিয়ে সেই ভারতে হয়ত আসব না—

তা কেন, অন্য স্বাধীন দেশেও তো জন্মাতে পারবেন।

তা হলে জন্মান্তরবাদের মূল সূত্রটিকে অগ্রাহ্য করতে হয়। অনুকূল প্রতিবেশ ছেড়ে আত্মা তো অজানা দেশে নবজন্ম গ্রহণ করবে না।

তর্ক পেলে তোমার আর কোন জ্ঞান থাকেনা। শো-টাই তাহলে দেখা হবে না।

না, না, আগে মাঁটিঙে অ্যাটেণ্ড করে—তবে সিনেমা। ঝাল না মিশিয়ে কি মাংস রান্না সম্ভব! আপনি ঝাল ভালবাসেন তো, সুপ্রিয়বাবু?

বাসি, তবে বেশি নয়।

তাই আপনার কবিতা এত মিষ্টি যে মুখ মেরে দেয়। একটু ঝাল মিশোবেন এর সঙ্গে। সেই হাসি রেবার ওষ্ঠে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

আবার সাহিত্য! একটা-না-একটা তোমার চাই-ই রেবা।

মোটরে বসিয়া রেবা বলিল, সাইকিক ফোসে আপনি বিশ্বাস করেন, সুপ্রিয়বাবু?

না।

অথচ সেই অগ্নিযুগের স্বদেশী লোকগুলি করতেন। তাঁরা হিমালয় খুঁজে সাধুসন্ন্যাসী বের করার কল্পনাও করতেন। যোগবলে—একদিনে ভারত উদ্ধার হবে—এ ধারণা কারও কারও ছিল।

চুপ করিয়া রহিলাম।

স্বরজিৎ বলিল, সে ভুল ভাঙতেও তাদের দেরি হয় নি।

ভুল বলছেন কেন? আর ভুলই যদি হয়—সে ভুলকে সত্য বলে

প্রচার করবার জন্য দায়ী তাঁরা নন, দায়ী আমাদের পূর্ব্বযুগের ঋষি বা মনীষীরা।

তাঁরা যে তপস্যার কথা বলেছেন, তার মর্ম্মকথাটি আমরা হয়ত গ্রহণ করতে পারি নি।

না, মানুষের মর্ম্মকথা মানুষ গ্রহণ করতে পারে না, এ অসম্ভব। এ আমার বিশ্বাস হয় না। কামধেনু লক্ষ লক্ষ সৈন্য সৃষ্টি করলে, অগস্ত্য গণ্ডূষে সমুদ্র শুষে নিলেন, বিন্ধ্যগিরি তাঁর তপঃপ্রভাবে চিরকাল মাথা নামিয়ে রইল, কটাক্ষে তাঁরা সমস্ত ভস্ম করে দিতেন—এ যুগে কেন হয় না ওসব?

এ যুগের সাধনা তেমন কই।

সে যুগেরই বা কি সাধনা ছিল! গুরুগৃহে বাস, শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শাস্ত্রশিক্ষা, ভগবৎচিন্তা; প্রতিবেশীর রাজ্য আক্রমণ করে দিগ্বিজয়ের চেষ্টা, দ্যূতক্রীড়া, স্বয়ম্বর সভার অনর্থপাত, অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজনে সারা ভারতবর্ষকে গৃহযুদ্ধের আসরে নামানো—

থাম। স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, ব্রহ্মণ্য-শক্তি সে কালে প্রবল ছিল, শূদ্র-শক্তির এত বিস্তার ছিল না তো।

কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষের পরিকল্পনা তাদের যদি থাকতো তো খণ্ড খণ্ড রাজ্য জয় করে বিদেশী শক্তি এক নাগপাশে বাঁধতে পারতো না। সে দেশাত্মবোধ কারো ছিল না।

এখনই বুঝি সে দেশাত্মবোধ জেগেছে।

দাঁত হারিয়ে দাঁতের মর্য্যাদা বোঝার মত। যাই হোক, মহাভারতের যুগে এক মহামানব এই সর্ব্বনাশা ভবিষ্যৎকে ঠেকাবার আয়োজন করেছিলেন, ফলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ। কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভারত তখন পূর্ব্ব-যুগের সংস্কারভারে নুয়ে পড়েছে, নূতন মন্ত্র তার কানে পৌঁছল না।

উহাদের মৃদু দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে আমার দীর্ঘ নিশ্বাসও মিশিল। সেই সোনার দিনকে কল্পনা করিয়াও কত সুখ। তাঁহারা করিয়া গেলেন ভুল, ভুলে ভুলে অপরাধ হইল পর্ব্বতপ্রমাণ, আর যুগ যুগান্তর ধরিয়া সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি আমরা। সেই যুগে আমরাও কি জন্মিয়াছিলাম? আমরাও কি পরস্পর কাটাকাটি হানাহানি করিয়া অনাগত এই যুগের অভিশাপকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া দিয়াছিলাম!

চির মৌন চাঁদ ও তারারা সে কথা জানে। উহাদের আলোয় হয়ত লেখা আছে—গাঢ়তম অন্ধকারে মাখা অতীতের সেই কলঙ্ক কথা। আর হয়ত জানেন সপ্ত অমর—সত্য যুগ হইতে দ্বাপর যুগ পর্য্যন্ত যাঁহারা পৃথিবীকে বহুবার বাহ্য আকারে ও অন্তর-লাবণ্যে পরিবর্ত্তিত হইতে দেখিয়াছেন। ব্যাস, বলি, বিভীষণ, হনুমান, অশ্বত্থামা—

মোটর আসিয়া পার্কের গেটে থামিল।

বক্তৃতা তখন আরম্ভ হইয়াছে। লাউড স্পীকারের উচ্চ নিনাদ পার্ক ছাড়াইয়া রাজপথ অতিক্রম করিতেছে। অগ্রসর হইবার উপায় ছিল না—মোটরে বসিয়াই বক্তৃতা শুনিতে লাগিলাম। শোণিত শিরায় শিরায় উষ্ণ হইয়া উঠিল—চক্ষু ভাবাবেশে অশ্রু-গাঢ় হইল। হাজার হাজার লোকের এই সম্মিলন—এক অত্যাসন্ন গৌরবকে যেন দ্রুত বহন করিয়া আনিতেছে। পার্কের পশ্চিম প্রান্তে—সূর্য্য অস্তায়মান। বালার্ক কিরণের মত সেই রক্ত রশ্মিতে আমাদের ভবিষ্যৎকে যেন প্রত্যক্ষ করিলাম। হৃদয়ে যদি পুলক জাগে, প্রাণের স্পন্দন যদি দ্রুততর হয়, চক্ষু যদি উজ্জ্বল অশ্রুবিন্দুতে ভরিয়া আসে, লোমকূপ যদি নীপকেশরের মত কণ্টকিত হয়—কে আছেন যুক্তিবাদী মানুষ এই ভাবাবেশকে যুক্তি দিয়া খণ্ড বিখণ্ড করিবেন? তিনজনের কেহ কাহারও পানে চাহি নাই, অথচ অনুভব করিতেছিলাম, তিনটি তন্ত্রীই একটি সুরে বাজিয়া

উঠিতেছে। সারা মহানগরী কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে—আশায়. উত্তেজনায়, আনন্দে।

আবার রাজপথ দিয়া মোটর ছুটিতেছে। তন্দ্রার ঘোর কাটিয়া বাস্তব জগৎ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতেছে। সভাক্ষেত্রের বাহিরে ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-রিকশা তেমনই নিরুদ্বেগে চলিতেছে; মানুষ তুচ্ছ কথা লইয়া তেমনই বিবাদ করিতেছে বা উদ্দাম ভাবে হাসিতেছে। যে পরম ঘটনা পার্কের মধ্যে এইমাত্র ঘটিয়া গেল—যুগপ্রলয়বাহী অনিবার্য্য এক উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত শক্তি প্রচণ্ড গতিতে কয়েক সহস্র নরনারীর চেতনার কেন্দ্র আক্রমণ করিল—সে বেগ—সে শক্তির কণামাত্রও মহানগরীর এই অংশে পৌঁছিতে পারে নাই। প্রত্যহের সঙ্কীর্ণ খণ্ড ঘটনাংশে ভরিয়া এই প্রান্ত নিশ্চেতন হইয়া আছে। শুধু আমরাই কয়টি প্রাণী—নবচৈতন্যের অগ্নিবাণী বহিয়া—নিরাসক্ত রাজপথ অতিক্রম করিতেছি।

রেবাদের গৃহদ্বারে মোটর আসিয়া থামিল। রাসবিহারী এভিন্যু হইতে সরু একটা গলির মাঝখানে ছোট বাড়িটা। সামনে লন আছে, ক্ষুদ্র বারান্দা আছে; বড় বাড়ির বামনাকৃতি সংস্করণ আর কি! ছোট্ট বাড়ির আলিসার উপরে নৃত্যরত নটরাজের হাতে অগ্নিচক্র। যেমন মন্দিরের চূড়ায় লৌহ ধ্বজচক্র প্রোথিত থাকে। একটা চীনা জুঁয়ের লতা দ্বিতল অতিক্রম করিয়া—সেই চক্র স্পর্শ করিয়াছে। সামনের ছোট গেট—প্রাচীরও খাটো। চোর আটকাইবার জন্য উঁচু প্রাচীর দিয়া বাড়ির সৌন্দর্য্যকে হত্যা করার রীতি শহরে নাই। পল্লীতে প্রাচীরের মধ্যে বাড়িটা আত্মগোপন করিয়া থাকে, যেন শ্বশুরালয়ে নববধূ বাস করিতেছে; শহরের বাড়ি পিত্রালয়ের মেয়ে—আব্রুরক্ষার প্রয়োজনটা বাহুল্য মাত্র।

বৈঠকখানা ঘরে নীল আলো জ্বলিতেছিল। একজন প্রৌঢ় চেয়ারে বসিয়া টেবিলে প্রসারিত হরিদ্রাভ কাগজের উপর নিবদ্ধদৃষ্টিতে কি রেখাপাত করিতেছিলেন। বর্ণ তাঁহার তাম্রাভ। শিরা-প্রকটিত রোমশ বাহু—বলি-রেখাঙ্কিত রুক্ষ মুখমণ্ডল। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, বাহুমূলে ও কণ্ঠে চন্দন রেখা। গলায় স্ফটিক মালা। বাম এবং দক্ষিণ হস্তে পলা, শঙ্খ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি অষ্টধাতু ও বিবিধ রত্নের অঙ্গুরীয়। মাথার চুলে ছোট মত একটি চূড়া বাঁধা—চূড়ায় একটি শ্বেত বকফুল। নীল আলোয় তাঁহার কাষায় বস্ত্র জ্বলিতেছিল।

রেবা আসিয়া ডাকিল, বাবা।

তিনি সুপ্তোত্থিতের মত চাহিলেন। তীক্ষ্ণ—মর্ম্ম-সন্ধানী দৃষ্টি। মুখের বলি-রেখায় তরঙ্গ তুলিয়া এক টুকরা হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, এই যে স্মরজিৎ, বস। এঁকে তো চিনতে পারলুম না?

স্মরজিৎ আমার পরিচয় দিল। সহাস্যে তিনি আমাকেও বসিতে বলিলেন। কি জানি কেন, তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টিপাতে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। শ্বাসরোধকর আবহাওয়ার মধ্যে প্রাণ যায় আর কি।

তিনি বলিলেন, তোরা ওপরে গিয়ে বস, রেবা। আমি কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠীটা মিলিয়েই যাচ্ছি।

আমরা যে সিনেমায় যাচ্ছি।

সিনেমা? আচ্ছা বেশি রাত যেন না হয়।

বাবা, সুপ্রিয়বাবুকে ধরে নিয়ে এসেছি—ওঁর সম্বন্ধে কিছু বলবে না আজ?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, রাত্রিতে কররেখা ঠিক ঠাহর হয় না। বয়স তো হচ্ছে। তা ছাড়া—সিনেমা দেখতে যাওয়ার মুখে ভবিষ্যদ্বাণী করাটা ঠিক উচিত হবে না।

কেন, পাছে অশুভ কিছু বলে ফেলি ?

সে সম্ভাবনা তো যথেষ্টই আছে। চার পয়সার ফরচুন টেলারদের মত শুধু রাজা হবার কথা হয়ত শোনাতে পারব না, আবার মস্ত একটা ফাঁড়া আছে বলে গ্রহশান্তির দরুণ কিছু হাতিয়ে নেওয়াও চলবে না। উনি যে তোমার বন্ধু।

অদৃষ্ট জানিবার কৌতূহল মানুষ মাত্রেরই প্রবল। আমারও ছিল অদৃষ্ট জানিবার শঙ্কা, আনন্দ বা উদ্বেগ কোনটাকেই হয়ত মানুষ কোন দিন অতিক্রম করিতে পারিবে না—মুখে সে যতই অবজ্ঞা প্রকাশ করুক না কেন। সসঙ্কোচে বলিলাম, হস্তরেখার বিচার না হয় থাক, মোটামুটি মুখ দেখে কিছু বলুন না ?

তিনি অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার মুখের উপর ফেলিয়া বলিলেন, এ বিদ্যারও বিচার আছে—যুক্তি আছে। খুব খেলো জিনিস এ নয়। তবু লোকে একে জানবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে। ভয় থাকে, না জানি গ্রহাচার্য্য কি অমঙ্গলের কথাই বা বলবেন।

জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর আমার শ্রদ্ধা আছে।

আছে ? বলিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিকে তীব্রতর করিয়া আমার মুখের উপর ফেলিলেন। মাথা নামাইয়া লইলাম—এমনই প্রখর সে দৃষ্টি।

মনের বল আপনার কম।

অন্তরে কাঁপিয়া উঠিলাম।

মঙ্গল আপনার লগ্নাধিপতি।

শুষ্ক কণ্ঠে বলিলাম, তার ফল ?

ফল ? ফল রক্তপাতে মৃত্যু। স্বাভাবিক রোগভোগে মৃত্যু নয়—কোন আকস্মিক ঘটনায়—

রেবা হাসিয়া বলিল, মনে আছে স্মরজিৎ বাবু, বাবা আপনারও যেন এইরকম ভবিষ্যৎ বলেছিলেন?

স্মরজিৎ বলিল, আছে।

রেবার পিতা বলিলেন, স্মরজিতের সম্বন্ধে আমি স্থিরনিশ্চয়---এঁকে দিনের বেলায় না দেখে সঠিক বলতে পারব না।

আমি বলিলাম, মৃত্যু আমি জানতে চাইছি না। জীবনটা কি ভাবে চলছে বা চলবে--

আর কি ভাবে আশা করেন চলবার? রাজত্ব আপনার কপালে নেই, ধনসম্পদও না। নিতান্ত সাধারণ গৃহস্থ-জীবন---যার শেষ পরিণতি স্কুল-মাষ্টারি।

মনের সুখ?

ওটা আর নাই বা জানলেন! সুখ দুঃখের প্রাপ্তি সম্বন্ধে আপনার সম্পূর্ণ হাত নেই সত্য, কিন্তু সুখ দুঃখকে নিয়ন্ত্রণ করবার কিছু ক্ষমতা তো আপনার আছে।

সে ক্ষমতা আমার আছে?

আপনার আছে, সকল মানুষেরই আছে। পুত্রশোকে সবাই কাঁদে —সবাই সামলায় আবার।

আর ত জ্যোতিষের বিচার চলবে না। আপনাদের সিনেমা দেখা ও কুমার বাহাদুরের কোষ্ঠী দেখা দুটোই অত্যাবশ্যক। হরিদ্রাভ কাগজের সম্মুখে আবার তিনি পেন্সিল হাতে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

স্মরজিৎ বলিল, আপনার চেকটা এনেছিলাম।

এনেছ—দাও। কত? দু'শো টাকা তো? ধন্যবাদ। চেকখানা পকেটে পুরিয়া পুনরায় কোষ্ঠীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

রেবা বলিল, পঞ্চাশ টাকা ওর মধ্যে আমি নেব কিন্তু।

পঞ্চাশ! বড় বেশি না?

তাহলে দিয়ো না। রেবা অভিমানভরে মুখ ফিরাইল।

তিনি তৎক্ষণাৎ কহিলেন, বাঁচালি। তা আমার ঠেঁয়ে না নিয়ে স্মরজিতের ঠেঁয়েই নিস না কেন।

আমাকে শুধু শুধু টাকা দেবেন—কি দায় ওঁর।

তা বটে। যত দায় আমারই বেলায়। দায়াদায়ের কথা পরে হবে —উপস্থিত সিনেমা—

আমায় তাড়াতে পারলে তুমি বাঁচ।

না বাঁচলে কুমার বাহাদুরকে কি করে বাঁচাই বল। মস্ত ফাঁড়া ওঁর—হোম—যাগযজ্ঞ -

ছাই ফাঁড়া। রেবা রাগ করিয়া উঠিয়া বলিল, থাক স্মরজিৎবাবু, আজ আর সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই।

কিন্তু আজ যে শেষ দিন।

কার? বলিয়া মৃদু হাসিয়া দ্রুতবেগে কক্ষত্যাগ করিল।

১০

ট্রামে করিয়া একাই ফিরিতেছিলাম। স্মরজিৎ ও রেবা বার কয়েক অনুরোধ করিয়াছিল থাকিবার জন্য, কিন্তু অনুরাগ-গাঢ় নাটিকার মধ্যে আমি অনাবশ্যক চরিত্র। সিনেমায় বসিলে—সামনের পর্দ্দায় প্রতিফলিত ছবিকে উপলক্ষ্য করিয়া তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি নেহাৎ বেমানান হয়তো হইত না, কিন্তু ক্ষুদ্র একখানি বাড়ির ক্ষুদ্রতম কক্ষে যে নিভৃত অবসর ও পরস্পর-সংলগ্ন চিত্ত বিশ্রম্ভালাপে মগ্ন—সেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান

কোথায়? বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া চলিয়া আসিলাম। বৈঠকখানা অতিক্রম কালে—রেবার পিতা একবার মুখ তুলিয়া আমার পানে চাহিলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, বড়লোকের আশ্রয় আপনার মত লোকের ইষ্ট করবে না—পারেন তো শীঘ্র ও সংস্রব ছাড়বেন।

ওষ্ঠাগ্রে যে উত্তর আসিতেছিল—সেইটাই লুফিয়া লইয়া যেন তিনি বলিলেন, আমাদের অনিষ্ট হয় না, কেননা, প্রতিকার জানা আছে। দেখেছেন এই বাড়িখানা—স্বকৃত। অথচ বেশি দিন নয়—বছর চোদ্দ আগে গোলদীঘির রেলিঙের ধারে তেলকছাপা একটি শিকারী বেরালের মত ওৎ পেতে বসে থাকতাম।

তারপর বুঝি—

হাঁ, তারপরই সন্ধান পেয়ে গেলাম। কিনা, পরের ভাগ্যের মধ্য দিয়ে নিজের ভাগ্যের পরীক্ষা সুরু হ'লো। বলিয়া হাসিলেন। কি কর্কশ—তিক্ত হাসি। কক্ষ অতিক্রম করিতেছিলাম—হাসি থামাইয়া তিনি বলিলেন, অনেষ্ট লেবারে উন্নতি নেই। একটু ভড়ং—একটু কৌশল—

তার শেষ ফল কি ভাল হয়?

কি করে বলব—শেষ ফল কেমন হয় তার ইঙ্গিত দেওয়া চলে—দ্ব্যর্থ ভাষায়, শেষ পরিণতি বলা কি ততটাই সহজ?

তবে গণনা করেন কি?

ভাগ্য। যার খানিকটা জানা আর অনেকটা অজানা। যা মনের উপর ক্রিয়াশীল।

তাহলে ফাঁকি বলুন?

উহুঁ, অঙ্কশাস্ত্রের মতই নিভুল। মানুষের সূক্ষ্ম বুদ্ধির উপর এর ফলাফল নির্ভর করে।

বুঝতে পারলাম না।

আর একদিন আসবেন—বুঝিয়ে দেব। আজ ব্যস্ত আছি।

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া পথে আসিলাম ও ট্রামে চাপিলাম। খানিকদূর আসিয়া কেমন আগ্রহ হইল—ট্রাম ছাড়িয়া আর একবার হরিশপার্কে গিয়া ঢুকি। আজ অপরাহ্নে সেখানে যে প্রাণ-চাঞ্চল্য দেখিয়াছিলাম—সে যেন মনের মধ্যে অনুরণনে ভরিয়া আছে। আর একবার সে পার্ককে দেখিয়া আসি।

আসিয়া কি দেখিলাম?

মহানগরীর অন্য নিশ্চেতন অংশটা এই পার্কের বুকেই চাপিয়া বসিয়াছে বুঝি! কোথায় সভা? কোথায় জনতা? আলো জ্বলিয়াছে—ভিড় নাই। একটা বেঞ্চে আসিয়া বসিলাম। উদাসীন নগরীকে বড় রহস্যময়ী বলিয়া বোধ হইল। হাঁসের পালকে যেমন জলের দাগ পড়েনা—তেমনি ঘটনার দাগে চিহ্নিত নয়—এ শহর। কাগজে পড়িয়াছি—অসহযোগ আন্দোলনের দিনে—এই পার্কে কত জ্বালাময়ী বক্তৃতা—কত নির্য্যাতন—কত আত্মত্যাগ ঘটিয়া গিয়াছে। কাগজের পৃষ্ঠায় কালো হরপের সেই বর্ণনা কত মনের স্ফুলিঙ্গে যে অগ্ন্যুৎপাত করিয়াছে—অথচ........দৃক্‌পাতহীন মহাকালের গতিপথে এই শহরও নিস্পৃহ যোগীর মত তপস্যায় মগ্ন রহিয়াছে। ইহার মৌনতাকে ভেদ করা বুঝি সপ্তকোটি কণ্ঠোত্থিত কল কল নিনাদের কাজ নহে।

আঃ—কর কি! ভদ্রলোক রয়েছেন—

তুমি অত লজ্জা পাও কেন এলা? দুদিন বাদে তো—

হাঁ—বাবার কাছে আজ অবধি প্রপোজ করবার সাহস তোমার হল না!

বিবাহই কি সবচেয়ে বড়—

এই সে উদ্যান—ক্ষণপূর্ব্বে অগ্নিলীলায় তাণ্ডব সুরু হইয়াছিল। এখন তারার আলোয় চোখ রাখিয়া প্রণয়গুঞ্জনে শ্যাম শষ্প অভিষিক্ত হইতে চাহিতেছে। এখানকার তৃণে আগুনের ছোঁয়াচ লাগেনা, প্রণয়ের স্তবেই কি সে অঙ্কুরিত হইয়া উঠে?

উঠিয়া আসিলাম। ক্ষণে পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতি এ সহরের নিত্য সহচরী—তবু প্রকৃতিকে ভালবাসিয়া হৃদয়-বিনিময়ের খেলায় সে কোন দিন বুঝি মাতিতে পারিল না!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মীটিং শেষ হইয়া গিয়াছে, মিঃ দাশ অবিলম্বেই প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। সে জন্য বাড়িতে অবশ্য সাজ-সাজ রব কিছু পড়িয়া যায় নাই। শুধু সেক্রেটারি বিনয়বাবুর ব্যস্ততার মধ্য দিয়া বোঝা যায়, তিনি আসিতেছেন। রোজই—একটা তার কিংবা একখানা চিঠি বিনয়বাবুর নামে আসিতেছে। যত রাজ্যের সংবাদপত্র বিনয়বাবু জড়ো করিয়াছেন। কোনটায় পেন্সিলের দাগ পড়িয়াছে, কোন খবরটা বা কাঁচি দিয়া কাটিয়া একখানা বড় টালি বুকে সাঁটিতেছেন। সমস্ত তথ্য মিলাইয়া ইংরেজী ও বাংলায় রিপোর্ট লেখা চলিতেছে।

আমার সঙ্গে দেখা হইলে একবার বলিলেন, আজকাল কি কবিতা-টবিতা লিখছেন খুব?

এসব কথার উত্তর আমি আজকাল দিই না।

তিনিই আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বলিলেন, যদি কিছু মনে না করেন একটুখানি খাটিয়ে নিতে চাই আপনাকে। অবশ্য আপনার যদি আপত্তি থাকে—

এতটা ফর্ম্যালিটি আমি কোন কালেই পছন্দ করি না। বলিলাম, বেশ তো, কি কাজ বলুন—আমার সাধ্যমত—

অসাধ্য কিছু নয়। কবিতায় আপনার হাত আছে, এ কাজ আপনার দ্বারাই ভাল হবে। বলিয়া কাটিংস-সমন্বিত টালি বুকখানা খুলিয়া আমার সামনে ধরিলেন। এই ইংরেজী বাংলা অনেক রিপোর্টই এতে পাবেন। এর থেকে বেশ একটা রিপোর্ট—অর্থাৎ ভাবার্থ—কিনা হিষ্ট্রির মাল মশলা—

হাসিয়া বলিলাম, বুঝেছি। দুই এক দিন পরে হলেও চলবে তো?

নিশ্চয়। কর্ত্তার আসতে এখনো চার-পাঁচ দিন দেরি। আসবার আগে তার করবেন। কি জানেন, রিপোর্টটা তো দু'এক পাতার মধ্যে সারা যাবে না, রীতিমত একখানি বইয়ের ব্যাপার। তবু শক্ত বলে ইংরেজির ভারটা আমিই নিলুম। এক সময়ে মডার্ণ রিভ্যুয়ে লেখবার চেষ্টা করেছিলাম—তা ছাড়া—

বাংলা বুঝি আপনার আসে না?

আসবে না কেন—তবে আপনাদের মত কবিতা-টবিতা বেরয় না।

রিপোর্ট কি কবিতাতেই লিখব?

আরে না, না, কবিতা মানে কি কবিতাই! এই ভাষাটা একটু ইয়ে—elegant, একটু I mean—

বুঝেছি। যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু রিপোর্ট লেখার ধরণটি যদি বাৎলে দেন।

ও আর শক্তটা কি! আমার অনেক ইংরেজি রিপোর্ট আছে, তার

বাংলা অনুবাদও করেছি—তাই দেখে, বলিয়া কয়েকখানি খাতা আমার পানে আগাইয়া দিলেন।

ইংরেজীর ভাবার্থ বাংলা, না, বাংলার অনুবাদ ইংরেজী ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। রিপোর্ট রচনায় সেক্রেটারির পটুত্ব ধরা দিল। ষ্টাইল কোনটারই নাই। কুৎসিত রমণীর গায়ে অলঙ্কার চাপানোর মত দু'টি ভাষাই আড়ষ্ট ও সৌন্দর্য্যহীন হইয়াছে। দুটি বিকলাঙ্গ ছেলের হাত ধরিয়া পরিপূর্ণ গৌরবে তাহাদের মা যেমন জনতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ান—বিনয়বাবুর গৌরবটাও অনেকখানি সেইরূপ। নিরীহ ও আশ্রিত মাষ্টার ভিন্ন অন্য কাহারও সম্মুখে এই লেখা লইয়া মডার্ণ রিভ্যুয়ের স্কন্ধে চাপিবার গর্ব্বোক্তি করা সাজে না।

দেখলেন? মুখ তাঁহার গর্ব্ব-প্রদীপ্ত। কেমন, বুঝলেন তো?

হুঁ। বোধ হয় পারব।

আনন্দে তাঁহার ক্ষুদ্র চক্ষু সুগোল গালের মধ্যে আত্মগোপন করিল। টেবিল চাপড়াইয়া তিনি বলিলেন, কর্ত্তার ঘরটিও ভাল—নির্জ্জন। ওখানে লেখা খোলবারই কথা।

যেন উঠান ভাল হইলেই অনভিজ্ঞের নৃত্যও কলাপর্য্যায়ে উন্নীত হইতে পারে!

একটা কথা। আপনি নাকি তরু-অরুকে এ দুদিন পড়ান নি?

হাঁ, মানে ওঁরা—সিনেমায় টেনে নিয়ে গেলেন।

ওঁরা মানে স্মরজিৎবাবু আর বালিগঞ্জের দলটি তো? ওঁদের কি বলুন! চাকরির দায়িত্ব নেই তো, হুজুগের হাঙ্গামা যথেষ্ট। একটু থামিয়া দুয়ারের পানে চাহিয়া বলিলেন, ঘোড়ারোগ তাদেরই সাজে—যাদের ঘোড়া কিনবার পয়সা যথেষ্ট। আপনার আমার—

তা জানি। কিন্তু ওঁরা ডাকলেন, না বলতে পারলাম না।

সে হয়ত আমিও পারতাম না। তবু—আমাদের তা পারা উচিত। বলিয়া এমন ভাবে হাসিলেন—যেন এই বড় বাড়ির মধ্যে আমার যা কিছু অন্তরঙ্গতা জমিয়াছে সে উঁহারই সঙ্গে।

কাগজপত্র লইয়া উঠিতেছিলাম—একটা প্রশ্ন বহুক্ষণ ঠোঁটের অগ্রভাগে জমিয়াছিল, কৌতূহলের উত্তাপে এতক্ষণে তাহা খসিয়া পড়িল। আচ্ছা বলতে পারেন, দিদি হঠাৎ চলে গেলেন কেন?

দিদি! ওঃ, কর্ত্তার ছোট মেয়ে শৈলজা দেবীর কথা বলছেন? উনি তো এখানে থাকেন না। জামাইবাবু যে তিথিতে মারা গিয়েছিলেন—সেই তিথিতে কলকাতায় এসে তাঁর বাৎসরিক কাজকর্ম্ম করে আবার বাইরে চলে যান।

বাড়ির ওদিকটা দেখে মনে হ'লো—এদিকের সঙ্গে আলাদা।

আলাদাই তো। জামাইবাবু ওই দিকটায় থাকতেন। ঘর জামাই কিনা। ওই মহলে মারা যান তিনি। সে অনেক কথা। সেই থেকে ও মহলটা আলাদাই আছে। সেই থেকে শৈলজা দেবীর মাথাও কেমন খারাপ হয়ে যায়। তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ান। যাকে তাকে ভাই বলেন, খেয়াল হলো তো কাউকে দশ-বিশ টাকা দিয়েই দিলেন—এমনি। অথচ জামাইবাবু মারা যাওয়ার আগে ওঁর মতো—

সহসা তিনি চুপ করিয়া গেলেন। অভদ্রোচিত কৌতূহল, তবু বলিলাম, ওঁর মতো কি?

বড় বাড়িতে কাজ করতে হলে একটি শিক্ষা বরাবর মনে রাখবেন। কান রাখবেন সজাগ—চোখ রাখবেন খুলে, কিন্তু মুখ খুলবেন না কখনও। বলিয়া মৃদু হাসিয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

শিক্ষণীয় বটে! লোকটাকে ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

রিপোর্টই লিখিতেছিলাম, দ্বারে মৃদু টোকার শব্দ হইল। আর মিষ্ট কণ্ঠের ধ্বনি, আসতে পারি কি ?

খাতা একপাশে রাখিয়া বলিলাম, আসুন। আবার কোন সিনেমার বাণী বহন করিয়া রেবা আসিতেছেন বুঝি ?

রিণি প্রবেশ করিল। বলিল, রেবা আসেনি ?

না।

স্মরজিৎ-দা বাড়ি আছেন কি ?

জানি না তো।

তাহলে আসি—। অপ্রতিভ মুখে সে চলিবার উপক্রম করিতেই আমি বলিলাম, বসুন না, আমি স্মরজিৎ বাবুকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

ধন্যবাদ। আমার বিশেষ তেমন দরকার নেই—এই বইখানা রেখে দেন যদি—

বই নেবেন না আর ?

দুই এক পা করিয়া আগাইয়া আসিয়া রিণি টেবিলের উপর বইখানি রাখিয়া বলিল, পেলে তো নিই। চাবিটা তো আপনার কাছে নেই ?

কি বই নেবেন বলুন ?

চাবি আছে আপনার কাছে? আছে? খুসীতে তাহার সারা মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কাল স্মরজিৎ বাবু আমার কাছে চাবি রেখে গেছেন।

আনন্দে প্রায় ঘুরপাক খাইয়া রিণি একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিল, আঃ, বাঁচালেন!

তাহার এই ছেলেমানুষিতে আমার হাসি আসিতেছিল, অভদ্রতা হইবে বলিয়া কাগজপত্রের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া উদ্গত হাসিকে দমন করিলাম। খানিক পরে মুখ তুলিয়া কহিলাম, কি বই চাই আপনার ?

ডষ্টয়েফ্‌স্কির ব্রাদারস কারামাজোভ খানা থাকে তো—

আপনি ডষ্টয়েফ্‌স্কির খুব ভক্ত বুঝি?

আপনি নন?

আমি! আমার তো ক্লাসিক্‌স ভাল লাগে।

ক্লাসিক্‌স পড়তে গেলে আলট্রা-মডার্ণ লেখকদের খোঁজখবর নেওয়া আর হয় না।

ডষ্টয়েফ্‌স্কি কি আলট্রা-মডার্ণ?

তাই তো মাঝামাঝি বেছে নিয়েছি। মানুষের জীবন আর কতটুকু বলুন। তার চেয়ে কত অল্প তার পড়বার সময় বা ইচ্ছা। ক্লাসিক্‌স পড়বার আমাদের ফুরসৎ কই!

ক্লাসিক্‌স না পড়েই তো সাহিত্যের বিচার হয় আজকাল।

তা জানি না। সাহিত্য ঠিক বুঝি নে, ভাল বইয়ের নাম শুনলেই সেটা পড়তে ইচ্ছে হয়।

পড়ে কি বোঝেন? মাপ করবেন, মানে—

রিণি উচ্চহাস্য করিয়া কহিল, মানে আপনাকে বলতে বাধা নেই। ভাল বই সম্বন্ধে এত আলোচনা হয় আমাদের বৈঠকে যে সে সব বই না পড়া থাকলে মনে হয়—এই যুগে জন্মানোই মিছে। আর সমাজে মিশবার মুখও থাকে না। পড়লুম তো ক্রাইম এণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট। সত্যি বলতে কি ওই দু দু'টো খুনকে আমি বরদাস্ত করতে পারিনি ঠিক, অথচ ঐ থেকেই মনস্তত্ত্বের সুরু। মানি, ছোট্ট ঘরের মধ্যে থেকে মন সঙ্কীর্ণ ও আত্মনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তবু—

আমি আলমারি খুলিতেই রিণি চেয়ার হইতে ছিটকাইয়া আমার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল ও অনেকগুলি বইয়ের উপর হাত বুলাইয়া একখানা বই তুলিয়া লইল।

এইখানা—দুটো ভলুম যে। আচ্ছা একটাই শেষ করি আগে।

না, না, দুটোই নিন। একটা হয়ত এমন সময় শেষ হবে—যখন পড়বার মুড থাকবে প্রবল, আর একখানা কাছে না থাকায় আফসোস হবে প্রবল।

ঠিক বলেছেন। বলিয়া দ্বিতীয় খণ্ডটিও তুলিয়া লইয়া নাকের কাছে ধরিয়া নিশ্বাস টানিল।

ওকি করছেন?

ন্যাপথালিনের গন্ধ আমার ভারি ভাল লাগে। এই বইয়ের মধ্যে যে অনেক মনের খোরাক আছে—ন্যাপথালিনের গন্ধ সেটা জানিয়ে দেয়।

কাপড়চোপড়েও তো ন্যাপথালিন দিয়ে রাখে।

পোষাকে ও গন্ধ মানায় না, তাই এসেন্স ঢালতে হয়। আর একটু বসব কি?

নিশ্চয়।

আপনার কাজ ক্ষতি হবে না ত? অবশ্য কাজ ক্ষতি হলেও আমি শুনি না। আমার যেটুকু বক্তব্য তা বলে—তবে আমি উঠে থাকি। বলিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অতঃপর আলাপ চলিতে লাগিল।

আপনি কি সায়ান্স নিয়েছেন—?

উঁহু, আর্টস্‌টাই আমার পছন্দ। আমাদের এখানে সায়ান্সের যা চর্চ্চা হয়—! তাছাড়া ভালও লাগে না আমার। রেবা অবশ্য সায়ান্স নিয়েছে।

রেবাদের বাড়ি বুঝি আপনাদের বাড়ির কাছে?

কোথায়! হিন্দুস্থান পার্কে আমরা থাকি—ওর বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে।

. এক সঙ্গেই আসেন কিনা।

এক কলেজের ছাত্রী আমরা। বালিগঞ্জ থেকে স্কটিশ চার্চ্চ—কমখানি রাস্তা তো নয়। কিন্তু যাই বলুন, জ্যোতিষ আমার ভাল লাগে না। এমন মন খারাপ করে দেয়!

বেশতো অজানা বিষয় জানা যায়।

জেনে নিয়ে খানিকটা ভাবতে হয় তো? অবশ্য বেশিক্ষণ ভাবা আমার পোষায় না, তাই রক্ষে। নইলে প্রথম দিন উনি যা বলেছিলেন! আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো; যে গ্রহনক্ষত্র আকাশে থাকে, কিনা, পৃথিবীর সঙ্গে সমানতালে ঘুরছে—তাদের ক্রিয়া মানুষের দেহে কাজ করে কেন?

জ্যোতিষশাস্ত্র আমিও জানি না। তবু তিথি বিশেষে মানুষের দেহ রসস্থ হয়—একথা মানেন তো?

হয় না কি?

শোনেন নি ডাক্তাররা বলেন পূর্ণিমা বা অমাবস্যা না গেলে রোগের ভোগ কমবে না।

হাঁ, হাঁ, বলেন বটে।

অনেকে একাদশীর দিন ফাস্‌টিং করেন। ওতে শরীর হালকা হয়।

সত্যি? আমিও এবার থেকে একাদশী করব। স্লিম ফিগার রাখবার জন্য ও দেশের ফিল্ম-ষ্টাররা কত কসরৎই না করেন।

রিণির এই ছেলেমানুষি কথায় আর একবার হাসি দমন করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সশব্দ হাসিটা দমন করিলেও মৃদু হাসিকে রোধ করিতে পারিলাম না।

বাঃ রে, হাসলেন যে!

আপনি তো বিশেষ—

মোটা নই? ছ'মাসে কত বেড়েছি জানেন? চার পাউণ্ড। ওবিসিটি আর কাকে বলে! আচ্ছা ওবিসিটির ভাল বাংলা কি?

পৃথুলতা।

বাঃ—চমৎকার বাংলা। আমাকে এখন পৃথুল বলতে পারেন।

হাসিয়া বলিলাম, তা পৃথুলত্বের জন্য এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কেন হচ্ছেন? যে দেশে মোটা হবার জন্য—নাদুশনুদুশ হবার জন্য দিনরাত সাধনা চলে!

ছি! ভুঁড়ি দেখলে আমার এমনি ঘৃণা হয়! বলিয়া কুঞ্চিত নাসিকায় এমন এক অপরূপ ভঙ্গি করিল—যাহাতে হাসি ঠেকানো দুষ্কর। আমাকে হাসিতে দেখিয়া কণ্ঠে জোর দিয়া বলিল, জানেন, এই রকম রোগা আর ভুঁড়ির বৃদ্ধি হলে পঞ্চাশ বছর পরে আর্য্য বলে বড়াই করা আর আমাদের চলবে না!

কিন্তু বাংলা দেশের জল হাওয়া যে আর্য্যত্ব লোপ করবার মস্ত বড় সহায় তা আপনি জানেন তো?

কেন?

এমন কোমল মৃত্তিকা—জলা আর জঙ্গল—অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফসল হয়—এমন ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী প্রকৃতি—ঋতুতে ঋতুতে কত রকমের ফলমূল, অল্প শীত, বেশি গরম, বেশি বর্ষা—এখানে মানুষ পরিশ্রমও করবে অল্প, ঘুমোবে বেশি।

এই! তা ভুঁড়ি হবে কেন?

শারীরিক পরিশ্রম না হলে চর্ব্বি বাড়বে না?

তাহলে আপনি বলেন বাংলা দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে আমাদের ফিগার নষ্ট হবার ভয় নেই?

আফ্‌গানদের ফিগার দেখেছেন তো?

চমৎকার! আমরা যদি ওখানে গিয়ে বাস করি—বাস করতে দেবে?

বাস করতে দিলে আপনার ফিগার হয়ত উন্নত হবে, কিন্তু সারা দেশটা তো আফ্‌গানিস্থানে নিয়ে যেতে পারবেন না।

তাহলে উপায়? পরম দুশ্চিন্তায় রিণির মুখে ছায়া নামিল।

উপায় দেশের ধারা বদলাতে হবে। আপাতত—ওই যে স্মরজিৎবাবু আসছেন।

স্মরজিৎ আসতেই রিণি লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, এই বইটা নিয়ে যাচ্ছি। আর শুনুন, ক্রাইম এণ্ড পানিশ্‌মেণ্ট আমার তেমন ভাল লাগে নি।

শাস্তি আর অপরাধ বলে?

ওই খুন—কি বিশ্রী ব্যাপার! নয় কি?

হবে।

তবে যুক্তিগুলো ওর চমৎকার।

বইটা ভাল না হলে—যুক্তিতে কি যায় আসে।

বাঃ, যুক্তিই তো আসল। লেখার মধ্যে কাহিনীটা অবশ্য সরস হলে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়। তার সঙ্গে যুক্তি থাকলে সোনায় সোহাগা।

আজ যাবে মেট্রোয়?

না, আজ ফিরপোয় একটা ডিনারের নেমন্তন্ন আছে। মিঃ চৌধুরীর সঙ্গে কিটি মিত্তিরের কাল বাগ্‌দান হলো—আজ তারই খাওয়া। পরশু ডায়মণ্ড হারবারে পিক্‌নিক।

বেচারার ঘাড়টা খুব ভাঙ্গছ তোমরা।

বাঃ, বেচারা যদি ভাঙ্গবার জন্য ঘাড় বাড়িয়ে দেন—আমরা রেহাই দিতে পারি এমন কি সাধ্য! তেমন দিন এলে আপনিই কি রেহাই পাবেন মনে করেন?

স্মরজিৎ কহিল, তেমন দিন আসবার আগে অনেক কিছুই তো ঘটতে পারে। কোন্ ঘাড়ের উপর যে কোন্ মাথা উড়ে এসে জুড়ে বসে তার ঠিকঠিকানা তো নেই।

যান, আপনার খালি ঠাট্টা। মুখ ফিরাইলেও ইহাতে রিণি কৌতুক বোধ করিল। কহিল, মেট্রোয় কি বই আজ হবে?

গন উইথ দি উইণ্ড।

হাঁ, হাঁ, দেখেছি বটে বইখানা। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ব্যাপার। স্কারলেট ও'হারা।

কেমন লাগে?

চমৎকার। আমাদের এখানে এই রকম যুদ্ধ বাধলে—

তুমি স্কারলেট হবে?

হলেই বা ক্ষতি কি! সে তো সৌভাগ্য আমার।

স্কারলেটের দুর্ভাগ্যটা বহন করতে পারবে?

কেন পারব না? কাল যা আসবে—সে চিন্তা কালকের। আজ যা এসেছে তাকে প্রসন্নতা বা দুঃখের সঙ্গে গ্রহণ করতে পেরেছিল বলেই তো স্কারলেটকে অত ভাল লাগে আমার। দেখুন, আজ তা হলে ডিনারটা বাতিল করে দিই—ফোনটা বুঝি ওই কোণে?

রিণি ছুটিতেছিল, স্মরজিৎ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, তোমার প্রোগ্রাম চেঞ্জ করবার দরকার নেই—আমাদের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ করলেই যথেষ্ট।

থ্যাঙ্কস্। বাঁচালেন!

আজ রেবা এলেন না কেন?

জানিনা তো। রাস্কল্‌নিকফের ভূত এমন মাথায় চেপেছিল যে—ট্রামে আসতে আসতে ওর কথাটা একদম ভুলেই গেছি।

অনুর খবর ?

সে তো তার মাসীর বাড়ী গেল। খিদিরপুর না কোথায়।

তোমাকে পৌঁছে দেবার দরকার হবে কি ?

অবশ্য আপনার কষ্ট না হ'লে।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম স্মরজিতের মুখের উপর কিসের কালো ছায়া ভাসিতেছে। রিণিকে সে পৌছাইয়া দিব বলিল বটে, সে প্রতিশ্রুতির মধ্যে তেমন জোর নাই। রেবা না আসাতেই বোধ করি বেচারা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে!

রিণি ও স্মরজিৎ কক্ষত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমি রিপোর্টগুলি লইয়া বসিলাম। একটু ভাবিয়া কলমটি তুলিয়া লইয়াছি—অমনি কয়েক জোড়া জুতার শব্দে চমক ভাঙ্গিল। স্মরজিতের পিছনে রিণি তো আছেই, তার পিছনে রেবা ও আর একজন হ্যাটকোটধারী সুবেশ যুবক। যুবকের হাতে একটা মোটা বর্ম্মা চুরুট হইতে অজস্র ধূম উদ্গীরিত হইতেছে।

স্মরজিৎ বলিল, এই ঘরেই আড্ডা জমানো যাক। অসুবিধে হবে না তো সুপ্রিয়বাবু ?

২

নবাগতের সঙ্গে রিণিই আমায় পরিচিত করিয়া দিল। ইহার পিতা শিলচর না সিলেটের মস্ত বড় তালুকদার এবং ব্যবসাদার। জমিজমার যথেষ্ট আয়, কলিকাতায় বালিগঞ্জ অঞ্চলে একখানি 'কুটীর' নির্ম্মাণ না করিলে নাকি অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া আজকালকার দিনে কঠিন। বৃদ্ধ তালুকদারের অবশ্য কলিকাতার সমাজে খ্যাত হইবার তেমন বাসনা

ছিল না, তবে পুত্রের গৌরবে গৌরব বোধ করাটা তিনি অবাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। বিলাত পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আসিবার অভিপ্রায় মিঃ সিন্‌হার—রণজিৎ সিন্‌হার পূর্ণ না হইলেও—সে আশা সে অদ্যাপি পোষণ করে। কন্টিনেণ্ট না ঘুরিলে—মনের প্রসার বাড়ে না এবং মনুষ্য-পদবাচ্য হওয়ার অনেক বাধা—সে ধ্রুব বিশ্বাস রণজিতের ছিল। কতই বা তার বয়স! বড় জোর চব্বিশ। কন্টিনেণ্ট যাওয়ার মহলাস্বরূপ—কলিকাতায় প্রাসাদোপম 'কুটীর' একখানি নির্ম্মাণ করাইয়াছে। বালিগঞ্জ অঞ্চলে বহু বিলাত-আমেরিকা-জাপান-ফেরৎ অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীর বাস। বিস্তৃত লেক-পরিধিতে তাঁহাদের ফ্যাশনেবল জীবনযাপন প্রণালী ও চালচলনের দ্বারা উপকৃত হইবার আশা রণজিৎ রাখে। রিণিদের সঙ্গে এমনই এক সন্ধিক্ষণে তার আলাপ। বিলাত ফেরৎ ব্যারিষ্টার মিঃ বাসু—রিণির পিতা। নিখুঁত টাই বাঁধা—ইভনিং স্যুট বা ডিনার স্যুটের নিখুঁত ক্যাটালগ মুখস্থ, ক্যাবারেতে ওয়াল্‌জ বা জাজ নৃত্য শিক্ষা, প্রকৃতিতত্ত্ব লইয়া অপরিচিত লেডির সঙ্গে আলাপ জমানো—এইসব বহু পুরাতন পদ্ধতির আজকাল অনেক রদবদল হইলেও—মিঃ বাসু মোটামুটি ওদেশ সম্বন্ধে একজন অথরিটি। কোথায় রসিকতা ভালগারিটির সীমায় না পৌছায়, উগ্র সেণ্ট মাখিলে শ্বেত পুরুষেরা কি ভাবে হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লন, লেডিরা পরিজ ভালবাসেন না শেরির ভক্ত—এসবগুলির শিক্ষাও তিনি দিয়া থাকেন। রণজিতের বিলাতের মোহটা বেশি বলিয়াই—মিঃ বাসুর বাড়িতে তার যাতায়াতটা কিছু ঘন। সেজন্য মিঃ বাসু বরঞ্চ আনন্দিত। বিলাত না যাইলেও যে বিলাত যাইবার বাসনা পোষণ করে, এবং সে বাসনা পূরণের জন্য কাহারও মুখাপেক্ষী নহে—তাহার উপর প্রীতি পোষণ করা স্বাভাবিক। অর্থ বা সমাজনীতির দিক দিয়া বিলাতী মার্কার

মূল্যটা কিছু বেশি। মুখে যতই স্বদেশীয়ানা যে কেহ করুন না কেন—এই ট্রেড মার্ককে অগ্রাহ্য করা কম কথা নহে। সম্প্রতি রণজিতের আর একটু বিখ্যাত হইবার সাধ জাগিয়াছে। একখানি পত্রিকা হাতে থাকিলে—শীঘ্র শীঘ্র বিখ্যাত হওয়ার পথটি নাকি সুপ্রশস্ত হয়। তাই বালিগঞ্জ হইতে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিবার জল্পনা-কল্পনা কয়েক দিন ধরিয়া চলিতেছে। উত্তর কলিকাতাকে এই সঙ্গে না টানিতে পারিলে সাহিত্যের তথা খ্যাতির ক্ষেত্র বিস্তৃত হওয়ার অনেক বাধা বলিয়া স্মরজিৎকে দলে টানিবার চেষ্টায় আছে।

হাতের চুরুটটা টেবিলে রক্ষিত অ্যাশট্রের উপর রাখিয়া রণজিৎ বলিল, তারপর স্মরজিৎবাবু, আপনাদের পাব তো?

স্মরজিৎ বলিল, আমাদের না পেলেও আপনার ক্ষতি হবে না। এই সুপ্রিয়বাবু—ইনি একজন ভাল কবি।

বটে! তবে তো প্রথম সংখ্যার জন্য আপনার লেখা দাবি করতে পারি আমরা।

লজ্জায় ঘাড় নীচু করিয়া বলিলাম, যাঁরা নামজাদা—তাঁদের—

তাঁদের তো ধরবই। এই দেখুন লিষ্ট। রবিবাবু দু'ছত্র আশীর্ব্বাদ পাঠাবেন, বীরবলের একটা গল্পও যোগাড় করেছি। আর দেখুন দিকি লিষ্টটা—বলিয়া একখানি কাগজ প্রসারিত করিয়া দিলেন।

দেখিলাম, নামী লেখকের কেহই প্রায় বাদ পড়েন নাই। বলিলাম. এঁরা সকলেই কি লেখা দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন?

হাঁ—এক রকম তা বৈকি। রীতিমত তাগাদা দিয়ে আদায় করব। তবে—কারো কারো শুনেছি—মর্য্যাদা কিছু বেশি লাগে।

মর্য্যাদা?

হাঁ—দক্ষিণা আর কি! তা মর্য্যাদা দেওয়া আমার পক্ষে তেমন

কঠিন আর কি। ধরুন একখানা কাগজে পড়বে ছ'আনা—ছাপাই—ছবি—ব্লক—বাঁধাই সব শুদ্ধ। অ্যাডভারটিজমেণ্ট যোগাড় যদি কিছু না-ই করতে পারি—তাহলেও লেখকদের মোটা টাকা দিয়ে সাড়ে সাত আনায় কাগজ বিক্রী করতে পারলে লোকসান নেই। ধরুন দশ হাজার কাপি ছাপা হলো। লাভ যে রাখতেই হবে তেমন কথা নেই।

রিণি বলিল, ধরুন, দশ হাজার কাপি যদি না কাটে?

না কাটার কারণ তো দেখি না। বাংলা-সাহিত্যের যাঁরা নামজাদা লেখক সবাই যখন লিখছেন।

নতুন কাগজ তো।

কাগজ নতুন হলেও—আশা করি, মাস ছয়েকের মধ্যেই সকলকে ছাপিয়ে উঠতে পারব। পয়সা ছাড়লে ভাল লেখার অভাব!

স্মরজিৎ বলিল, লেখার কথা আপনারাই ভাল বোঝেন। কিন্তু পয়সা ছাড়লেই কি সব সময়ে ভাল লেখা পাওয়া যায়? ভাল লেখক মাত্রেই কি ফরমাস দেওয়া লেখায় যত্ন নিয়ে লিখে থাকেন?

না লেখেন যদি—সেটা তাঁদেরই অপযশ। বাংলায় পয়সা দেয় না লোকে—তাতেই ভাল লেখা বেরয় না—এই তো অভিযোগ শুনি দিনরাত। পয়সা পেলে কেন তাঁরা ভাল লিখবেন না!

রেবা এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল। ঈষৎ হাসিয়া সে বলিল, যাঁরা পয়সার কথা তুলে নিজেদের ট্রাশ্‌গুলোকে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করেন—তাঁরা পয়সা দিলেও ট্রাশ্‌ প্রসব করবেন। ভাল লেখা কি তখনই পাওয়া যায় না—যখন খ্যাতিটা থাকে মুখ্য?

তা হয় ত যায়।

খ্যাতি রটলেই অর্থের লালসা জাগে। লোভ এসে প্রতিভাকে ঢাকতে থাকে। তখন কোন্‌ কালে কি একখানা মাষ্টারপিস্‌ বেরিয়ে-

ছিল, কোন্ সাহিত্যরথী কি প্রসংসাপত্র দিয়েছিলেন, কারা কারা সে বই পড়ে মূর্চ্ছা গিয়েছিলেন এই সব রটিয়ে প্রতিভাকে প্রমাণ করবার প্রচারকার্য্য স্থরু হয়। বাংলা দেশের মানুষের আয়ু যেমন অল্প—সাহিত্য-সৃষ্টির পরমায়ুও তেমনি অত্যল্প।

এ আপনার বাংলা-সাহিত্যের প্রতি— .

অপ্রীতির কথা হলেও—সত্য কথা। কই দেখান না—এমন কতকগুলি সাহিত্যরথী—যাঁরা সগৌরবে তাঁদের প্রতিভার স্বর্ণরথখানি উদয়াচল থেকে অস্তাচল পর্য্যন্ত সমানে চালিয়ে নিয়ে এলেন ?

কেন, রবীন্দ্রনাথ।

একজন। আরও কটা নাম করুন।

শরৎচন্দ্র।

খানিকটা বটে। উদয়াচল থেকে তিনি ওঠেন নি—অস্তাচলে পৌছানর অনেক বিলম্ব—তবু সে চন্দ্রও যেন ম্লান হয়ে আসছে।

এঁদের নাম থাকলেই কি পত্রিকার পক্ষে যথেষ্ট নয় ?

বলেছি তো—বিজ্‌নেসের দিক দিয়ে কথাটা আমি বলিনি। আমাদের প্রতিভার অপমৃত্যু তো অহরহই দেখছি, অথচ মৃত জ্যোতিষ্কদের নিয়ে কম মাতামাতি আমরা করি না। কেন করি জানেন ? না করে আমাদের উপায়ই বা কি !

আপনি ভারি পেসিমিষ্ট।

রিণি কি বলিস ? অপ্‌টিমিজ্‌ম্ দিয়ে মানুষকে ফতুর করা কি ভাল ?

রিণি বলিল, চেষ্টা করলে—আমিও হয়ত লিখতে পারি—তাই ভাবছিলাম।

কেন পারবি নি। কাগজ যারা বার করতে পারে—লেখাই বা তারা কেন লিখতে পারবে না।

তুমি ঠাট্টা করছ!

মোটেই না। খানিকটা লিটারারি টেষ্ট না থাকলে কাগজ বার-করার কল্পনা কেউ করতে পারেন?

রিণি উচ্ছ্বসিত হইয়া কহিল, সত্যি মিঃ সিন্‌হা—আপনি লিখতে পারেন? বাঃ, এতদিন তো জানান নি আমাদের!

রেবাই সিন্‌হার হইয়া জবাব দিল, এইবার পত্রিকা বার করে জানাবেন।

কি লেখেন আপনি? কবিতা, না গল্প, না প্রবন্ধ?

রণজিৎ হাসিয়া বলিল, রেবা দেবীর কথায় আপনি বিশ্বাস করলেন! ওঁর লেগ পুলিংটা বুঝতে পারলেন না?

রিণি বলিল, রেবা-দি—তোমার সঙ্গে কথাই কইব না আর। সত্যি তুমি—

সকলেই হাসিয়া উঠাতে রিণিও সে হাসিতে যোগ দিল।

রণজিৎ বলিল, রেবা দেবীর কি ধারণা কাগজটার আমরা সুবিধা করতে পারব না?

আপনাদের কাগজের প্রতিষ্ঠা ও দীর্ঘায়ু আমি কামনা করি।

আশা করি—আপনার শুভ কামনা নিরর্থক হবে না। একটা চুরুট ধরাইয়া রণজিৎ বলিল, তা ছাড়া পেপারটা কোন দলীয় হবে না। উদার মতবাদ আমরা পোষণ করব।

রেবা হাসিয়া বলিল, তার কিন্তু একটা বিপদ আছে। সনাতনী হিন্দুরা মনে করবেন এ কাগজটা আমাদের কথা বলছে না, প্রগতি-পন্থীরা ভাববেন, আমাদের নিন্দা করছে। কংগ্রেস আর মুসলিম লীগেও এই সন্দেহ করবে।

রিণি বলিল, যাঁর ইচ্ছে সন্দেহ করুন গে, আমাদের উদ্দেশ্য ঠিক থাকলেই হ'লো।

হাঁ, আদর্শের দিক দিয়ে তার দাম থাকলেও, আর্থিক দিক দিয়ে ক্ষতিজনক। দল না থাকলে বাংলা দেশের কাগজগুলো কোন্ কালে উঠে যেত!

কেন, আপনার কি মনে হয় না—একখানা নিরপেক্ষ কাগজ যদি থাকে—

মনে তো হয়। কিন্তু নিরপেক্ষ মনের চেহারাটা ঠিক কল্পনায় আসে না। রঙ আমরা ছেলেবেলা থেকে ভালবাসি, তাই নিরপেক্ষ রোদও আমাদের পাত্রে যে নানান রঙ ধরে।

এটা কিন্তু উপমাই। টেষ্ট না থাকলে ক্রিয়েট করতে ক্ষতি কি।

না, ক্ষতি এক আর্থিক ছাড়া আর সবেতেই লাভ।

টেবিল চাপড়াইয়া রণজিৎ বলিল, সে ক্ষতি আমি স্বীকার করব বাংলা দেশের জন্য। না হয় দশ-বিশ হাজার যাবে।

রেবা হাসিয়া স্মরজিতের পানে চাহিয়া বলিল, অঙ্কটা শুনে লোভ হচ্ছে স্মরজিৎবাবু।

স্মরজিৎ সে কথায় বিশেব উৎসাহ বোধ না করিয়া নতমুখে পেন্সিল লইয়া খাতার উপর কি আঁক কষিতে লাগিল।

রণজিৎ বলিল, তা ছাড়া রাজনীতিকে আমরা বাদ দেব না।

রিণি বলিল, সিনেমার জন্য একটা ফরমা অন্তত রাখবেন।

নিশ্চয়। খেলা-ধুলার কথাও থাকবে।

রেবা বলিল, কি থাকবে না রণজিৎবাবু?

থাকবে না—গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, মতবাদের সঙ্কীর্ণতা, দলাদলি, গালাগালি।

শেষেরটা শুধু বাদ দেবেন না। শুধু পোলাও-মাংস খেয়ে মুখ মেরে এলে একটু চাটনির ব্যবস্থাও রাখবেন।

কাগজে গালাগালি করব ?

নিশ্চয়। না হলে আর সব গুলির চেয়ে ঠেলে উঁচুতে উঠবেন কি করে ? রঙ্গভরা বঙ্গদেশে—রঙ্গটুকু বাদ দিলে থাকবে রাংতা। তা দিয়ে কি ভোলাতে পারবেন সেয়ানা পাঠকদের।

আচ্ছা, না হয়—পুস্তক বা পত্রিকা-সমালোচনা হিসাবে কিছু দেওয়া যাবে।

ডোজ হোমিওপ্যাথিক হলে হবে না। রবিবারের লাঠি বলে একটা পত্রিকা বেরুতো জানেন কি ? আমরা পত্রিকা কিনেই তার সমালোচনা পৃষ্ঠাটি আগে পড়তুম। কি ভালই যে লাগত !

কিন্তু লঘু কৌতুকব্যঙ্গ ওগুলো মাসিকের পৃষ্ঠায় ঠিক মানায় কি ?

মাসিকের পৃষ্ঠায় না মানালে—পাঠকের মাথায় উঠবে কি করে। রাখবেন ওগুলো।

আচ্ছা, দেখা যাবে। উপস্থিত আর একটি পরামর্শ আছে। আমি না হয় সম্পাদক হলুম। একজন সহঃ-সম্পাদক না হলে—

স্মরজিৎ বলিল, সহঃ-সম্পাদক হিসেবে সুপ্রিয়বাবুকে নিতে পারেন। ওঁর কবিতাও থাকবে, প্রবাসীর মত বিবিধ প্রসঙ্গও লিখবেন।

রণজিৎ বলিল, আমিও ঠিক ওই কথাই ভাবছিলাম। পাছে আপনাদের কোন ক্ষতি হয়—

না, না, সকাল আর বিকেল এই দুটো সময় বাদ দিলে দুপুরে বা সন্ধ্যার পরে ওঁর অবসর যথেষ্ট।

কুণ্ঠিতহাস্যে বলিলাম, কিন্তু আমার যোগ্যতা এ বিষয়ে—

রণজিৎ টেবিল চাপড়াইয়া কহিল, সে আমরা বুঝব। সহঃ-সম্পাদকই তো সব নন, সম্পাদক রইলেন উপরে।

রেবা বলিল, উপরে যাঁরা থাকেন—তাঁরা কি নীচের কিছু দেখবার ফুরসৎ পান? সহ বেচারারাই তো খেটে মরেন অহরহ।

হাসালেন আপনি। সম্পাদক কি শুধু সম্পাদকীয় লিখবার জন্য?

তাই বা লেখেন কোথায় সব সময়ে!

আমি লিখব। ভয় পাবেন না—সুপ্রিয়বাবু। আপনি সন্ধ্যার পর একবার করে বালিগঞ্জে যাবেন। তাও সব দিন যেতে হবে না—সপ্তাহে তিন দিন। আপনাকে পারিশ্রমিক হিসেবে গোটা পঞ্চাশেক টাকা আপাতত দেব—পরে বাড়িয়ে দিলেই হবে। কেমন রাজী তো?

উপরি পাওনা—রাজী না হইয়া উপায় কি। পঞ্চাশটি রৌপ্য মুদ্রার চেয়ে যশের স্বর্ণ মুদ্রাটির উপর আমার লোভ বেশি। খ্যাতনামা সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয়টা তো পরম লাভ।

রিণি বলিল, তাহলে কাগজ প্রতিষ্ঠার দিনে মিঃ সিন্‌হা কিঞ্চিৎ চা-মুখ করান।

শুধু চা কেন, টোষ্ট, কেক, দুএকখানা ফ্রাই—দু এক ডিস ফাউল বা মটন—

থ্রী চিয়ারস ফর—, রিণি একাই চীৎকার করিয়া ঘুরপাক খাইয়া একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল।

এমন সময় ইলা ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, রিণি কি ফক্সট্রট প্র্যাক্‌টিস করছে?

তীরবেগে চেয়ার হইতে উঠিয়া রিণি ইলার কাছে আসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, জানিস, মিঃ সিন্‌হা বালিগঞ্জ থেকে একখানা মাসিক বের করছেন।

সত্যি? ইলার মুখও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কবে বেরুবে? কে কে লিখবেন?

সব নামজাদা লেখক লেখিকারা লিখবেন। রবিবাবু, শরৎবাবু, বীরবল—

ইলা বলিল, কবে বার হবে?

রণজিৎ জবাব দিল, ভাবছি একটা নূতনত্ব করতে হবে। সবাই কাগজ বার করেন মাসের পয়লা, আমরা বার করব - মাঝামাঝি থেকে।

রেবা বলিল, মাঝামাঝি থেকে বেরিয়ে অনেক কাগজকে ত্রিশঙ্কুর অবস্থা পেতে দেখেছি। চিরাচরিত যা প্রথা আছে—তাই ধরুন।

না রেবা দেবী, চিরাচরিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে—এ পত্রিকাখানা। চিরকার যে নিয়ম চলে আসছে—তাকে আঘাত করবার জন্যই আমাদের এই অভিযান।

রেবা বলিল, আঘাত করতে হলে, আঘাত সহ্য করার শক্তিটুকু থাকা ভাল। কিন্তু কি নাম হবে কাগজখানার এ পর্য্যন্ত আপনারা কেউ বলেন নি।

আপনিই এর নাম-করণ করুন না।

রিণি বলিল, আমি বলব! ওর নাম বালিগঞ্জ রাখুন।

ইলা হাসিয়া বলিল, দুর—বালিগঞ্জ বললে তেমন ইমপ্রেসিভ হয় কি?

রিণি বলিল, তবে বিদ্রোহী।

উঁহু, অতটা একস্‌ট্রিমিষ্ট হলে রাজরোষের ভয় আছে। আপনি কি বলেন স্মরজিৎবাবু?

আমি? একটু চমকিত হইয়া স্মরজিৎ বলিল, নামকরণের ভারটা মেয়েদের ’পরেই থাক। ওসব বিষয়ে ওঁরা অদ্বিতীয়।

ইলা বলিল, জয়যাত্রা নামটা কেমন?

রণজিৎ বলিল, মন্দ নয়—তবু যেন কেমন অসম্পূর্ণ বলে বোধ হয়।

রেবা হাসিয়া বলিল, তাহলে নাম রাখুন না—প্রতিবাদ।

ইউরেকা! ইউরেকা! রিণি চীৎকার করিয়া উঠিল। চমৎকার—সিম্পলি গ্রাণ্ড!

স্মরজিৎ বলিল, মন্দ কি! আপনি কি বলেন, সুপ্রিয়বাবু?

ইলা তাড়াতাড়ি বলিল, আমাদের ওপরে যখন ভার দেওয়া আছে, আমরাই তখন ওই নাম কনফার্ম করলুম। আপনাদের কথা শোনা হবে না।

রিণি বলিল, তুমি কবিতা লিখবে তো ইলা?

না, কবিতা আমার আসে না। শুধু আকাশকুসুম চয়ন—শুধু হালকা সুরের ছেলেমানুষি—ওসব আমার হাজার চেষ্টা করলেও আসবে না।

তবে গল্প?

গল্প তুই লিখিস। এক যে ছিল রাজা—বলিয়া হাসিল।

রিণি বলিল, লিখবই তো। গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি নে। আর বড় বড় পত্রিকা গুলোও কি তেমনি! প্রথমে এমন একটি ঝুনো নারকোলের মত প্রবন্ধ বার করবে—দাঁত বসায় কার সাধ্য!

সকলেই হাসিয়া উঠাতে ইলার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। সে কহিল, ঝুনো নারকোলে দাঁত বসাতে হলে দাঁতের জোর থাকা চাই। পেটে কিছু না থাকলে—

না ভাই ইলা, পেটে কিছু পুরে রাখার চেয়ে মাথায় বরঞ্চ রাখলে কাজ দেখবে। হাল্‌কা জিনিস ভালবাসি বলে—মাথাতেই তা থাকে।

রণজিৎ বলিল, তাহলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে—

ইলা বলিল, স্থিরীকৃত হইল যে, নব জাতকের নাম ‘প্রতিবাদ’ রাখা হইবে।

রেবা স্মরজিতের পানে চাহিয়া কহিল, দেখলেন তো—জিৎ পাশার বাজি আমার দিকে। নামকরণের জন্য একটা টাকার তোড়াও পেয়ে যেতে পারি।

পাবেন, পাবেন। তবে শুধু নামকরণের জন্য নয়, প্রতিবাদের জন্য আপনাকেও কলম ধরতে হবে।

রণজিতের পানে চাহিয়া রেবা বলিল, পারবেন তার মূল্য যোগাতে?

আশা করি—আমাকে ততটা অক্ষম ঠাওরাবেন না।

রেবা একদৃষ্টে রণজিতের পানে চাহিয়াছিল। এই উত্তরে চোখে তাহার বিদ্যুদ্দীপ্তি চমকিত হইয়াই—মৃদু হাসিতে তা রূপান্তরিত হইল। কোমল স্বরে কহিল, মনে রাখবেন।

ইলা বলিল, আমি চেষ্টা করব প্রবন্ধ দিতে।

রিণি বলিল, আমি চেষ্টা করব গল্প দিতে। রেবা-দি, তুমি কি দেবে?

রেবা কহিল, আমার কবিতা তুই আবাহনীতে পড়িস নি?

পড়েছি। সুপ্রিয়বাবুও কবিতা লিখবেন। তাহলে কবির সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে—

মিঃ সিন্‌হা কি লিখবেন? ইলা প্রশ্ন করিল।

উনি হবেন সব্যসাচী। একাধারে—গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, স্বরলিপি—

রণজিৎ হাসিয়া বলিল, না না, সে সব সহঃ-সম্পাদক সুপ্রিয়বাবু—লিখবেন।

ইলা চকিতে আমার পানে চাহিয়া ভ্রূ-কুঞ্চিত করিল। এক মিনিট নীরব থাকিয়া বলিল, আপনি ওরকম ঠাট্টা করবেন না, মিঃ সিন্‌হা। একজন নামী লেখককে সহঃ-সম্পাদক না করলে—কাগজ আপনার চলবে না।

কেন?

নামী লেখকরা শুধু পয়সা পেলেই লেখা দেন না। এ কলেজ ম্যাগাজিন নয় যে, ভিক্ষে করে একবার একটা লেখা ছাপালুম। যার তার সম্পাদনায় লেখা দিতে তাঁরা রাজী হবেন কি ?

না হবার কারণ তো দেখি না। মোটা দক্ষিণা দিলে—

মাপ করবেন, খ্যাতনামা কোন লেখককে যদি সম্পাদক না করেন —আমি লেখা দিতে পারব না। লেখা বিচার করবার যোগ্যতা কি যারতার থাকে।

বুদ্ধিমতী রেবা বুঝিল এই শরক্ষেপ কোথায় হইল। একবার সে আমার বিবর্ণ মুখের পানে চাহিল, পরক্ষণে সমবেত সকলের পানে সেই দৃষ্টি বুলাইয়া লইয়া সে কহিল, নামটাই যখন সবাই চায়—তখন ইলার এ যুক্তি মন্দ নয়। কাউকে কিছু টাকা দিলেই—তিনি অনায়াসে রাজী হয়ে যাবেন।

রিণি বলিল, তাই কি হয় ?

হয়। ট্রেডমার্কার দাম এ যুগে বেশি। ইলার আপত্তি তো নামে ?

ইলা বলিল, কিন্তু যোগ্যতা-বিচার ?

রেবা বলিল, সে বিচার কর্ম্মক্ষেত্রেই মেলে। বাইরেটা মানুষের সব নয়। পরে স্মরজিতের পানে চাহিয়া বলিল, মাসে গোটা ত্রিশ করে টাকা দিলে—এমন খ্যাতনামা লেখক পাওয়া যাবে যিনি খুসী হয়েই নাম দেবেন। কেমন স্মরজিৎবাবু—ইকনমিক্‌সের সেই বইখানার কথা মনে পড়ে ?

স্মরজিৎ কহিল, হাঁ। নাম পাওয়া যাবে।

রিণি বলিল, বলবে রেবাদি—ইকনমিক্‌সের বইটার গল্প ?

আর একদিন। উপস্থিত নামকরণের ভোজ উপস্থিত।

সকলেই স-কলরবে ভোজন-টেবিল ঘিরিয়া বসিল। আমিও যোগ

দিলাম। কিন্তু ইলার খোঁচাটা মনের কোথায় যেন খচ্ খচ্ করিয়া বিঁধিতে লাগিল। ইলার ভ্যানিটি আমায় আঘাত করিতেছে—প্রতিঘাত না করিতে পারিয়া উত্তেজিত হইতেছি মনে মনে। চাকরির উপর ঘৃণা হইতেছে এক এক সময়ে—পরক্ষণেই ভাবিতেছি, ওর দম্ভকে মনে গ্রহণ না করিলেই তো সব লেঠা চুকিয়া যায়। মাষ্টারী করিতে আসিয়াছি—মাষ্টারীই আমার ভাল। স্মরজিতেরা কেন সেই বৃত্ত হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিতে চাহে? কিন্তু বৃত্ত হইতে বাহির হইবার সঙ্কোচই বা আমার কোথায়! নির্লজ্জ গৌরবে আমি উহাদের সমান তালে পা ফেলিয়া চলিবার আশা করিতেছি, মনুষ্যত্বের সমসাথীত্ব দাবি করিয়া—দুর্ব্বল কম্যুনিজ্মের স্তম্ভের উপর আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সব-হারাদের জন্য—পৃথিবীর একপ্রান্তে যে স্বর্গ রচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে—সে সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু উপর হইতেই জানি। তেমন মন দিয়া জানিবার অবসর কখনও আসিয়াছে কি? ক্ষণস্থায়ী বেকারত্বের সুযোগে কার্ল মার্কসের ধনসাম্যবাদের কয়েকটি অধ্যায় পড়িয়াছিলাম, কলেজে ডিবেট করিয়াছি লেনিনের বিপ্লববাদের সাফল্য কাহিনী লইয়া; কার্ল মার্কস্ কি বুঝি নাই, লেনিনকেও মন দিয়া বুঝিতে চাহি নাই। অন্য দেশের কর্ম্মীরা বা তাঁদের কর্ম্মপন্থা আমাদের আদর্শকে উজ্জ্বল করিতে পারে, কিন্তু তার ক্ষণস্থায়িত্ব দূর করিবার সামর্থ্য তাঁদের কোথায়? প্রদীপ আমাদের বাহিরেই জ্বলে—ঝড় জলের সন্ধ্যায় বড় জোর আঁচলে ঢাকিয়া সেই নিবু-নিবু দীপ শিখাটিকে তুলসীমঞ্চ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাওয়া চলে—তারপর তুলসী তলায় প্রণাম সারিতে গিয়া প্রদীপ বাঁচাইবার কথা আর মনেই থাকে না, বায়ুর ফুৎকারে সে প্রদীপ নিবিয়া যায়। ভিতরে প্রদীপ জ্বালাইবার ব্যবস্থা তো কোথাও দেখি নাই—অন্তত আমি দেখি নাই। কতকগুলি

আদর্শবাদের বুলি মুখস্থ করিয়া—ফাঁকা কর্ম্মপন্থার অনুসরণ করিলেই কি মার্কস্‌বাদকে আমরা আমাদের করিয়া লইতে পারিব? বাহিরের প্রদীপ ভিতরে জ্বলিবে কি?

দূর ছাই, ইলার ক্ষুদ্র আঘাত আমায় ভারতবর্ষ হইতে উড়াইয়া একেবারে রাশিয়ায় আনিয়া ফেলিল যে! যাহার ধন আছে, তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি মিলিবে কেন? সব গোত্রের সঙ্গে তো সব গোত্রের মিল হয় না। নিষ্ফল ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন ফল নাই। কার্য্যক্ষেত্রে ইলার এই জবাবের প্রত্যুত্তর দিতে হইবে।

হাঁ—মার্কসবাদ আমি বুঝি না, ধনের লালসা না থাকুক, মাটি বলিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবার মত সাধু-মনোবল আমার নাই।

শহরের মাটিতে পা দিয়া দু'টী বিপরীত স্রোতোধারায় আমার জীবনকে ঊর্ম্মিমুখর করিয়া তুলিতেছে। পল্লীকে ভুলিতে পারি নাই—শহরকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছি।

নূতন ভালবাসার স্বাদ তীব্র ও টান প্রবল বলিয়া আমরা নূতন ভালবাসার জয়গানই করিব। আমরা তরুণ।

৩

শহরের পুরাতন অংশ হইতে নূতন অংশে আসিয়া নূতন অভিজ্ঞতা লাভ হইল। শুধু শ্যামবাজার দেখিয়া শহরকে চিনিয়া—ভালবাসিতে পারিতাম কি? সে অংশে বিস্তার নাই, বিভাগ আছে; পুরাতন বাড়ির উপর নূতন চুনকাম সুরু হইয়াছে। এই অংশে নূতন বাড়ির নূতন ভিৎ উঠিতেছে। সেই অংশের বাড়িগুলির বিরাটত্ব বা বিশালত্ব মর্য্যাদাকে

আকৃষ্ট করিবার জন্য পরিকল্পিত হইয়াছিল, এই অংশে রুচির প্রতিযোগিতায় মোগল, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভাস্কর্য্যশিল্পের উদ্বোধন হইতেছে। পুরাতন অংশে বৈদেশিক প্লাবনের চিহ্নটি সুপরিস্ফুট—ক্রমবর্দ্ধমান ধনাগমের ধারাটিও বাড়িগুলির সমগ্রতায় পাওয়া যায়। সংযোজন ও সংশোধনে শিল্পরূপের বিকাশ ঘটে নাই ও-অঞ্চলে। কিন্তু নূতন অঞ্চলে প্রাচীন সংস্কৃতির একটা মিশ্র রীতিকে পাওয়া যায়। তা ছাড়া বংশের উত্থান-পতনের সঙ্গে এখানকার ভবনগুলি এখনও সুপরিচিত নহে, কাজেই সমগ্রতার মধ্যে—প্রাচীন বা আধুনিক যে রূপই হউক—সেটি স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ। বাড়িকে সম্মান দিয়া রাজপথ এখানে অষ্টাবক্রাকৃতি ধারণ করে নাই; রাজপথের জন্মের অনেক পরে বাড়ি জন্মগ্রহণ করিয়াছে—কাজেই বাড়ির মর্জ্জির উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হয় নাই। বস্তির বালাই নাই—সেগুলিকে যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া কর্ত্তারা জমির প্ল্যান তৈয়ারী করিয়াছেন। চারিদিকে ফাঁকা—একটা স্বচ্ছন্দ ভাব। এই অংশে আকাশের সঙ্গে বাড়ির মিতালী কিছু আছে, তবে প্রাসাদ ও পীচের অরণ্যে প্রকৃতির সবুজ শোভা কিছুটা ম্লান হইয়াছে। রাস্তার সুসজ্জিত গাছগুলিকে ঠিক সব সময়েই মাপা দৃষ্টিতে দেখিতে হয়। পরিমিত দৃষ্টির দোষ এই যে মগ্ন হইয়া যাইবার মত আবেগ তার নাই। সে বাহিরের সুন্দরকে ভিতরে টানিয়া লইয়া ধ্যান-লোকের মধ্যে আনন্দ-সমৃদ্ধ হইতে পারে না। তবু—কোন কোন পূর্ণিমার রাত্রিতে—চাঁদ উপরে খানিকটা মায়াজাল বিস্তার করে, গাছের সবুজ পাতায় সেই জ্যোৎস্না মূর্চ্ছিতের মত পড়িয়া থাকে। পথের বিদ্যুৎ-আলোয় গাছের পাতা চিক্ চিক্ করে বলিয়া জ্যোৎস্নার মায়া-সৌন্দর্য্যে সে অভিষিক্ত হইতে পারে না। তথাপি, কবিতা লেখার পক্ষে পুরাতন শহরের চেয়ে এখানকার প্রতিবেশটি অনুকূল।

আমার আপিসের—অর্থাৎ প্রতিবাদ পত্রিকার দ্বিতলের ঘরখানি বড়। লেকের দিকে মুখ ফেরানো বলিয়া সম্মুখের অনেকখানি ফাঁকা জমি মনকে প্রসারিত করিয়া দেয়। ডানা মেলিয়া আকাশে উড়িতে যাওয়ার বাসনাও জাগে। তবু, দেশে যে অনাবৃত ও বিস্তৃত মাঠ পড়িয়া থাকে—সে যেমন সহজে মনকে টানিয়া লয়—অন্ধকারে ও আলোয় সে যেমন রহস্যগভীর ও রসনিবিড় হইয়া উঠে, এই মাঠে—সে রহস্য—সে রস তেমন অনায়াসে উচ্ছলিত হইয়া উঠে না। তীব্র কণ্টকাগ্রভাগের মত শত শত আলোক-স্তম্ভ—এই মাঠের বুকে জন্মিয়া প্রথম প্রসন্ন দৃষ্টি-পাতকে বিঘ্নিত করিয়া তুলে। অসংখ্য পতঙ্গের মত যানবাহনের গতি—প্রথমটা মৌনতাকে আঘাত করে এবং কোলাহলে কর্ণও পীড়া অনুভব করে। কিন্তু তারপর, দৃষ্টি, মন ও শ্রবণ একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে—গতির ক্ষিপ্র মাধুর্য্যে ওগুলিও মাতিয়া উঠিতে বিলম্ব করে না। মনের মধ্যে কবিতার তাল ও বাহিরের যানবাহনের তাল—একটি অপূর্ব্ব সুরের সৃষ্টি করে, স্রষ্টার আত্ম-উদ্‌ঘাটন দ্রুত চলিতে থাকে।

কাগজখানা নূতন বাহির হইয়াছে আজ। এইমাত্র দপ্তরী আমার টেবিলে নমুনা-কপি দিয়া গেল। পরম স্নেহভরে সেখানা তুলিয়া লইলাম। এত ভাল লাগিল! কেমন একটা গন্ধ—কেমন নূতন শ্রী—কত অজানা লেখক আজ আত্মীয়ের মত কাগজের মধ্যে বসিয়া আমার পানে প্রসন্ন দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কাগজ তো নয়- এযে আমারই সৃষ্টি। কভার হইতে বিজ্ঞাপন-পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—সমস্তটাই যেন আমার উপর ভালোবাসার দাবি জানাইতেছে—আমিও কৃতজ্ঞ-বিহ্বল চোখে সেদিকে চাহিয়া—সন্তর্পণে পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছি। পরম স্নেহে—মা যেমন ঘুমন্ত ছেলের গায়ে হাত বুলাইয়া দেন। অপরাহ্নে

শহরের রাজপথে বাহির হইলে এই কাগজ কি জনসমুদ্রকে উদ্বেল করিয়া তুলিবে না? একটা বিস্ময়—একটা চাপা প্রশংসার গুঞ্জন শহরের বাতাসে ভাসিয়া পৌরবাসীদের পরদা-ঢাকা বাতায়নের ওপারে একটু দোলা দিবে না? কোন আধুনিকা কি প্রসাধন-চর্য্যা ছাড়িয়া ক্ষণেকের জন্য এখানাকে হাতে তুলিয়া আমারই মত মুগ্ধদৃষ্টি ও কল্যাণস্পর্শ দিয়া ইহার দীর্ঘ পরমায়ু কামনা করিবে না? এ যে একান্ত করিয়া তাহাদেরই বাণী বহন করিতেছে—তাহাদেরই সংস্কৃতিকে সুসংস্কৃত করিবার কাজে—রুচিকে মনোজ্ঞ করিবার ব্রতে আত্মনিবেদন করিয়াছে। সে মর্ম্মকথা কি তাহারা বুঝিতে ভুল করিবে? বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে—এ যে প্রদীপ্ত ভাস্কর। এর তাপ ও আলো. প্রাণদ শক্তি ও সৌন্দর্য্য, তপস্যা ও নির্দ্দেশ সবই তো অনাগত শতাব্দীর প্রশস্তির বাহন। একখানিও ছবি নাই—কেননা, লেখাকে খাটো করিয়া ছবি দিবার প্রয়োজনীয়তা আমরা বোধ করি নাই এ কথা সত্য নহে,—কারণ তেমন ভাল আর্টিষ্ট আমরা পাই নাই। আগামী সংখ্যার জন্য সে আয়োজন অবশ্য আছে। তবু—এমন সুন্দর কাগজ—এমন সুন্দর ছাপা! কত নামজাদা লেখকের সঙ্গে আমিও ভোজ্য পরিবেশনের ভার লইয়াছি! কি গৌরবময় জীবন! আমার লেখাটা অনেকবার পড়িলাম। মনে হইল, এমন সোজা করিয়া এমন ভাবে বলিবার চেষ্টা আর কেহ করেন নাই। এ যেন এক নূতন যুগের সূচনা।

তন্ময় হইয়া আবার পড়িতেছি—একসঙ্গে অনেকগুলি পদশব্দ সিঁড়িতে বাজিয়া উঠিল। অনেকে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন।

রিণি লাফাইতে লাফাইতে টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া কাগজ-খানা টানিয়া লইয়া বলিল, বাঃ, চমৎকার তো! দেখুন না রণজিতবাবু?

রীতিমত কাড়াকাড়ি লাগিয়া গেল।

স্মরজিৎ বলিল, আমার প্রবন্ধটা যেন ছোট-ছোট দেখাচ্ছে। কাঁচি চালিয়েছেন নাকি, সুপ্রিয়বাবু?

না, তেমন কিছু নয়। শেষের একটা লাইন শুধু তুলে দিয়েছি। তা সে তো আপনার অনুমতি নিয়েই—

নিশ্চয় আপনি তা পারেন। সহঃ-সম্পাদকের ডিউটি তো শুধু প্রুফ সংশোধন করা নয়।

আমার লেখা নিশ্চয় বাদ দেন নি? রণজিৎ গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করিল।

আপনার প্রুফ তো আপনিই দেখেছেন।

দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট। একটা মোটা চুরুট দাঁতে চাপিয়া অগ্নি সংযোগ করিতে করিতে রণজিৎ বলিল, আমি যা লিখি—অর্থাৎ ওজন করে কথা বসাই কিনা—অন্যকে কলম চালাবার অবসর দিই না।

যদিও রণজিতের মাসিক পত্রিকায় এই প্রথম লেখা। আমি একটু হাসিলাম শুধু।

রিণি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, বাঃ অনেক লিখেছেন তো! আপনি ইতিহাসের চর্চাও করেন?

রণজিৎ ধোঁয়ায় কক্ষ ভরাইয়া দিয়া কহিল, ইতিহাস হলো—সাহিত্যের সম্পূরক কিনা complement. যে জাতির ইতিহাস নেই—তার সাহিত্যের আবার মূল্য কি!

রেবা কাগজ লইয়া নাড়া চাড়া বিশেষ করে নাই—জানালার ধারে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়াছিল। এই কথায় মুখ ফিরাইয়া হাসিমুখে বলিল, আমাদের ইতিহাস তো কোন কালেই সম্পূর্ণ নয়, তবে সাহিত্যে এমন বেগ এলো কোথা থেকে?

রণজিৎ মাথা নাড়িয়া বলিল, এই সাহিত্যের ভিৎপত্তন তো দেড়শ দুশো বছরের কথা। হিন্দু রাজত্বে আর ইতিহাস কোথায় ছিল বল!

ছিল বৈকি। স্মরজিৎ সহসা উত্তর দিল।

কৈ—আমরা তো শুনিনি বা পড়িনি।

আমরাও পড়িনি, কিন্তু জানি—দেখেওছি। বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ—মহাভারত—

ওর নাম ইতিহাস! রণজিৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ইতিহাসই তো। আধ্যাত্মিক সাধনায় ভারতবর্ষ যখন শীর্ষস্থানীয় তখন তার কাছ থেকে কি চেহারার ইতিহাস তোমরা আশা কর? যুদ্ধবিগ্রহ, সনতারিখ, বংশ-জাতির উত্থান পতন এই সব?

ওগুলো কি ইতিহাসের আসল বস্তু নয়?

আর একদিন তর্ক করেছিলাম—রেবা জানেন, রিণিও উপস্থিত ছিলেন, অনু ছিলেন। তোমাদের মনে আছে সেদিন কি বলেছিলাম?

রিণি মাথা নাড়িয়া বলিল, কৈ না ত?

অনু?

আছে মনে। আপনি সন তারিখের ওপর জোর দিয়েছিলেন, রেবা-দি বলেছিলেন, ও গুলোই আসল নয়।

রণজিৎ রেবার পানে ফিরিয়া সবিস্ময়ে বলিল, আপনি বলেছিলেন এই কথা?

রেবা ঘাড় নাড়িতেই রিণি বলিল, সেদিন কে কি বলেছিলেন আমার অত মনে নেই—কিন্তু আজ তো স্মরজিৎ বাবু বলছেন।

তা বলছেন—কিন্তু উনি সেদিনের কথার প্রতিধ্বনি মাত্র করছেন। মৃদু কণ্ঠে অনু উত্তর দিল।

রণজিৎ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল, তাই বলুন। চমৎকার কথাগুলি। কিন্তু ধর্ম্মটাকে রাজনীতির সঙ্গে মিশিয়ে তাঁরা কি ভুল করেন নি?

সে তো অনেক যুগ হয়ে গেল রণজিৎবাবু, সেদিনের ভুল আজ আমরা ধরতে পারব কেন?

কেন পারব না, মিস সেন? মানুষ কি দিন দিন মনীষাসম্পন্ন হচ্ছে না?

কেমন করে বলি। সেই কয়েক শতাব্দীর আগেকার কথা বলবার লোক কোথায়? তাঁদের পৃথিবী কেমন ছিল, সে পৃথিবীতে জ্ঞানের সীমা কতদূর—বিদ্যার পরিধি কতটুকু—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা কতখানি আমরা কি পরিমাণ করতে পারি?

পারি বৈকি। পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘুরছে বলে—সে যুগে যাঁরা লাঞ্ছিত হয়েছিলেন—তাঁদের বুদ্ধিটা কতক হৃদয়দম করা যায় বৈকি।

যায় না। যে যুগ আসছে—সে-ও তো এমনি বুদ্ধিহীন বলে আমাদের উপহাস করবে। ক্রমবিবর্ত্তন দেখে বুদ্ধির পরিমাপ করা যায় না। বিজ্ঞানের এক একটা নূতন তথ্য—আমূল মতামতকে বদলে দিচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি বিশ্বাস করেন যে, চন্দ্র একদিন বিপজ্জনক স্থানে এসে উপস্থিত হবে ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে অনেক চন্দ্রের সৃষ্টি করবে? আমরা সর্ব্বদাই চন্দ্রালোক পাব।

রণজিৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

রেবা বলিল, আপনি কি বিশ্বাস করেন, এই পৃথিবী ধ্বংস হবে, শুক্রগ্রহের অধিবাসীরা দেখবে পৃথিবীর মৃত্যু?

রণজিৎ সপ্রশংস দৃষ্টিতে রেবার পানে চাহিয়া বলিল, তাই বুঝি কবিতার মধ্যে বিজ্ঞানের তথ্য ভরেছেন এত করে?

আমি বিজ্ঞানের ছাত্রী অবশ্য। কিন্তু সে জন্য নয়। সত্য চিরকালই কল্পিত বস্তুর চেয়ে বিস্ময়কর—একথা জেনেও আমরা জানতে চাইনা।

কিন্তু আমি বলেছিলাম বুদ্ধির কথা—

ওই হলো। যখন অসম্ভব সম্ভব হয় তখনই বুদ্ধির তারিফ—তার আগে উপহাস। অবশ্য সার জেম্‌স জীন্‌সের মতে অনেকগুলো চন্দ্র সৃষ্টি বা হ্যালডেনের মতে পৃথিবী ধ্বংসের কল্পনা করতেও আমরা ভয় পাই!

রিণি বলিল, তোমরা কথায় কথায় এমন তর্ক এনে ফেল রেব-দি যে হাওয়া যেন বন্ধ হ'য়ে যায়। বিজ্ঞান থাকুক—এস সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করি। বাঃরে, মিঃ সিন্‌হা যে কবিতাও লিখেছেন একটা!

রেবা বলিল, ওঁর সব্যসাচী উপাধিটি কি মিথ্যেই?

অনু কাগজখানা টানিয়া লইয়া বলিল, দেখি কবিতাটা?

রিণি বলিল, হাঁ, তুমি তো কবিতা দেখবার নাম করে তোমার গল্প পড়ছিলে।

অনুর মুখচোখ রাঙা হইয়া উঠিল। কহিল, হাঁ, পড়ছিলুম!

রিণি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, ধরা পড়ে গেছ, অনুদি।

রেবা অনুকে লজ্জা হইতে বাঁচাইবার জন্য বলিল, দেখি, মিঃ সিন্‌হা কেমন কবিতা লিখেছেন।

এইবার রণজিতের মুখে রক্তরেখা ফুটিল। নতমুখে চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে কহিল, তেমন হয় নি। তাড়াতাড়িতে—জায়গা পূরণ হিসেবে—

রেবা হাসিয়া বলিল, কবিতার ওর চেয়ে ভাল সম্মান আপনি আশা করতে পারেন নাকি?

না, আমি অবশ্য—মন দিয়ে লিখলে—

ওই জায়গা পূরণের কাজই সারা হোত সেই ক'ছত্র দিয়ে। লাভের মধ্যে ভাল কবিতাটা আপনার মাঠে মারা যেত! দেখি রিণি?

রিণি বলিল, কিন্তু চমৎকার হয়েছে!

তাই নাকি? দেখি—দেখি।

অতঃপর পাঠ আরম্ভ হইল। খানিক পরে লজ্জা আর কাহাকেও লজ্জা দিতে পারিল না অবশ্য। অমন যে নতমুখী অনু—গল্পপাঠকালে তার মুখখানিও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রণজিৎ বলিল, কাগজখানা ভালই হয়েছে—। কনট্রিবিউটার্সদের ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র দিতে হবে।

রেবা বলিল, উপস্থিত যে সব কনট্রিবিউটার্স রয়েছেন—তাঁদের ব্যবস্থাটা আগে হোক।

নিশ্চয়—নিশ্চয়।

দপ্তরী আসিয়া সংবাদ দিল—শ দুই কাপি বাঁধাই হইয়াছে—বাজারে ছাড়া হইবে কিনা।

রণজিৎ বলিল, নিশ্চয়—আজ বিকেলে শহরময় একটা হৈ চৈ দেখতে চাই আমরা। কপিগুলো একবার চেক করে দিতে বলবে—প্রিণ্টারকে।

রিণি তাড়াতাড়ি বলিল, না, না, তার চেয়ে বরঞ্চ এইখানে পাঠিয়ে দাও—আমরা সবাই মিলে চেক করবো। আঃ নতুন বইগুলো ঘাঁটতে এমন আরাম লাগবে!

পত্রিকার স্তূপ আসিলে রিণি সুভোজ্যের উপর লুব্ধা বালিকার মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কহিল, নতুন কাগজের কেমন আশ্চর্য্য গন্ধ! যেন লেখকদের লেখার গন্ধ পাচ্ছি!

রেবা বলিল, কথাটা তো ভাল নয়, রিণি। হাঁউ-মাঁউ-খাঁউয়ের দলে ঢুকলে নাকি?

সকলে হাসিয়া উঠাতে রিণি রাগ করিয়া একগোছা পত্রিকা রেবার দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল, তোমার শাস্তি স্বরূপ এইগুলো তোমায় চেক করতে দেওয়া হ'লো।

রেবা হাসিমুখে বলিল, এ অবশ্য গুরু পাপে লঘু শাস্তি! তা যাই হোক—আমরা একটা দরকারী কাজ সেরে আসছি। মিনিট পনেরো। আসুন রণজিৎবাবু, আমার কবিতার মূল্য আদায় করে তবে অন্য কাজে হাত দেব।

বলিয়া রণজিতের বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

রিণির চক্ষুর দৃষ্টি অত্যন্ত করুণ হইয়া উঠিল। কহিল, আগে এগুলো ছেড়ে দিলে ঘণ্টাখানেক আগে কাগজ বেরিয়ে যেত।

রেবা সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া রণজিৎকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

রিণি পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিল বটে, মন তাহার অন্যত্র পড়িয়া আছে—সেটুকু সকলেই বুঝিতে পারিলাম।

অণু মৌনভঙ্গ করিয়া কহিল, তুই কেন—এবার কিছু লিখিসনি, রিণি?

আমি! দূর—আমি নাকি লিখতে পারি! হাসিটি রিণির করুণতর বোধ হইল।

তোর তো বোধশক্তি আছে—কল্পনা আছে—

ছাই আছে। কোন কাজে আমার মন একদণ্ড লাগে নাকি! আমার কাগজগুলো তুই দেখে দেনা, অণু। বলিয়া অণুর সামনে সেগুলি ঠেলিয়া দিল।

অণু হাসিয়া বলিল, হঠাৎ কাজে বৈরাগ্য কেন রে?

এমনিই। বলিয়া ধীরে ধীরে জানালার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।

এদিকে স্মরজিতের মুখের রেখাগুলিও কুঞ্চনক্রিয়া সুরু করিয়াছে। অবশ্য স্মরজিতের এ ভাবটা আজ নূতন দেখিতেছি না—পত্রিকা প্রকাশের আলোচনা যেদিন হয়—সেইদিন হইতেই উহার বিমনাভাব। জানিনা, রেবাকে লইয়া উহার এই অন্তর্দ্বন্দ্ব কিনা। যে জিনিস স্থির

নিশ্চিত—তাহাকে লইয়া মানুষের কেন যে উদ্বেগ হয়! স্মরজিতের অভাব তো কিছুরই নাই—রেবাকে সঙ্গিনীহিসাবে গ্রহণ করিতে কিসেরই বা বাধা তার! তবু—আমার মনে হইয়াছে, রেবাকে গ্রহণ করিবার বাধা বুঝি রেবা নিজেই। বাহিরের সমাজ রেবার কাছে বাহুল্য মাত্র। ইচ্ছামাত্র সে বাঁধন যে কোন মুহূর্ত্তে উহারা ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে। ভালবাসা যদি পরস্পরকে কাছে টানিতে থাকে—সে আকর্ষণের মর্য্যাদাদেওয়াও উহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজ, তবু সুদূরবর্ত্তিনী রেবাকে আকর্ষণ করা বুঝি স্মরজিতের ভালবাসায় কুলাইয়া উঠে নাই। রেবা এমন এক দুর্নিরীক্ষ্য নক্ষত্র—যার চারিপাশে মণ্ডলীরচনা করিয়া আবর্ত্তিত হওয়াতেই সুখ। যে আকর্ষণ করে—আকর্ষিত হয় না। কেন্দ্রাভিগতায় অন্য গ্রহ তার কাছে আসিবে—সে কিন্তু সমান দূর-বর্ত্তিতায় বিরাজ করিবে। আজ সে গ্রহের কাছে আর একটি প্রবল গ্রহ আসিয়াছে—তাই কি স্মরজিৎ ম্লান হইয়া গেল!

স্তব্ধতা ভঙ্গ করিলাম আমিই। তাহ'লে স্মরজিৎবাবু, এগুলো পাঠিয়ে দিই ?

দিন।

আপনি এখন এখানে থাকবেন কি ?

একটু থাকতে হবে—রেবা যে বললেন পনেরো মিনিটের মধ্যে ফিরে আসবেন।

আমি তাহলে—

ওঃ, সন্ধ্যার আগে আপনাকে শ্যামবাজার পৌঁছতে হবে। আচ্ছা আসুন। নমস্কারের ভঙ্গিতে সে হাত তুলিল।

নাটিকার শেষ অঙ্কের জন্য একটু উৎসুক ছিলাম, ইহার পর আর ঔৎসুক্য বজায় রাখার সুবিধা হয় না।

মেয়েদের নমস্কার করিয়া কহিলাম, আসি আজ।

অণু হাত তুলিয়া প্রত্যভিবাদন করিল। রিণি সহসা জানালা হইতে ছুটিয়া আসিয়া সিঁড়ির মধ্যখানে আমাকে ধরিয়া কহিল, একটা কথা বলব, সুপ্রিয়বাবু?

বিস্মিত কণ্ঠে বলিলাম, কি বলুন।

কাউকে বলবেন না বলুন?

বলব না।

স্বর নামাইয়া কহিল, আমায় কবিতা লেখা শিখিয়ে দেবেন?

আশ্চর্য্য হওয়ার কথা বটে। কিন্তু চপলা রিণির কণ্ঠে পরিহাস-তরল সে সুর নাই, জিজ্ঞাসার মধ্য দিয়া একটু আকুতি বুঝি কণ্ঠ ঠেলিয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য্য রিণির এই নবরূপ!

সত্যি দিন না শিখিয়ে। কণ্ঠে সকরুণ মিনতি।

কহিলাম, কবিতা লেখা ঠিক শিখিয়ে দেওয়া যায় না। একটু ন্যাক্ না থাকলে—

রিণি অসহায়ার মত হতাশ কণ্ঠে কহিল, তবে কি আমার দ্বারা হবে না?

কেন হবে না? সাধনা করলে সবই সম্ভব।

রিণির মুখচোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল, তাই বলুন। খানিক পরে কহিল, আজই একটা পার্কার পেন কিনব—সব চেয়ে ভাল প্যাড কিনব দু'খানা, তা ছাড়া বাড়িটায় আমাদের খুব গোলমাল নেই।

আশ্বাস দিয়া বলিলাম, এতো চমৎকার যোগাযোগ।

পুনরায় তার কণ্ঠে সংশয়ের সুর বাজিয়া উঠিল, কিন্তু মন যদি না লাগে?

কেন?

আমি যে মন বসাতে পারি নে কোন কিছুতে। কেমন অস্বস্তি বোধ হয়।

চেষ্টা করুন না।

ঈষৎ আশান্বিত হইয়া সে কহিল, চেষ্টা করি, কি বলেন? রবার্ট ব্রুস যদি সাত বারের বার সাফল্যলাভ করতে পারেন—আমি কেন কবিতা লিখতে পারব না!

নিশ্চয়ই পারবেন।

আনন্দে রিণি সিঁড়ির উপরেই একপাক ঘুরিয়া লইল।

আমি অবতরণ করিতে লাগিলাম।

রিণি উপর হইতে কহিল, কাল সন্ধ্যে বেলায় ওখানে যাব, না দুপুরে ওখানে আসব?

মুখ ফিরাইয়া উত্তর দিলাম, যা আপনার সুবিধা।

পথে আসিয়া ভাবিলাম, এই বিলাসিনীর খেয়ালের আর অন্ত নাই। কবিতা লেখা যেন এমনই একটা সহজ কাজ যাহা লিখিবার অপেক্ষা মাত্র! ভাল কালিকলম, ভাল কাগজ আর নির্জ্জন অবসর। অদ্ভুত মেয়ে!

ট্রামের বেঞ্চে বসিয়া বোধ হয় উহাদের কথাই ভাবিতেছিলাম। একজন সহযাত্রী কহিল, কাগজখানা একবার দেবেন কাইণ্ডলি?

সাগ্রহে তাহার হাতে কাগজখানা তুলিয়া দিলাম। পাশে আর একজন ছোকরা বসিয়াছিল—সেও কাগজখানার উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। দুইজনেই তরুণ; চোখে পাঁশনে, চুল ব্যাকব্রাশ করা, কোলম্যান প্যাটার্নের সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা, ভ্যালেনটিনো প্যাটার্নের ঘন জুলপি, সার্টের কলার গলা পর্য্যন্ত উঠানো—গলার একটি বোতাম খোলা, বুক পকেটে ফাউণ্টেন পেন। উহারা যে আধুনিক সাহিত্যের ভক্ত—সে পরিচয় তো সর্ব্বাঙ্গে

সুলিখিত। আড়চোখে ছেলে দু'টির পানে চাহিলাম। দেখি এই অল্প সময়ের মধ্যে কোন্ সৌভাগ্যবান লেখকের লেখাটিকে উহারা শেষ করিবার চেষ্টা করে। চোখে চশমা আর বুকে ফাউণ্টেন পেন গোঁজা থাকিলেই অল্প বয়সের মানুষ যে সাহিত্য-রসিক হইবে—এ আশা বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী নিশ্চয় করিতে পারে।

উহারা কিন্তু পাতা উল্টাইতেই লাগিল। চোখের পরদায় রঙ তো ঘন হইয়া উঠিল না, আগ্রহে মুখের কোথাও ভাবতরঙ্গ খেলিল না। সাদা পাতা উল্টাইয়া গেলেও সেই পত্রের মসৃণতায় কিছু সপ্রশংস অভিব্যক্তি উহাদের মুখে ফুটিত হয়ত, কিন্তু অনায়াসে লেখার অরণ্য পার হইয়া উহারা সমাপ্তির পানে আঙুল চালাইয়াছে। এইবার আমার লেখা কবিতাটি আসিয়া পড়িবে। আসিবে—এবং অনভ্যর্থিত ভাবেই উহাদের শ্লথ অনাদৃত আঙুলের ডগায় ঠেকিয়া চলিয়া যাইবে। তবু সেই কবিতাটি আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে আমার বুকের স্পন্দন দ্রুত হইয়া উঠিল। বেঞ্চের আমি যে পত্রিকার মধ্যেও একটুখানি আসন করিয়া লইয়াছি, ঈষৎ মনোযোগ করিলেই উহারা বুঝি বা ধরিতে পারিবে। হয়ত আমার পানে বিস্মিত ও সৌভাগ্যসূচক দৃষ্টি মেলিয়া বলিবে, আপনি! কি ভাগ্য আমাদের! হয়ত—বুকই স্পন্দিত হইতে লাগিল—ছোকরারা সিনেমা-সংবাদে আসিয়া একটু বিশ্রাম লইতেছে বুঝি?

উত্তরায় কি আছেরে? শ্রীতে? ছবিটা সম্বন্ধে কি লিখেছে?

কিন্তু ততটুকু পড়িবার ধৈর্য্যও তাহাদের ছিল না—তাড়াতাড়ি কাগজ খানা আমাকে ফিরাইয়া দিয়া পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল, দূর, বাজে কাগজ, একখানাও ছবি নেই!

চেহারাটা দেখেছিস—যেন বাজার দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে গেছে। উভয়েই উচ্চহাস্য করিতে করিতে নামিয়া গেল।

নিষ্ফল আক্রোশে বেঞ্চের এককোণে বসিয়া রহিলাম। এ দেশে আর যাহাতেই লাভ হউক—সাহিত্যের চাষ-আবাদে লোকসানটা ধ্রুব।

৪

বাড়ি ঢুকিতেই ত্রিতলের ঘরে ইলার সঙ্গে দেখা। আমিই সঙ্কুচিত হইয়া গেলাম। ইলা যে আমার সঙ্গ পছন্দ করে না—সে কথাটি ভাল করিয়াই জানি। উহাকে দেখিলেই প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটি একটু গভীর ভাবেই রেখাপাত করে মনে, মন সঙ্কুচিত হইয়া আসে। বেশ করিয়া লক্ষ্য করিয়াছি—এমন ভাব আমার সম্বন্ধে ও দেখায় যেন ঘরদুয়ার বা আসবাবপত্রের চেয়েও আমি তুচ্ছ জিনিস! দোয়াতদানের কলমটিকে সযত্নে স্পর্শ করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকা চলে, দেয়ালের বহুবার-দেখা ছবির অঙ্কন-নৈপুণ্যেরও প্রশংসা করা যায়, এমন কি সেটির উপর বসিয়া চেয়ারের পালিশ লইয়াও আলোচনা চলিতে পারে—আমি শুধু সর্ব্ব আলোচনা বা নিমেষ দৃষ্টিপাতের বাহিরের বস্তু। মাহিনা দিয়া যাহার মূল্য নিরূপিত হইয়াছে—তাহার সমস্ত পরিচয়ের এইখানেই যেন শেষ হইয়াছে। তবু তাহাকে চমক দিবার অভিপ্রায়ে কাগজখানা একটু শব্দ করিয়াই টেবিলের উপর রাখিলাম।

ইলা নিতান্ত অনিচ্ছায় চোখ ফিরাইয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে কহিল, আপনাদের কাগজ বুঝি?

হাঁ—আজ বেরিয়েছে।

খুব বিক্রী হচ্ছে?

এইমাত্র তো বেরুচ্ছে।

ওঃ! ঠোঁট চাপিয়া এমন একটা ভঙ্গি করিল—যাহার অর্থ হইতেছে বিক্রয়ের আশা আর কেন, বাহির হইয়াছে—এই যথেষ্ট!

তবু, ওর সম্বন্ধে মতামত নিশ্চয়ই কিছু পেয়েছেন? উত্তোলিত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসু ভ্রূতে বিদ্রূপের শাণিত রেখা। মতামত যাহা শুনিয়াছি—তাহা ব্যক্ত করা চলে না, অন্তত ইলার কাছে। মিছামিছি উহার বিদ্রূপ-হাস্যকে প্রখর না করিয়া মিথ্যা কথা বলাটা ঢের বেশি আরামপ্রদ।

কহিলাম, না, তেমন মত কেউ দেন নি। তবে আপিসে যাঁরা এসেছিলেন—তাঁরা সবাই—

মানে—লেখকলেখিকার দল তো? ইলা মৃদু হাস্য করিল।

ঈষৎ বেগের সঙ্গে বলিলাম, তাঁদের মতটাই তো আসল।

ইলা হাসিমুখেই বলিল, আসল হলেও—সে মতামতে পত্রিকা বাঁচে না।

আমি ইলার পানে চাহিতেই সে বলিল, বুঝতে পারলেন না? যাঁরা টাকা দিয়ে বই কিনে পড়েন—তাঁরাই তো ওসবের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে থাকেন। পাঠকদের মতামতটাই আসল।

হবে। পাঠকদের হাতে না পড়লে কি করে বুঝবো।

আমি বলব? এর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি আমি।

বেশ ত, করুন না।

না, তাতে আপনার কষ্ট হবে।

মনে মনে বললাম, কি করুণাময়ীই তুমি!

খানিক পরে ইলাই বলিল, কষ্ট না হয়ত বলতে পারি। বলব?

ইলা যাহা বলিবে জানি। তবু সে কথা শুনিবার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে যে উদ্বেগ ভোগ করিতেছি—শুনিবার পরমুহূর্ত্তে তাহার চেয়ে কতখানিই বা কষ্ট ভোগ করিব! মরিয়া হইয়া বলিলাম, বলুন না।

আপনার মুখ কিন্তু শুকিয়ে এলো।

কঠোর সত্য শুনবো বলেই—সব উচ্ছ্বাসকে সরিয়ে দিলাম কিনা।

বাঃ, বেশ তো কথা বলেন আপনি! বালিগঞ্জের জল হাওয়া ভাল!

নীরবে সে তীক্ষ্ণ শর পরিপাক করিলাম।

ইলাও নীরবে খানিকক্ষণ কাগজ উলটাইতে উলটাইতে সহসা মুখ তুলিয়া বলিল, কাগজ আপনাদের ভালই হ'য়েছে।

একি অপ্রত্যাশিত মন্তব্য! মুখ তুলিয়া তাহার পানে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিলাম। ভ্রূ উত্তোলিত, নিম্ন ওষ্ঠ দন্তে ধৃত, মুখে তেমনই মৃদু হাসি। প্রশংসা না বিদ্রূপ কোনটা অকৃত্রিম—সেইটুকুই বোঝা দুষ্কর। সেই পূর্ণ দৃষ্টিপাতের মধ্যে আর একটি নিমেষ আমার সম্মুখে থমকিয়া দাঁড়াইল। সেই গতিহারা নিমেষের মধ্যে ইলার অনেকখানিই যেন দেখিলাম। দেখিলাম, যৌবনলাবণ্যে সে পরিপূর্ণ। রঙে, হাসিতে, কানের দুলে, স্কন্ধে বেষ্টিত শ্লথ শাড়ীর পাড়ে, শোভাময় কবরী রচনায়, করতলন্যস্ত চিবুকের দুষ্মন্ত-চিন্তামগ্ন শকুন্তলীয় ভঙ্গিতে এবং প্রশস্ত চোখের স্নিগ্ধ চাহনিতে সে অপরূপ। স্তম্ভিত মুহূর্ত্তের মধ্যে—এমন দুর্লভদর্শন কদাচিৎ ঘটে।

ইলা হাসিমুখেই বলিল, আপনার কবিতাটি মন্দ হয়নি।

হৃদয়ে স্পন্দন না আসিয়া পারে কি? তবুও নির্ব্বাক বিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম তাহার দিকে।

রেবার কবিতাটি হয়েছে—পাকামো। আর রণজিৎ বাবুরটি হাত পাকানো গোছের। কথা কইছেন না যে?

সমালোচনা শুনছি।

শুনুন। তবে সমালোচনায় আমি নেহাৎ কাঁচা নই। সৃষ্টি করতে না পারলেও—সৃষ্টির খুঁত ধরতে পারি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

সে বলিতে লাগিল, আমার মতটা আপনারা নিয়েছেন দেখে সুখী হলাম—কিন্তু নাম ভাড়া করে কাগজ চালানোর দুর্ভোগটা কেমন জানেন? কাগজ অল্পায়ু হয়।

কেন আপনিই তো বলেছিলেন—

আপনি কি বলেন ঠাট্টা করার অধিকারটুকুও আমার নেই?

তা বলছিনে। তবে ওঁরা হয়ত সেটা ঠাট্টা বলে মনে করেন নি।

ইলা হাসিতে হাসিতে বলিল, দেখুন—ভারে যদি কাগজ কাটে! সহসা হাসি থামাইয়া বলিল, আচ্ছা, আপনাদের কি ধারণা বলুন তো? আপনারা যা লেখেন—তা চমৎকার!

চমৎকার না?

নিশ্চয়। আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে—আমিও উচ্চ ধারণা পোষণ করি। কেন করি জানেন? আত্মপ্রসাদ।

কিন্তু আপনি তো সেদিন বলেছিলেন, হাল্কা গল্প লেখার চেয়ে—প্রবন্ধ লেখার দাম আছে।

সে মতামত এখনও পোষণ করি। কেন করি? কারণ আমি গল্প লিখিনা, কবিতা লিখিনা।

কিন্তু আমার কবিতা ভাল বললেন তো?

লিখিনা বলে বুঝতেও পারি না—এমন অপবাদ দেবেন না। বলেছি তো—আমি সমালোচক। আমার সত্য বিশ্বাস কি জানেন—লঘু সাহিত্য মানুষের ক্ষতিই করে।

সব সময়ে সীরিয়াস হলে মানুষ দম আটকে মরবে যে।

তাহলে যোগীরা তো আগে মারা পড়তেন। নিশ্বাস চালনা করতে ওঁদের তো কম কসরৎ করতে হয় না।

আপনি যোগীদের কথা কি জানেন ?

কিছুই না। ছোট পিসীমার মুখে কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু—জানা থাকলে সমালোচনা করা শক্ত হয় না কি ?

বুঝলাম না।

অন্ধকারে ঢিল ফেলাটাই সব চেয়ে সোজা।

সে ঢিল লক্ষ্য বস্তুর ওপর যদি না পড়ে ?

তাতে আমার আর লজ্জা কি। লক্ষ্য বস্তুর কাছ ঘেঁষে পড়লেই তো কার্য্য সিদ্ধি।

অর্থাৎ ?

সমালোচনার এমন কতকগুলি বাঁধা বুলি আছে—যা তাগমাফিক লাগাতে পারলেই—, কি জানেন—সমালোচক যত পেডাণ্টিক হবেন তত তাঁর কদর।

হাসিলাম।

ইলা হাসিয়া বলিল, আপনাদের পত্রিকার সমালোচনা করব বলে অবশ্য আমি এখানে আসিনি। আমার আসল উদ্দেশ্য এই চিঠিখানা। ছোট পিসীমা দিয়েছেন। চলিতে চলিতে সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, পত্রের প্রাপ্তিস্বীকারে আমার নামটাও উল্লেখ করবেন। পিসিমা জানেন—আমার ভারি ভুলো মন।

দিদি দুই একদিনের মধ্যেই আসিবেন—তাই আমাকে এই ছোট পত্রখানি দিয়াছেন।—ছোট পত্র, তবু সারাদিনকার সমস্ত উদ্বেগ, উল্লাস; বিস্ময় ও নৈরাশ্যকে ছাপাইয়া গেলো দু'টি ছত্রের লেখা।

ভাইটি আমার,

আশা করি, ভাল আছ। এই সপ্তাহের মধ্যেই কলকাতায় যাচ্ছি। বাবা হঠাৎ

এলেন—তিনিই যাবার জন্যে অনুরোধ করছেন। তাই যাব। যাবার আর একটি কারণ হয়ত—নতুন-পাওয়া ভাইটি—তুমি।

মনে মনে আবৃত্তি করিলাম,

দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া।

ছাত্রছাত্রীরা পড়া শেষ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। জানালার ধারে আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র স্পন্দিত হইতেছে, মনের মাঝেও স্পন্দন সুরু হইল। উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা হৃদয়-তন্ত্রীতে বুঝিলাম, বায়ুর আঘাত সুর সৃষ্টি করিতেছে। একটা চেতনা—অন্তর হইতে উঠিয়া—কালির ছাঁদে বন্দী হইতে চাহিতেছে। কাগজ কলম টানিয়া লইবা মাত্র ইলা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।

আবার লিখতে আরম্ভ করলেন যে?

না। খাতা কলম একপাশে ঠেলিয়া রাখিয়া লজ্জিত হাস্য করিলাম।

একটা অনুরোধ করতে এসেছি—যদি রাখেন।

ভীষণ ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম, কি বলুন?

নিউ এম্পায়ারে কথাকলি নৃত্য হবে—সাড়ে আটটায়। ছোট কাকা দু'খানা টিকিট কিনেছিলেন, কিন্তু এখনও তিনি এলেন না ত!

তাহার মুখের হতাশভাবে প্রাণটা বিস্তৃত হইয়া গেল। যে কোন প্রকারের সাহায্য করিবার জন্য মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম। সে সাহায্যদানের মধ্যে আমার আনন্দবোধটা অবশ্য মুখ্য।

ইলা বলিল, কতদিন থেকে কথাকলি দেখব বলে আশা করে আছি, কাকা যে এমন ভাবে হতাশ করবেন ভাবতে পারি নি!

বেশ তো, আপনাকে পৌঁছে দেব আমি।

শুধু পৌঁছে দেওয়া নয়—আপনিও থাকবেন। আমি বাড়িতে

আপনার খাবার বন্ধ করে দিয়েছি, চ্যাঙোয়ায় কিছু খেয়ে নিলেই হবে।

কিন্তু, আমাকে নিয়ে—

তাতে কি! স্যুট আপনার নেই—এই কথা তো? খদ্দরটা পরবেন, একসেট সোনার বোতাম আর দামী ফাউণ্টেনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। ছোট কাকার বিদ্যেসাগরী চটিটাও বোধ হয় আপনার পায়ে হবে।

কিন্তু এমন ভাবে সং সেজে চ্যাঙোয়ায় ঢুকব?

তাতে কি? চাঙোয়া কি একটা যা তা জায়গা! কস্‌মোপলিটান প্রতিষ্ঠান। মুরগীর ঠ্যাং নিয়ে কত টিকিধারী ওখানে টানাটানি করছেন দেখতে পাবেন'খন। বলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া গেল।

কথাকলি নৃত্যের কথা আর বলিব না, তেমন সৌভাগ্য জীবনে বহুবার আসে না। দীপাবলীতেজে উজ্জ্বল রঙ্গশালায় বসিয়া—জীবনের একটা দিকই শুধু রঙীন হইয়া উঠে এবং সেই রঙের মধ্যে আর কোন দিক বা কূলের চিহ্ন মাত্র থাকে না। এত সম্পদভরা এই রঙ্গনৃত্যশালা! এখানে অন্ধকার নাই, দৈন্য নাই, হিসাব নাই, অসুন্দর নাই, চিন্তা নাই, রাজনীতি নাই, দাসত্ব বা বন্ধনের পীড়া নাই; নৃত্যচপলা ঝরণার মত সর্ব্বসমস্যামুক্ত স্বাধীন জীবন—পুঞ্জিত শুভ্রফেনপুষ্পে ও কলোচ্ছ্বাসে ভরা। বাহিরে কলিকাতায় কত না বিক্ষোভ—কত না কোলাহল, এখানে নূপুর নিক্কণিত পায়ের শব্দ, বলয়রণিত বাহুবিক্ষেপের সঙ্গে মিতালী পাতাইয়াছে। যৌবনশ্রীদীপ্ত মুদ্রা-মৌন দেহের লীলায়িত ভঙ্গি—তপস্যার শক্তিকে তীব্রতর করিতেছে, মদবিহ্বল আঁখির মধ্যে দৃষ্টিসুরার সর্ব্বোত্তম প্রসাদ-কণিকা। মর্ত্ত্যকে পায়ের তলায় রাখিয়া অকারণে স্বর্গই বুঝি নামিয়া আসে এখানে!

ইলা! কথাকলি নৃত্য না দেখিলেও—বিস্ময়ে ডুবিয়া যাওয়ার মত

ভাব দেখাইল না। এই প্রেক্ষাগৃহ, নৃত্য, সজ্জা ও ঐশ্বর্য্য-বিলাস তাহাকে বিভ্রান্ত করিতে পারে নাই, খানিকটা মুগ্ধ করিয়াছে যদিও। তা ছাড়া রঙ্গমঞ্চের দোদুল্যমান পর্দ্দার উপর বা নর্ত্তকীর চরণপাতের সুষমায় সর্ব্বক্ষণ সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখে নাই। সন্ধানী আলোর মত তার দৃষ্টি—প্রেক্ষাগৃহের সর্ব্বত্র সঞ্চারিত হইতেছে। একবার মুখ তুলিয়া দেখিলাম—কাহাকে যেন সে খুঁজিতেছে!

রাগিণী দেবীর একটা নূতন নৃত্য সেই মাত্র শেষ হইয়া গেলেও মুখ হইতে তাহার রস-গ্রহণ-সূচক ধ্বনি বাহির হইল না।

কহিলাম, নাচটা বুঝি আপনার ভাল লাগল না?

সে অন্যমনস্ক ছিল—তাহা তাহার চমকানোর ধরণ দেখিয়া বুঝিলাম। বলিল, না, মন্দই বা কি!

এইটেই কিন্তু সব চেয়ে সেরা নাচ।

তাই নাকি! নাচ সম্বন্ধে আপনি নিশ্চয়ই কিছু বুঝিয়ে বলবেন আমাকে।

তীক্ষ্ণ পরিহাসের আড়ালে ইলা গা ঢাকা দিল। লজ্জিত হইলাম যথেষ্ট। কলাসম্মত নাচ এই প্রথম দেখিতেছি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইলার পরিহাস-নিবদ্ধ দৃষ্টিতে কেমন অস্বস্তি বোধ করিয়া কহিলাম, ভাল লাগল বলেই বললাম।

কিন্তু ভাল লাগার একটা কারণ আছে তো? শুধু ভাল লাগাটাই একটা জিনিসের মূল্য যাচাইয়ের কষ্টিপাথর নয়।

কিন্তু ভাল লাগাটাই কি সব কলাশিল্পের সব চেয়ে বড় সার্টিফিকেট নয়?

কেমন করে বলি বলুন! কালিঘাটের পট কারো কাছে ভাল, কেউ

অবনীন্দ্রনাথের ছবির ভক্ত। কেউ কদর্য্য অঙ্গভঙ্গির বাইনাচকে মর্য্যাদা দেন—কেউ—

বিব্রত হইয়া বলিলাম, সৌন্দর্য্য গ্রহণের জন্য যতটুকু রুচি বা শিক্ষার দরকার—সে ষ্টাণ্ডার্ডকে নামিয়ে বিচার করবেন না। আমরা অন্ততঃ এটুকু আশা করতে পারি—যাঁরা এখানে এসেছেন—

ইলা হাসিয়া বলিল, রেবা-দির একটা কথা মনে পড়লো। সবাই ওকে বলে সিনিক, কিন্তু ওর কথাগুলো মনে অনেকদিন পর্য্যন্ত বেঁচে থাকে। এই রকম পোয়ে নৃত্য কি ছউ ডান্স দেখতে আর একদিন আমরা এম্পায়ারে এসেছিলাম। সেদিনও এমনি আয়োজন ছিল—সমারোহ ছিল। নাচের পর নাচ হতে থাকে—আর চারদিক থেকে ওঠে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাগুঞ্জন। রেবা-দি বিরক্ত হয়ে বললে, এক দেশের সম্পত্তি আর এক দেশের চিত্তকে যদি রসপ্লাবিত করতে না পারে—তাতে দোষ সে দেশের শিল্পেরও নয়—বা এদেশের মনেরও নয়। সব দেশেরই একটা নিজস্ব পরিবেশ আছে। বাল্য থেকে সেই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে আনন্দগ্রহণের ধারাটি কখনো এক হতে পারে না; রসগ্রহণের ধারাটি তার ভিন্ন হতে বাধ্য। ওদের নাচ আমাদের মনকে যদি না মাতাতে পারে—তো শুধু শুধু হাততালি দেওয়ার একটিমাত্র মানেই আমি বুঝি।

কি মানে?

রস গ্রহণ না করেও রসজ্ঞ হওয়ার ভাণ।

আমি হাসিয়া উঠিলাম।

হাসলেন যে?

কথাটি কি হাসির নয়?

না, অনেকখানি সত্য আছে ওর মধ্যে। রস আমরা গ্রহণ করি না, শুধু হুজুগে মাতি।

তাহলে বলতে চান এই কথাকলি নৃত্য—

এযে আমাদের ভারতের নিজস্ব ধারা। রামায়ণ মহাভারত পুরাণের কাহিনী, ভিন্ন ভাষা—ভিন্ন আচার—ভিন্ন রুচি সত্ত্বেও, সমস্ত ভারতবর্ষে কি আধিপত্য বিস্তার করছে না? ওরা যদি গান গেয়ে নাচতো তো তার রস গ্রহণ করা কিছু শক্ত হতো। বলিয়া চকিতে আমার দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ইলা চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, সামনের ড্রেস সারকেল হইতে জন চারেক সুবেশ তরুণ-তরুণী স্থানত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে। তাহাদের মৃদু হাসির ধ্বনি ও পুষ্পসার সুরভি আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বারে নব চৈতন্যের বাণী বহন করিয়া আনিল বুঝি। ইলা চঞ্চল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

কহিল, চলুন, আমরাও যাই।

উঠিবার ইচ্ছা ছিল না। প্রোগ্রামটা শেষ না করিয়া কি যাওয়া যায়! কিন্তু আমার আগ্রহের পরাজয় ঘটিল ইলার খেয়ালের কাছে। সে কহিল, একই জিনিস—অন্য আর্টিষ্টদের দ্বারা অভিনীত হবে। তার চেয়ে চলুন চ্যাঙোয়ায় কিছু খেয়ে আসি গে—বড় খিদে পেয়েছে।

এ কথার পর রস-ক্ষুধার তীব্রতা থাকিতেই পারে না। পোর্টিকোর বাহিরে আসিয়া সেই দলটিকে আর দেখা গেল না, ইলার তাহাতে যেন ভ্রূক্ষেপ নাই। সোফেয়ারকে চ্যাঙোয়ার নির্দেশ দিয়া বলিল, আপনি একটু আশ্চর্য্য বোধ করছেন, না? আশ্চর্য্য হওয়াই উচিত। অত আগ্রহ করে শো দেখতে এসে—সবটা শেষ করলুম না। একটু থামিয়া বলিল, এজন্য অবশ্য আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া আমার উচিত।

না, না, ক্ষমা চাইবেন কেন। ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম।

চাইব না! মৃদু শব্দ করিয়া ইলা হাসিয়া উঠিল। বেশ, ক্ষমা নাই বা চাইলাম—একটা ন্যায়সঙ্গত কারণ দেখানো তো উচিত।

তাই বা দেখাবেন কেন?

তাও—না! আবার সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

ভাগ্যে মোটরের মধ্যে আলোক তেমন প্রখর ছিল না!

ইলা বলিল, আপনি অনেক সহ্য করেন দেখছি। কিন্তু মনে রাখবেন—আমাদের অত্যাচারের সীমা নেই।

বুকের মধ্যে স্পন্দন সুরু হইল। এমন পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহার পাইব আশা করি নাই। স্পন্দন না উঠিবেই বা কেন? রোমান্স-পিপাসু মন চিরযুগেই কি এমনি অসম্ভব কিছু—রমণীয় কিছু প্রত্যাশা করে না? রাত্রি যৌবনমুখী, মৃদুগতি মোটরের সুখাসনে ছায়ালোকের মধ্যে বসিয়া সে আর আমি, কথাকলিনৃত্যনিপুণা নটীর লাস্য ও যৌবনোচ্ছল দেহের ভঙ্গিমা বুকের রক্তের উষ্ণতাকে এইমাত্র তো প্রখর ও স্পন্দন-চঞ্চল করিয়াছে, তার উপর চ্যাঙোয়ার একটি উপভোগ্য নৈশভোজ—এ সৌভাগ্য—এ যোগাযোগ জীবনে একবার মাত্রই ঘটে। এই সংযোগ—আমাদের প্রকৃত সম্বন্ধটি ভোলাইবার পক্ষেও যথেষ্ট। সেই নিমেষ দৃষ্টিপাতের মুহূর্ত্তটি চলি চলি করিয়াও থমকিয়া দাঁড়াইল। অনাদি কাল হইতে যে রঙ্গে ভুবনের মনোহরণ-ক্রীড়া চলিতেছে—সেই ক্রিয়াই পুনরায় সুরু হইয়াছে। ইচ্ছা হইল, হাত দিয়া ইলার একখানি হাত চাপিয়া ধরি; ইচ্ছা হইল, আর একটু সরিয়া বসি ওদিকে। এত মন্থর কেন মোটরের গতি? হৃদয় যখন ঘণ্টায় একশত মাইল বেগে ছুটিতেছে, মুখে যখন সমস্ত রক্তোচ্ছ্বাস সবেগে আছড়াইয়া পড়িতেছে—তখন গতির মুখে—টাল খাইয়া মোটর কেন পরস্পরের সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ার দৈবসুযোগ দেয় না?

ইলা বলিল, কথা কইছেন না যে?

কি বলব?

যদি বলি, চ্যাঙোয়ার ভোজের পর লেকে একটা চক্কর দিয়ে আসি?

অনেক রাত হবে না?

হ'লই বা। সামনে রাত নিয়েই বেরিয়েছি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

ইলা বলিল, ভাবছেন বাড়িতে কেউ কিছু বলবেন?

না বলুন, ভাবতেও তো পারেন।

কেন, এম্পায়ারে শো শেষ হতে রাত বারোটা প্রায়ই বাজে। একথা বাড়ির সবাই তো জানেন। তবে—অনেক রকম ভাবনার কথা আছে বটে! ইলার হাসিতে সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিলাম, সে ভাবনাটাই বা কম কিসে?

কার পক্ষে কম? সকৌতুকে ইলা প্রশ্ন করিল।

তাঁদের পক্ষেও হতে পারে, আমাদের পক্ষেও।

আমাদের পক্ষে আবার কিসের ভাবনা! আকাশে উড়বার সময় মাটির কথা কেউ মনে রাখেন নাকি? আমি তো রাখি না।

কিন্তু আকাশে আর কতক্ষণ ওড়া যায় বলুন?

অনেকক্ষণই তো যায়। কিন্তু মাষ্টার মশায়, একটা কথা ভেবে আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—আপনার মধ্যে এমন হিসাবী মানুষ—সংসারী মানুষকে দেখব এ আমি ভাবি নি।

নিশ্চয়ই ভেবেছেন। না ভাবলে আমার সঙ্গে আপনি আসতেন না?

ইলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল, সত্যি? সত্যি? আপনার অন্তর্দৃষ্টিও আছে দেখি!

কথার উত্তর দিতে গিয়া অনুভব করিলাম, তাপমান যন্ত্রের পারা দ্রুত নামিয়া গিয়াছে। রাত্রির অঙ্গে রোমাঞ্চ নাই—আমার বুকের

স্পন্দনও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। এমন হিসাবী মানুষ—একটু আগেও তো আমি ছিলাম না !

খুস্ করিয়া মৃদু শব্দ করিয়া মোটর চ্যাঙোয়ার দ্বারে থামিল। উর্দ্দিপরা বয় আসিয়া সেলাম ঠুকিল। আলোয় উজ্জ্বল সুরপ্রাসাদে প্রবেশ করিলাম। নরম গালিচায় পা দিয়া আবার বুঝি স্বপ্নরাজ্যে ফিরিয়া আসিলাম। উৎসব আর অয়োজন, আনন্দ আর উপভোগ, রঙীণ ফেনার মত—আলোয় ভরা ফানুসের মত—অনুকূল বাতাসে আমরা বুঝি ভাসিয়া চলিতেছি আলস্যে আর নিদ্রায়। কাচের টেবিলে—সুভোজ্য—সুপানীয়, চক্‌চকে চেয়ারে মদালস ভঙ্গিতে বসিয়া কৌতুক-রসোজ্জ্বল নরনারী, চটুল আলাপে আর গ্লাসের ঠুন্ ঠুন্ শব্দে হাজার ওয়াট বৈদ্যুতিক শক্তির আলোটাও যেন দেড়া শক্তি সঞ্চয় করিয়া অপরিমিত ভাবে হাসিতেছে ! শুধু জীবন—প্রখর—উজ্জ্বল—আনন্দমগ্ন—অতিচঞ্চল ও অতিরসঘন জীবন—পূর্ণিমায় আবেগমত্ত সমুদ্রের দুরন্ত পাগল তটভঙ্গকারী তরঙ্গ-মূর্ত্তির মত সব বন্ধন-ছিঁড়িয়া-ফেলার আকুতিপূর্ণ জীবন। পাশে সুবেশা তরুণী—এই আনন্দ সিন্ধুর মধ্যে আমিও ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছি—উন্মত্তের মত। আশ্চর্য্য, সোজা ইলাকে অনুসরণ করিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে চলিতেছি। যেন কতবার এই চ্যাঙোয়ায় আসিয়াছি, কতবার অভিজাত সাহচর্য্যে এই উৎসবকে নিজের করিয়া লইয়াছি, গভীর ভাবে ইহাকেই যেন ভালবাসিয়াছি। কোন্ কোণে—নির্জ্জনতা সৃষ্টি করিয়া মুখোমুখি আমরা বসিব তাও জানি, কোন্ ভোজ্যপানীয়ের আদেশ দিব তাহাও যেন মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যভাবে একটুও এদিক ওদিক তাকাইলাম না—পাছে কেহ আনাড়ী মনে করে। চোখের সম্মুখে আলোর সঙ্গে কাহারা ভাসিয়া গেল—বা সামনে আসিল সে ভ্রূক্ষেপও

রহিল না, শুধুই আনন্দে আর উত্তেজনায় পথ অতিবাহন করিতে লাগিলাম।

কিন্তু নির্জ্জন কোণ বাছিয়া আমরা বসিলাম না। ইলা যেন অকুণ্ঠিত ভাবে আপনাকে মেলিয়া ধরিতে চাহিতেছে। এই রাত্রি—গোপন করিবার জন্য নহে—প্রকাশের মহিমায় ইহার প্রতি ক্ষণ সার্থক হইবে বুঝি!

ছোট টেবিলে মুখোমুখি দুজনে বসিলাম। চারিদিকের দৃষ্টি এদিকে কেন্দ্রীভূত হইল অনুভব করিলাম। যতই গৌরবান্বিত হই না কেন, মাথা কে যেন জোর করিয়া নামাইয়া দিল। ইলা হাসিয়া বলিল, কি অর্ডার করব বলুন?

আপনার যা খুসী।

ফ্রায়েড রাইস—চমৎকার এখানকার। এক ডিস চাউ-চাউ? মটন-চপ, পুডিং আর পরিজ, কি বলেন?

বেশত। মাথা নাড়িলাম, মনের মধ্যে সন্দেহ রহিল—উহার কোনটা তো চৈনিক রুচিঅনুযায়ী তৈয়ারী নহে! আরশুলা-প্রীতি বা ভেক-ভোজ্যের প্রবাদটা ইলা কি আর পরিহাসচ্ছলেও আমার উপর দিয়া চালাইবে! হাজার হোক, বাঙালীর মেয়ে—অতটা উন্নত রুচির পরিচয় দিতে পারিবে না। কিন্তু সত্য বলিতে কি, এই যে সামান্য চিন্তা—সামান্য বিবমিষার ভাব—চৈনিক নামটার জন্যই হয়ত ঘটিয়াছিল, আসলে রসনা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ভোজ্যের জন্য বিশেষ লোলুপ হইয়াই উঠিয়াছে—তবে অজানাকে না জানার সামান্য যে ভয় পরীক্ষা-সমুদ্র উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত সেটুকু থাকেই। স্বর্গ বাসের কল্পনায়ও অমন গা ছম-ছমানির ভাবটা আসিতে বাধ্য।

ফ্রাইগুলো আগে চালান যাক। কাঁটাচামচের ঠুন্‌ঠান্ শব্দ উঠিল।

নিরীহ ফ্রাইকে টুকরা টুকরা করিয়া রাই ও মশলা সহযোগে কাঁটায় বিদ্ধ করিয়া মুখে তোলার মধ্যেও নৈপুণ্য আছে—আনন্দ আছে। একটা আইটেম ফুরায় আর নূতন রকমের পাত্রে—নূতন সেটের কাঁটাচামচ সহ নূতন ভোজ্য উপস্থিত হয়। আমি শুধু ইলাকে অনুসরণ করিতেছি। সে মুখ চালাইলে—মুখ চালাইতেছি, সে থামিলে গল্প করিবার ছলে থামিতেছি। কিন্তু প্রথম পর্ব্বটার পর ইলার আহার-বিরতিটা যেন ঘন ঘন ঘটিতে লাগিল। আমার রসনা নূতন ভোজ্যের রূপে উত্তেজিত হইয়াছে—ইলার নিস্পৃহতা বাড়িয়া চলিয়াছে। ইলা আড়চোখে কোথায় যেন চাহিতেছে আর সামান্য কথায় উচ্ছ্বাসে হাসিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। সে হাসির সংলগ্নতা না খুঁজিয়া পাইলেও তাহার প্রীত্যর্থে আমাকেও হাসিতে হইতেছে। তাপমান যন্ত্রের পারদ আবার নামিয়া আসিতেছে শূন্য পয়েন্টে। সমস্তটাই কেমন যেন অভিনয়।

ইলা সহসা বলিল, এইবার পানীয়—কি বলেন? কোল্ড্ড্রিঙ্ক সুবিধা হবে কি?

তবে কি আনাবেন?

চোখ টিপিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, শেরি-শ্যাম্পেন বলছিনা, প্লেন ওয়াটার অর্থাৎ বীয়ার।

বীয়ার!

না হয়—ককটেল।

শুষ্ক কণ্ঠে কহিলাম, আমি তো ওসব—

চাপা কণ্ঠে ইলা কহিল, আমিই কি ছাই! তবে আনাতে হবে। কি জানেন চ্যাঙোয়ার খানা খেলুম অথচ সাদা জল খেয়ে ওটা—এ্যারিষ্টোক্রেসিতে বাধে যে! বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ভয়ে ঘামিয়া উঠিলাম। টস্ টস্ করিয়া কপাল দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। ইলা ব্যস্ত হইয়া কহিল, শীতকালে—একি কাণ্ড! সব মাটি করলেন দেখছি! পাখাটা খুলে দিতে বলব?

রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিতে মুছিতে বলিলাম, না, থাক।

কিন্তু ভয় আমার মিথ্যা। চারিদিকে যাহা দেখিতেছি—তাহাতে ভঙ্গুর নীতিটুকুকে মানিয়া চলিবার লজ্জাটাই প্রবল হইয়া উঠিতেছে। এখানকার পরিবেশে আনিয়াছে—বিস্তীর্ণ আকাশ, বিস্তীর্ণ সমুদ্রের মাথায় সে বাঁধন-ভাঙ্গার গানই গাহিয়া চলিয়াছে। সমুদ্র গর্জ্জন করিয়া বলে, জানি, জানি। আকাশ মৌন ইঙ্গিতে বলে, ভাঙ্গ, ভাঙ্গ। দিক চক্র-রেখার শৃঙ্খল কোন্ বালুশয্যায় নিশ্চিহ্ন হইয়া ঢাকিয়া যায়, অসীমে উল্লাস চলে, অনন্ত কাল ধরিয়া। উদার শহরে আসিয়া আকাশকে অল্প দেখিয়াই তো অনেক কল্পনা করিব—সমুদ্রকে না দেখিয়াও তাহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইব। কারণ, মহাকাশের টুকরা ও মহাসমুদ্রের অংশ দিয়া তৈয়ারী এই মহানগরী। বাহিরে বৈসাদৃশ্য প্রচুর থাকিলেও আন্তরপূর্ণতায় ইহাদের গোত্র এক। ইহারা সহমর্ম্মী বা একধর্ম্মী।

আইসক্রীম—অল্প বরফ দিয়ে। ঘাম মুছুন।

আপনার যদি অসুবিধা হয়—

আপনি কি ভাবেন—বারটাকে আমি খুব পছন্দ করি?

এই যখন রীতি—আপনিই বলছেন—

আপনার খদ্দরের মর্য্যাদাও দেওয়া উচিত। নয় কিনা বলুন?

আহারাদি শেষ হইলে ইলা বলিল, বিলটা মিটাবার ভার আপনার। লেডিরা কখনো বিল শোধ করে না। অতি সন্তর্পণে পাস'টা সে আমার মুঠার মধ্যে ভরিয়া দিল।

বয়কে দশ টাকার একখানি নোট ফেলিয়া দিয়া বাকীটা ফেরতের

অপেক্ষা করিব কিনা ভাবিতেছি, ইলা আমার বাহুমূল ধরিয়া টানিয়া চলিল, আর নয়—চলে আসুন। টিপ্‌স্‌ না পেলে ওরা ভাববে আনাড়ী!

আনাড়ীর মতই ইলার অনুসরণ করিলাম।

মোটরে উঠিবার মুখে আর একবার চ্যাঙোয়ার পানে চাহিলাম। অতি উজ্জ্বল আলোকে—জন পাঁচ ছয় তরুণতরুণীকে বিস্মিত দৃষ্টিতে আমাদের পানে চাহিতে দেখিলাম। মনে হইল, উঁহারা আমার চেনা, তবু কোথায় দেখিয়াছি—বা কখন দেখিয়াছি—ঠিকমত স্মরণ হইল না। ইলাও সে দিকে চাহিয়া ঝর্ণার মত সুমিষ্ট হাসি হাসিয়া বলিল, চলুন। সোজা লেক—কি বলেন?

না, বাড়ি। গম্ভীর মুখে বলিলাম।

রাত্রি গভীরতর হইলেও—মনের তারে ঠিকমত সুরটি বাজিতেছে না। সমস্তটাই মনে হইতেছে অভিনয়। নিকটবর্ত্তিনী ইলার স্পর্শেও রক্ত আমার উষ্ণ হইয়া উঠিল না, বুকের কম্পন সুরু হইল না। আমাকে লইয়া অকারণ এই অভিনয় কেন—বার বার এই প্রশ্ন মনকে আঘাত করিতে লাগিল।

বাড়ির দুয়ারে আসিয়া ইলা আবেগভরে আমার হাত টানিয়া লইয়া কম্পিত কণ্ঠে কহিল, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ রইলুম, মাষ্টার মশায়। চিরদিন। চোখে তাহার দু'ফোঁটা জল—দেউড়ির আলোকে চক্‌ চক্‌ করিয়া উঠিল।

'কেন' জিজ্ঞাসার অবসর মাত্র না দিয়া বাড়ির মধ্যে চলিয়া গেল।

বিছানায় শুইয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ব্যাপারটা আর একবার ভাবিবার চেষ্টা করিলাম। সমস্তটাই অভিনয় ভাবিতে পারিতেছি কই? মুহূর্ত্তের পাখায় ভর করিয়া যে সুযোগ আসিল ও চলিয়া গেল, তাহাকে সাফল্য দিবার দায়িত্ব হয়ত বা আমারই ছিল। আমার প্রকাশভীরু মন সে সুযোগ গ্রহণ করিতে পারে নাই। আবরণহীন প্রেমের মর্য্যাদা দেওয়া—আমার মত সদ্যপল্লীপরিবেশমুক্ত তরুণ পারিবে কেন? সীমারেখা অতিক্রম করিবার প্রগল্‌ভতা বা শালীনতা বজায় রাখিবার অতি সতর্ক কৃত্রিমতা কোনটাই আমার দ্বারা হইয়া উঠে না। আবেগপরিচালিত হইলে সীমারেখা যেমন মুছিয়া যায়, কৃত্রিমতার আধিপত্যও তেমন মানিতে পারা যায় না। নারিকেলের জলসঞ্চারের মত সুযোগ কখন আসে—আর কখনই বা চলিয়া যায়।

বয়সটাই এমন—নিজেকে নায়ক কল্পনা করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভটা বহুক্ষণ ধরিয়া উপভোগ করিতে ইচ্ছা হয়। কল্পনা তো রঙীন আছেই—তাহার সঙ্গে একখানি পাখা জুড়িয়া দেওয়া মাত্র! সব মন কি এমনই হিসাবহারা—এমনই বাধাবন্ধহীন? যাহা ঘটিতে পারে নাই, তাহা লইয়াই যত কিছু মস্তিষ্ক-বেদনা, যাহা ঘটা উচিত তাহাকে উপেক্ষায় এক পাশে সরাইয়া রাখা! আজন্ম প্রাসাদের প্রসাদে বাড়ি নাই—আমার এ উপভোগ-তৃষ্ণা কেন? দেশের বাড়িতে কি এমনটি ঘটিতে পারিত? পরক্ষণেই ভাবিলাম, কেন ঘটিবে না? রূপকথার আসরে প্রতি সন্ধ্যায় তো মণিহর্ম্ম্যের রূপসী কেশবতী কন্যা সোনার পালঙ্কে সুপ্তিমগ্ন, প্রতি রাত্রিতে রাজপুত্র পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চাপিয়া তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া—ঘুমন্ত কন্যার শিয়রে আসিয়া দাঁড়ান। তারপর ঘটে

অঘটন। শিশুচিত্ত হইতে সেই আলো কিশোরচিত্তে উজ্জ্বলতর হয়। স্বপ্নের সঙ্গে কিছুটা বাস্তব আসিয়া মেশে। লেখাপড়া শিখিলে—জীবনের পথ যে কুসুমাস্তৃত হয়, রূপসী কেশবতী রাজকন্যা না হউক, কোন ধনী-কন্যার বরমাল্য লাভ ঘটে, পক্ষীরাজ ঘোড়ার বদলে মোটর একখানি মিলিতে পারে এবং প্রাসাদের পরিবর্ত্তে সৌধবাস অবিসম্বাদিত এ ধারণার বীজ কোন্ হৃদয়েই না উপ্ত করা হয়? গত যুদ্ধের ভুল প্রোপাগাণ্ডার ফলে জার্ম্মাণ জাতির হার হয়—একথা হিটলারের আত্ম-জীবনীতে পড়িয়াছি—কিন্তু আমাদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য অর্দ্ধেক রাজত্ব ও রাজকন্যার প্রলোভন কোন্ অন্যায় প্রচারকারীরা বহুশত বর্ষ ধরিয়া করিয়া আসিতেছে সে তত্ত্ব কয় জনে বুঝেন? প্রাণের ভয়ে খড়ের গাদায় শশক যেমন মুখ লুকাইয়া আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে—আমরাও কি তেমনই রূপকথার কাহিনীতে জীবনকে সমৃদ্ধ করিবার কল্পনায় বাস্তব হইতে পরিত্রাণ পাইবার চেষ্টা করিয়া থাকি! অথচ মজা এই, এই মুহূর্ত্তে যে ভুল বুঝিতেছি—পর মুহূর্ত্তে সেই সত্যকেই ভুলিতেছি। এই পাওয়া ও হারানোর মধ্যে পাক খাইয়া দিব্য ভাসিয়া চলিয়াছি—সময়ের সমুদ্রে; কূলকিনারা এমন করিয়া পাওয়া যায় না।

শুধু এতটুকু চৈতন্য আমার ছিল যে, ইলাকে লইয়া এই রাত্রিতে কবিতা লিখি নাই। কল্পলোকের উদ্যানে বাস্তব ক্ষণে ক্ষণে রূঢ় মূর্ত্তি লইয়া দাঁড়াইতেছে। প্রহরীর সতর্ক চপেটাঘাত—বড়ই সচেতন করিয়া দিতেছে আমায়। বৃথাই বাতায়নের ফাঁকে—আকাশ জ্যোৎস্নায় সাদা হইয়া উঠিতেছে—বৃথাই বকুল গন্ধামোদিত বায়ু আমার মাথায় আসিয়া নিশ্বাস ফেলিতেছে! আমি অনেকক্ষণ জাগিয়া—অনেকক্ষণ ভাবিয়া—কখন যে ঘুমাইয়া পড়িলাম!

ঠুক—ঠুক ঠুক—দুয়ারে মৃদু করাঘাত।

সুপ্রিয়বাবু, সুপ্রিয়বাবু—

কে? বলিয়াই ত্রস্তে উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দাঁড়াইলাম। সম্মুখে স্মরজিৎ। একি সেই কাল অপরাহ্ণের স্মরজিৎ? একরাত্রিতে মানুষের এমন রূপান্তর ঘটে!

আপনার এমন চেহারা কেন? রাতে কি ঘুমোন নি?

ঘুম! মৃদু হাসিয়া স্মরজিৎ ঘরের মধ্যে আসিয়া বসিল।

প্রশ্ন তো বারবার করা যায় না, ব্যগ্রচোখে শুধু তাহার পানে চাহিয়া রহিলাম।

স্মরজিৎ বলিল, একটা কথা কাল থেকে মাথায় ঘুরছে—কাউকে জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। আর কাকেই বা পেয়েছি—যে জিজ্ঞাসা করব!

কি কথা?

তার আগে শুনুন—এই প্রশ্নটা নিয়ে কাল সারারাত লেকের চার-পাশে ঘুরে বেড়িয়েছি।

রাত্রে ঘুমোন নি? বাড়ি আসেন নি?

কই আর বাড়ি এলুম! ঘুমোলে আমায় দেখে আপনি অমন চমকে উঠবেন কেন!

এক কাপ চা আনতে বলব?

হাত তুলিয়া স্মরজিৎ নিষেধ করিল। চা কি চিন্তার উপশম করতে পারে—দৈহিক অবসাদ হয়ত কিছু দূর করতে পারে। হাঁ, শুনুন—প্রশ্নটা আমার এই, পুরুষ আর নারী এই দুইয়ে মিলে সংসার। অর্থাৎ সুখ, শান্তি, জীবনের বিকাশ আনন্দ যা কিছু। দুই বিরুদ্ধ শক্তির সংমিশ্রণে জীবনের আলো জ্বলে, যেমন পজিটিভ আর নেগেটিভে বিদ্যুৎ-প্রবাহ। শক্তি যখন বিরুদ্ধ তখন পরস্পরকে আঘাত করাও তাদের

স্বধর্ম্ম। অচেতনের মধ্যে যখন এই রকম চলে—তখন যুক্তিবাদী মানুষের পরস্পর বিবাদের সূক্ষ্ম কারণগুলি অনুমান করুন। একদিকে জৈবধর্ম্ম তাদের আকর্ষণ করছে—নিকটে টানছে—আর একদিকে স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মী মন তার থেকে দূরে পালিয়ে যেতে চাইছে। এই আকর্ষণ ও বিকর্ষণের মধ্যে—শান্তি বা সুখের আশা করা বাতুলতা নয় কি?

কিন্তু পরস্পরবিরোধী দুই শক্তির সংমিশ্রণেই তো বস্তুর পূর্ণ বিকাশ।

যতক্ষণ তারা যুক্ত থাকতে পারে—ততক্ষণই বস্তুরূপের প্রাধান্য। বিযুক্ত হলেই—

কিন্তু যুক্ত হওয়াটাই—শত বিরোধ সত্ত্বেও—সংযোগটাই তো প্রকৃতির রীতি।

না সুপ্রিয়বাবু, প্রকৃতি ভয়ঙ্কর খেয়ালী। নিয়ম তাঁর আছে, বহুক্ষেত্রে ব্যতিক্রম করে তিনি রহস্য করেন মানুষকে। একজন—আর একজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে ততক্ষণ—যতক্ষণ যুক্তির বালাই তার মধ্যে থাকে না। যুক্তি এলেই বিযুক্ত হওয়া স্বাভাবিক।

তা যদি হয়—

তর্ক করবেন না। পরীক্ষিত সত্যকে না পাওয়া পর্য্যন্ত তর্ক চলে, তারপর চলে না।

আপনার পরীক্ষাটাই অভ্রান্ত মনে করেন যদি।

কেন করব না মনে! যে জিনিস একান্তভাবে আমার, যা আমার চেতনাকে সুখদুঃখের বস্তুতে উঁচুনীচু করে—তার পরীক্ষা-প্রণালী ভ্রান্ত হবে কেন?

তর্ক তুলিলাম, একটি মানুষের পরীক্ষা-প্রণালীর ছিদ্র থাকতে পারে।

পারে—কিন্তু সামান্য ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সবটুকু সত্য পালিয়ে যায় না।

শুনুন, কেন্দ্রাতিগ শক্তি নিয়ে আমরা বড়াই করি বলেই—এতটা অশান্তি আমাদের। সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া অতিদ্রুত কক্ষে পদচারণা সুরু করিয়া দিল। আমি তাহার গতি-ভঙ্গির প্রতি চাহিয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলাম। ক্রমে তাহার পদচারণা মন্দীভূত হইল, আমার সম্মুখের টেবিলে দুই করতল রাখিয়া, আমার পানে অল্প একটু ঝুঁকিয়া কহিল, সেদিন বলেছিলাম না—রেবাকে আমি ভালবাসি! আজ্ কি মনে হচ্ছে জানেন, তাকে একটুও ভালবাসি না। না, না, না। হো হো করিয়া স্মরজিৎ হাসিয়া উঠিল।

চমকিয়া উঠিলাম। স্মরজিতের নয়নের দৃষ্টি এত তীব্র কেন?

টেবিলে চাপড় মারিয়া সে কহিল, ভালবাসি বলতে—একটা আসক্তি একটা বন্ধন—একটা বেদনা অনুভব করেছি সর্ব্বক্ষণ; সে ভালবাসা অস্বীকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্বস্তি আর আনন্দ পাচ্ছি। মনে হচ্ছে—বন্ধন আমার কোথাও নেই।

একটু থামিয়া বলিল, আপনি হয়ত বলবেন, এইটিই তো শেষ সিদ্ধান্তের ক্ষণ নয়—আবার এমন মুহূর্ত্তও আসবে—যখন বন্ধনকে মেনে নিয়ে এর চেয়েও আনন্দ পাবেন। এই তো বলবেন?

না।

কিন্তু আমি হ'লে তাই বলতুম। সুখের পর দুঃখ ঠিক নিয়ম করে আসে না—তবু ওরা সঙ্গে সঙ্গেই ফেরে। আমরা না চাইলেও ওরা আসে।

আমাদের মধ্যবিত্তদের মধ্যে বিশ্বাস—একটানা সুখদুঃখ থাকে না।

জ্যোতিষও তাই বলে। বৃহস্পতির দশা—শনির দশা—রুল-অব্-থ্রীর মত নাকি আসেই। কিন্তু সেগুলো তো বাইরের আসা। ওগুলো আসে মোটর জুড়ির সঙ্গে—কোম্পানীর কাগজের সঙ্গে—প্রাসাদ-

ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে। আর মনের মধ্যে যে পরমক্ষণ আসে—তার আসার হিসাব জ্যোতির্বিজ্ঞানের আয়ত্তের বাইরে। সেখানে শুক্রের অন্তর্দ্দশায় শনির আগমন সূচিত হয় না, লগ্নাধিপের ক্রিয়া সেখানে অচল।

জ্যোতিষ যদি বিশ্বাস করেন—মনের উপর গ্রহের প্রভাবটাই তো মুখ্য। দেহমাত্র ফলভাগী হয়।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিয়া স্মরজিৎ বলিল, এ কথা আপনি বিশ্বাস করেন?

তর্ক করা আর বিশ্বাস করা দুটিতে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কতটুকুই বা জীবন আমার, অনুভূতির ক্ষেত্র প্রসারিত না হইলে দৃঢ়-নিশ্চয় করিয়া বলিবার কণ্ঠস্বর কোথায় পাইব? আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কি উত্তর দিতে যাইতেছিলাম, স্মরজিৎ বাধা দিয়া বলিল, জানি আপনি বিশ্বাস করেন না, এযুগের অনেকেই করেন না। জ্যোতিষ একটা স্তোকের মত; দারুণ দুর্দ্দিনে ওর কিছু দরকার হয়ত আছে। আমারই কি ছিল না! নইলে কাল রাত্রিতে অনায়াসে লেকের জলে ডুবে মরতে পারতুম।

বলেন কি?

কেন নয় বলুন। অনেকেই তো ডুবেছেন। প্রণয়ের আঘাত সইতে না পেরে—

আপনি ঠিক ততখানি দুর্ব্বল কি?

আমি ঠিক কতখানি কি—তা তখনও বুঝতে পারি নি, এখনও বলতে পারব না। কোন মানুষই তা পারে না। দেখেন নি সাইক্লোনে যে আমগাছ টিঁকে গেল, ফাল্গুনের সামান্য ঝড়ে সে ভেঙ্গে পড়েছে! বুকে লাগলেই তো বুক ভাঙ্গে না, মর্ম্মে লাগা চাই।

কিন্তু—

আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া স্মরজিৎ বলিতে লাগিল,—আমারও মর্ম্মে লেগেছিল—তবু সামলে নিলাম। সামলে নিলাম এই বিশ্বাসে আমাকে আমি সবার চেয়ে ভালবাসি বলে। আবার সেই অট্টহাসি।

সেতো সবাই বাসে।

বাসে—তবে সবাই কেন সামলাতে পারে না? কেন ভেঙ্গে পড়ে?

বলিলাম, সেন্টিমেণ্ট্যাল হ'লেই মানুষ যে নিজেকে ভুলে যায়।

ঠিক, ঠিক, আত্মবিস্মরণ। রামচন্দ্রের এই আত্মবিস্মৃতি ঘটতো, তাই অত কাণ্ডবিশিষ্ট রামায়ণের সৃষ্টি। তিনি যদি নিজেকে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বলে উপলব্ধি করতে পারতেন—তো রাবণবধ কতক্ষণের কাজ! সহসা গাত্রোত্থান করিয়া কহিল, আমি কিন্তু আত্ম-উপলব্ধি করলুম। ত্রেতা আর বিংশ শতাব্দীতে অনেক তফাৎ, নয় কি? চলিতে চলিতে পুনরায় সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, যাবেন আজ বিকেলে দেশবন্ধু স্মৃতি-সভায়? আহা—চমৎকার রবিবাবুর সেই দুই ছত্র:

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ—
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

মৃত্যুহীন প্রাণের চেয়ে বড় সম্পদ্ আর নেই। মৃত্যুহীন প্রাণ।

৬

মৃত্যুহীন প্রাণকে বিরাট সভার মধ্যে প্রত্যক্ষ করিলাম। কোন সূর্য্যহীন প্রাতঃকালে তুঙ্গ হিমগিরি হইতে আনিয়া শিয়ালদহের সমতল প্ল্যাটফরমে দেশনায়কের প্রাণহীন দেহ প্রদর্শিত হইয়াছিল,—সে মৃত্যু-উৎসবকে আমরা প্রত্যক্ষ করি নাই। সেই কোটি কণ্ঠোত্থিত জয়ধ্বনি, জনতার অখণ্ড প্রবাহ, শোকাকুল নরনারীর লাজকুসুম বর্ষণের মধ্যে

শুধু জননায়ক জাগিয়া উঠেন নাই, জাতিকেও জাগ্রত করিয়া গিয়াছেন। সে গৌরবকে বক্তাদের বর্ণনার মধ্যে সভাতলে অনুভব করিলাম। দেহে রোমাঞ্চ ও নয়নে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। মনে হইল, একটা মাত্র প্রাণ কেন মানুষের? কেন ক্ষমতা তার সীমাবদ্ধ? দেশ তো আর অচেতন নয়। তাঁর দুর্দ্দশা দেখিতেছি—রোদন শুনিতেছি। তাঁকে দেবী প্রতিমার মত ভক্তি নিবেদন করিতেছি—মানুষী মায়ের মত ভালবাসিতেছি। 'দেশকে ভালবাসা যদি অপরাধ হয়—তবে আমি অপরাধী।' ওগো, আমরাও তো অপরাধী হইতে চাহিতেছি। এ ভালবাসার বিনিময় নাই—দুঃখ নাই। তুষারস্তূপ হইতে অবিরল জল-ধারার মত এই স্বতঃ-উৎসারিত ভালবাসা। এই ভালবাসার নদীতে অবগাহন করিয়া আমরা ধন্য হইব—আমরা তৃপ্ত হইব।

বাহিরে আসিয়া স্মরজিৎ বলিল, কেমন! তার চোখে জল।

চমৎকার! আমার চোখেও জল।

পারবে না দেশের জন্য সর্ব্বস্ব বিলুতে?

কেন পারব না?

পথ চলিতেছিলাম, না হাওয়ায় উড়িতেছিলাম। গদ্ গদ্ কণ্ঠে কহিলাম, এমন লোককে চোখে দেখবার সৌভাগ্য আমার হ'লো না।

আমি দেখেছি। স্মরজিৎ বলিল। অনেকবার দেখেছি, তাঁর বক্তৃতা শুনেছি, কিন্তু এমন ক'রে বুঝিনি তাঁকে কোন দিন।

কেন?

গানের কান ঠিক হলেই তো গান বোঝা যায় না, প্রাণের সঙ্গে সংযোগ ঘটা চাই। মৃত্যুহীন প্রাণ। চমৎকার!

চমৎকার।

ও মশায়, শুনছেন? ও মশায়?

ভাববিহ্বলতা কাটিয়া গেল। দেখিলাম, সম্মুখের বারান্দার রেলিঙে ঝুঁকিয়া স্থূলকায় এক প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া হাত নাড়িতেছেন। বারান্দার নীচেয় আসিতেই বলিলেন, যদি কিছু মনে না করেন, আমার নাতিটা এইমাত্র বলটা ওপর থেকে ফেলে দিলে। If you don't mind, কিনা, kindly ওটা যদি ছুঁড়ে দেন—

বলটা ছুঁড়িয়া দিলাম উপর দিকে, মনের বাঁধা সুর একটু যেন আহত হইল। লোকটি হাসিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন।

স্মরজিৎ বলিল, কি ইচ্ছে হয় জানেন? প্রাণ দিয়ে দেশের সেবা করি।

এ পথ কুসুমাস্তৃত নয়—মনে রাখবেন।

জানি। দেশবন্ধুও তা জানতেন। সর্ব্বস্ব পণ না করলে শুধু মুখের হৈ-চৈয়ে কাজ হয় না। চলুন—এখনই কংগ্রেসে নাম লিখিয়ে আসি।

তাহার হাত ধরিয়া বলিলাম, আজকের দিনটা থাক না।

সবিস্ময়ে আমার পানে চাহিয়া সে কহিল, মানে? মনস্থির করার কথা বলছেন?

ঘাড় নাড়িলাম।

না, সুপ্রিয়বাবু। বিচার বিবেচনা-করে আর যে কাজই হোক স্বদেশ-সেবা হয় না। সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঠিক করে ফেলা ভাল।

সেই উদ্দেশ্যেই মোড় ঘুরিতেছিলাম—হঠাৎ চারিদিকে 'গেল' 'গেল' রবে একটা কোলাহল উঠিল। চৌমাথার মোড়ে ট্রামে আর বাসে সামান্য রকমের সংঘর্ষ হইয়া গেল। ডবল-ডেকার বাস হইতে প্রাণভীত যাত্রীদল পথের উপর লাফাইয়া পড়িতে লাগিল, চলন্ত জনস্রোত স্তব্ধ হইয়া জমাট বাঁধিল। কে কার কথা শোনে—ঘটনাই বা বুঝিবে কে। একপক্ষ ট্রামের উপর আক্রোশ প্রকাশ করিতেছে। অপর পক্ষ বাসের

পাঞ্জাবী মালিকদের দোষ দিতেছে। কতজন জখম হইল—মরিলই বা কতজন—সে রটনাও সুরু হইয়া গেল।

স্মরজিৎ ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে বলিল, দেখা যাক ব্যাপার কি।

আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

ব্যাপার সামান্য। ট্রাম ও বাস চালক যথাসময়ে সতর্ক হওয়া সত্ত্বেও ঘটনাটা ঘটিয়াছে। জখম দুই-একজন হইয়াছে বটে, কেহ মরে নাই। জখম যাহারা হইয়াছে—সংঘর্ষের প্রত্যক্ষ ফলে সে দুর্ঘটনা ঘটে নাই, প্রাণভয়ে ডবল-ডেকার হইতে লাফ না খাইলে হয়ত এটুকুও ঘটিত না। এটুকু লইয়াই দুটি বিবদমান পক্ষ খাড়া হইয়া গালিগালাজ করিতেছে। দুই যানের চালকদের মধ্যে পূর্ব্বে হয়ত সামান্য বচসা হইয়া গিয়া থাকিবে —উপস্থিত তাহারা একপক্ষীয়। পথচারীদের কটূক্তি বর্ষণের ফলে তাহারাও একতাবদ্ধ হইয়াছে হয়ত। ক্ষতিপূরণের একটা জোর দাবিও জনতা হইতে উঠিতেছে, কিন্তু অল্পবিস্তর আহত জনেরা কণ্ঠস্বর চড়াইয়া সেই দাবির সমর্থন করিতে পারিতেছেন না। আঘাত যন্ত্রণায় হউক অথবা নিজেদের অবমৃষ্যকারিতার জন্যই হউক—মুখ তুলিয়া চাহিতেও তাঁহারা কষ্টবোধ করিতেছেন। বিপুল জনতার দর্শনীয় বস্তু হওয়াটাও তো খুব গৌরবজনক ব্যাপার নহে। দৈব আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিতান্ত অসহায়ের মতই পথচারীর সহানুভূতি ও শুশ্রূষা লাভ করিতে বাধ্য হয়—কিন্তু পৌরুষ তাহার আহত হয়।

স্মরজিৎ সোজা আসিয়া একটি ছেলের কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, কিরে দেবু, জামা কাপড় ঝাড়ছিস যে? অ্যাম্বুলেন্স দরকার হবে না ত?

ছেলেটি সপ্রতিভ মুখে বলিল, না স্মরজিৎ-দা। লাফ খেয়েছিলাম —লক্ষ্যটা ঠিক হয় নি শুধু। একজনের ঘাড়ে গিয়ে পড়েছিলাম।

তাঁর অবস্থা তো সঙ্গীন। কৈ তিনি?

গায়ের ধুলো না ঝেড়েই তিনি পালিয়েছেন। বেশভূষা দেখে মনে হ'লো বড়লোকের ছেলে। বাসে চাপার লজ্জাও তো আছে!

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, আমিও তো গরীব নই।

কিসে—আর কিসে! চল বাইরে। দম আটকে আসছে।

বাহিরে আসিয়া স্মরজিৎ বলিল, গোলমালটা থামিয়ে দিয়ে এলে হতো না?

পারবে তুমি! যাদের কাজ নেই জটলা তাদের জমবেই। ওরা তো বেকারের দল, ট্রাম কোম্পানী বা বাস কোম্পানীর ওপর স্বাভাবিক আক্রোশ কি আর রাখে না? না রাখলে আর মানুষ কিসের!

স্মরজিৎ ধমকের সুরে কহিল, দেখ দেবু, তোর মুখে পাকা পাকা কথাগুলো বড় বেমানান। জেল খেটে কিছু সবজান্তা হয়ে আসিস নি!

ভুল বোঝ কেন, স্মরজিৎ-দা। জেল খাটাটাই তো আমার সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা নয়। জন্ম-দরিদ্রবা একটু অকালেই পেকে থাকে।

তবু তোর বয়সে—

তোমরা যা ভাবতে শেখনি—আমরা তাই কার্য্যে করি। চোখ কান বন্ধ করে পথ চলাটা ভাল কি স্মরজিৎ-দা?

এই তো চোখ চেয়ে পথ চলতে গিয়ে ফ্যাসাদ বাধিয়েছিলি।

দেবব্রত হাসিয়া বলিল, না হয় প্রাণটা যেত—এই তো? পথের কুকুর গাড়ি চাপা পড়লে কার কতটুকু ক্ষতি স্মরজিৎ-দা। আরও উচ্ছ্বসিতভাবে কি বলিতে যাইতেছিল, আমাকে দেখিয়া থামিয়া গেল। শুধু তাহার চোখ দু'টি চক্ চক্ করিতে লাগিল।

স্মরজিৎ তাহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া হাসিল, ভয় নেই, ইনি স্পাই নন, আমাদেরই বন্ধু।

দেবব্রত আমার পানে চাহিয়া বলিল, তা কেন মনে করব। স্পাইকে ডরাবার মত কাজ তো কিছু করি নি। ঈশ্বরজানিত ব্যক্তিরা কি স্বর্গদূতের ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে?

আমি হাসিলাম, আপনি নন-কো-অপারেশন আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বুঝি?

নন-কো-অপারেশন! গান্ধী-আন্দোলন?

বিদ্রূপহাস্যে তাহার মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

আপনি গান্ধী-আন্দোলনকে ঠিক মনে করেন না?

আমরা আর কতটুকু, সার। আমাদের মনে-করাকরির মূল্যই বা কি!

স্মরজিৎ বলিল, মূল্য স্বীকার কর না?

আপনারা—বড়রা তো আমাদের স্বীকার করেন না। আপনারা করেন সভা, আমরা করি উদ্যোগ; আপনারা করেন অভিভাষণ পাঠ, আমরা করি জয়গান; আপনারা বিছানায় শুয়ে সুচিন্তিত কর্ম্মতালিকা তৈরী করেন, আমরা অন্ধকারে—বৃষ্টি মাথায়—কাদা মেখে—না খেয়ে সেই তালিকাকে সুসম্পন্ন করি।

স্মরজিৎ বলিল, তোমরা যে নেতাবাদ স্বীকার কর না—তা জানি।

কিন্তু কেন করি না জানেন কি? দেবব্রতের চোখ জ্বলিয়া উঠিল। জানেন? নেতার জেল হলে ফার্ষ্ট ক্লাস—আমাদের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। নেতাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স নামান্তরিত হয়ে ভবিষ্যৎকে নির্ব্বিঘ্ন করে, আমরা ঘটিটি—বাটিটি পর্য্যন্ত খোয়াই। দেশের জন্য তাঁরা ভাবেন—আমরা সর্ব্বহারা হই। কিন্তু সর্ব্বহারার জন্য তাঁদের মনে দরদ কোথায়?

তুমি জান্‌লে কি করে?

দৃষ্টান্ত দেখালে আপনার চোখেও জল আসবে, তার দরকার নেই। নিজেরা পথ বেছে নিয়েছি—দুঃখ করে নিজেকে কেন অপমানিত করি। নেতাদের পূজা কাগজে-কলমে অক্ষয় হোক স্মরজিৎ-দা, আমাদের ওদিকে চাইতে বলবেন না।

কিন্তু পথ না জানলে তোমরা চলবে কি করে?

হেঁয়ালিভরা পথ, না সত্যিকারের পথ; আমাদের চোখের সামনে মনের রঙীন পরদায় অনেক কিছুই ঢেকে যাচ্ছে মানি, তবু, ঘা খেয়ে খেয়ে সে রঙ ফিকে হবারও বেশি দেরি নেই। পথ আমরা পাবই!

ভুল পথ—

জন্মগত সংস্কার যা বলে ভুল—তাই তো সর্ব্বকালের সত্য নয়। টিকৃটিকি মেনে চলাতে মানুষের মঙ্গল হয়—এতো বহু প্রাচীন সংস্কার। তবু টিকটিকির ডাকে আজ আমরা ক'জনে পা ফেলতে ভয় পাই? খনার বচন অগ্রাহ্য করে আমরা গাধা বনে গিয়েছি হয়ত, বিপদকে ঠেকাতে শিখেছি তেমনি।

তুমি ছেলেমানুষ দেবু। সুনির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপন্থা নইলে—

দেবব্রত বাধা দিয়া বলিল, কাগজ, কলম, নিয়ম, অনুজ্ঞা অনেক কালের হলো—আর ওসব সহ্য করতে পারি না। আমরা চাই যা-হয় একটা কিছু। ফলপ্রদ কোন ঔষধ—যা মানুষকে সত্বর নিরাময় করবে। কতযুগ এলো, কতযুগ গেলো—কাজ আমাদের একটুও এগুচ্ছে না। একি কম দুঃখ!

দুটি হাত ঊর্দ্ধে তুলিয়া আকাশের দিকে সে তাহার অভিযোগ প্রেরণ করিল।

স্মরজিৎ তাহার হাত ধরিয়া কহিল, তবু অহিংসার পথ ছাড়া—

দেবব্রত বলিল, হিংসার পথও দেখেছি, অহিংসার পথও দেখছি, সব

দিক দিয়েই আমরা নিস্ফল! শেষের দিকে হতাশায় তাহার কণ্ঠস্বর ভাঙ্গিয়া পড়িল।

স্মরজিৎ কহিল, আজকের নিস্ফলতা দিয়ে ভবিষ্যতের নিস্ফলতাকে পরিমাপ করা যায়?

যায় বৈকি। আজি আমি বেকার—দুঃখ পাচ্ছি। কাল আমার সামান্য চাকরি যদি জোটে তার ফলও দুঃখ। দুঃখ ঘোচাবার জন্য যে সামান্য চেষ্টা আমাদের, তা দুঃখকেই বাড়ায় শুধু।

প্রথমভাগের স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ শেখার কষ্ট স্বীকার যে না করবে বর্ণ-বিভীষিকা তার ঘুচবে না, দেবু।

কিন্তু এই কি আমাদের প্রথম সাধনা? অগ্নিযুগ এলো, নিস্ফল হলো। অসহযোগ আন্দোলন এলো, নিস্ফল। আইন-অমান্য আন্দোলন, তাও নিস্ফল। কোথায় আমাদের দিব্য অস্ত্র? কে দেবে তার সন্ধান?

দীর্ঘ দিন তপস্যা না করলে দধীচি জন্মাবে না, ভাই।

দেবব্রত অধীরভাবে কহিল, আরও দীর্ঘ দিন? আর কত প্রাণ ক্ষয় হবে?

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল—নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান

ক্ষয় নাই—তার ক্ষয় নাই।

দেবব্রত বলিল, আমাদের প্রাণ যদি কেউ ক্ষয় করে থাকে—সে তোমার ওই মিষ্টিসিজ্‌ম। ওই অধ্যাত্মবাদ। যার প্রেরণায় অগ্নিযুগের অরবিন্দ পণ্ডিচেরিতে বসে অতিমানসের তপস্যা করেন। যোগ্য আধার তৈরী করছেন—পৃথিবীর পরিবর্তনের জন্য দৈবশক্তিকে নামাবেন বলে। বিপ্লবী আজ সত্যযুগ আনার স্বপ্ন দেখছেন।

আমি বলিলাম, সত্যযুগ এলে—পৃথিবীর পরিবর্তন হবে না কি?

তর্কের খাতিরে বলা যায় হবে। শাস্ত্রবচনের ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়ে আশা-জাগানো কিছু কঠিন নয়। যাঁরা তপস্যায় বসেন তাঁদের আত্ম-প্রসাদকে অস্বীকার করি না। শুধু বুঝতে পারি না, অতি-বাস্তবের মধ্যে অতিমানসকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য—যারা সূক্ষ্মলোকের সীমানায় পা পর্য্যন্ত ফেলে নি তাদের আহ্বান করা কেন?

চিত্ত না পরিবর্ত্তিত হলে—

ঠিক তা নয়। বিপ্লবের বীজ এ মাটিতে অঙ্কুরিত হয় না, তাই সহজে যা ফলে তারই চাষ-আবাদ। দেশবন্ধু আর কিছুদিন বেঁচে থাকলে—কোথায় আশ্রম ঠিক করতেন, কে জানে? গান্ধীর তো সবরমতি আছেই।

স্মরজিৎ বলিল, তোরা তবে চাস কি? নেতা চাস না, ধর্ম্ম চাস না, কর্ম্মপন্থা মানিস না—

কেন চাইব না স্মরজিৎ-দা? আমরা জগতের আর পাঁচটা জাত যা আছে—তাই হতে চাই। আমরা যা হারিয়েছি—ভুলে হোক, দোষে হোক, নির্ব্বুদ্ধিতায় হোক, দৌর্ব্বল্যে হোক, শঠতায় হোক আর লোভেই হোক—তাই আমরা ফিরে পেতে চাই। যিনি তা ফিরে পাবার উপায় বলে দেবেন—নাস্তিক হলেও তাঁকে আমরা দেবতা বলব, পূজা করব।

দেখ দেবু, আমাদের সকলের চোখের সম্মুখেই অন্ধকার। পথ নেই। অতীতের অভিজ্ঞতা নিয়ে ভুল পথকে এড়িয়ে সোজা পথ ধরবার চেষ্টা আমরা করছি। আধ্যাত্মিকতা তুমি মান না, আমিও মানি না, কিন্তু আমরা মানি না বলেই যে ওর মূল্য কমে গেল, তা নয়। যে জাত যত দর্পী বা ক্ষমতামত্ত হোক,—তার সেই ক্ষমতাকে বিধৃত করে আছে মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক—মন ছাড়া নয়। অত্যন্ত নিষ্ঠুরের মনের

মধ্যেও একটি soft corner আছে। চেতনা থাকলেই তা থাকে। সেই স্নায়ুকেন্দ্রে ঘা দেবার চেষ্টাই হলো গিয়ে আমাদের অধ্যাত্ম-সাধনা। এ সাধনা সময় সাপেক্ষ, ত্যাগ সাপেক্ষ। আমাদের সহিষ্ণুতা দিয়ে আমরা জয় করবো ওদের স্বৈরাচারকে। একটু থামিয়া বলিল, ভারত-বর্ষের অধ্যাত্মবাদ আজকের নয়। এর রাষ্ট্ররূপের যে চেতনা এতকাল ছিল, সে এই অধ্যাত্মবাদকেই আশ্রয় করে। ইতিহাস তাঁরা তৈরী করেন নি, রচনা করেছিলেন ধর্ম্মশাস্ত্র।

দেবব্রত বলিল, তুমি লেকচার দিতেও পার, স্মরজিৎ-দা! কিন্তু মন আমাদের এতে ভেজে না। হৈ চৈ তো যথেষ্টই হচ্ছে—কাজ এগোয় না কেন?

হৈ চৈ যথেষ্ট হয় বলেই কাজ এগোয় না। কাজ এগুলে কি হৈ চৈ থাকে! কাজ এগোয় বলেই তো পণ্ডিচেরীর আশ্রমের প্রয়োজন।

তোমাদের আশ্রমকে আর ঋষিকে দূর থেকে নমস্কার জানাই। আমরা ওখানে কণ্ঠ মিলাতে পারব না। সবাই যোগাসন পাতলে রাজাসনের ওপর লোভ চলে যাবে, তা আমরা চাই না।

তাহার কথার ভঙ্গিতে আমরা হাসিয়া উঠিলাম।

দেবব্রত ক্রুদ্ধ চক্ষে আমাদের পানে চাহিয়া বলিল, হাসুন। রাজাসন রক্ষা করতে যোগাসনের দরকার হ'য়েছিল একদিন—সে কথা আপনারা ভুলে গেছেন।

ভুলব কেন! তাইত আবার যোগাসন পেতেছেন যোগীরা।

উল্টো ব্যাখ্যা করবেন না স্মরজিৎ-দা। রাজাসনের প্রতিষ্ঠা হয় যদি—তবেই যোগাসনের মূল্য, নইলে ওর দাম কাণাকড়িও নয়। বলিয়া সে গমনোদ্যত হইল।

আহা, রাগ করে যাও কোথায় ?

যোগীর সন্ধানে নয়, স্মরজিৎ-দা। বলিয়া সে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

নিশ্বাস ফেলিয়া স্মরজিৎ বলিল, প্রতীক্ষার ধৈর্য্য ওদের নেই। তরুণ বাংলা—আজ এমনি অস্থির।

মৃদুস্বরে বলিলাম, এ অস্থিরতার কারণ নেই কি ?

আছে, তবু উপায় কৈ ! অনাগত কালের পানে না তাকিয়ে আমরা পারি কি ?

অনাগত কালের জন্য অনির্দ্দিষ্ট প্রতীক্ষাও করতে হবে ?

উপায় নেই। স্মরজিৎ পুনরায় দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনি ঠিকই বলেছেন সুপ্রিয় বাবু, আজ কংগ্রেসে নাম লেখাব না। দেবব্রতকে স্তোক দিলাম, আমারই সন্দেহ রয়ে গেল। যদি ধ্রুব সিদ্ধি লাভ হয়—হোক সে পথ বিলম্বের, সেই পথ আমরা বেছে নেব, কিন্তু কোন্ পথ নিশ্চিত লক্ষ্যের কে বলে দেবে—বলুন ?

দেশবন্ধুর স্মৃতি-সভা হইতে কতটুকু পথই বা অতিক্রম করিয়াছি ! ভাব-সমুদ্রের উদ্বেল তরঙ্গ বুকে পুরিয়া আনিয়াছিলাম, চোখেও ছিল জল। এখন সমুদ্র সঙ্কীর্ণ হইয়া গিয়াছে—চোখের জলও শুকাইয়াছে। পথের ঘটনায় হিসাবী মন—হিসাব কষিতে বসিয়াছে। কোন্ সে পথ ? কি সে বাণী ? কতদিনের তপস্যা ?

আবার মোড় ফিরিয়া আমরা বাড়ির পথ ধরিলাম।

হঠাৎ অতুলদার সঙ্গে দেখা। হেদুয়ার কোণের গেট দিয়া কাহার সঙ্গে গল্প করিতে করিতে তিনি বাহির হইয়া আসিতেছেন। আমি দেখি নাই, তিনি কণ্ঠ চড়াইয়া ডাকিলেন, সুপ্রিয়।

দাঁড়াইলাম। অন্যমনস্ক স্মরজিৎ খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেল।

অতুলদা' বলিলেন, তুই যে ডুমুরের ফুল হয়ে গেলি রে!

দাঁড়াবেন একটু?

একটু কেন, অনেকখানি। তোর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে। যদি অসুবিধা না হয় মেস পর্য্যন্ত আয় না।

আচ্ছা—আমি আসছি। স্মরজিতের নিকট বিদায় লইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

অতুলদার সঙ্গের লোকটি ততক্ষণে চলিয়া গিয়াছেন। আমি ফিরিয়া আসিতেই তিনি বলিলেন, এইদিকে একটু সরে আয় ত। এই আলোর ধারে। নিজেই আমার হাত ধরিয়া সেদিকে টানিয়া আনিলেন ও আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, বাঃ রে শহর!

ফিক করিয়া হাসিয়া বলিলাম, আমার দেহে শহর দেখছেন নাকি?

হাঁরে, শ্রীকৃষ্ণের দেহে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দেখেছিলেন—তোর দেহে আমি শহরকে দেখছি।

কেমন দেখলেন?

রং ধরেছে। এখানকার জলহাওয়া চমৎকার।

কিন্তু আপনিই তো প্রথমটা ঘষে-মেজে দাঁড় করিয়েছিলেন।

আমার ক'বছরের একস্‌পিরিয়েন্স জানিস—দেড় যুগের। আঠারোটি বছর কাটালাম কলকাতায়—আমি চিনব না এদের! এই দেখ, চাচার

হোটেল। এখন কাঁচের বড় বড় হরপে নাম জাঁকিয়ে লোক ডাকছে, কিন্তু খোলার ঘরের কাঠামোটি বজায় রাখলে কি তিনতলা বাড়িতে ওর ঠাঁই হতো? তোফা ফাউলকারি বানায়, খাবি?

না, আজ আর ইচ্ছে করছে না।

তবু ভাল! আমি ভাবলাম বুঝি বামনাই!

আপনাদের বাড়িতে তো মাংস ঢোকা নিষেধ। পেঁয়াজ নয়, মসুর ডাল নয়, ডিম নয়।

তাই তো রিঅ্যাকশনটা আমাদেব দিক দিয়ে হচ্ছে। বাবা মন্তর দিচ্ছেন কানে—পরলোকের পথ বাতলে দিচ্ছেন। আমরা ইহলোকের মজা লুটছি। আলোর নীচেয় অন্ধকার বেশি—এ প্রবাদ বাক্যটা শুধুই তো প্রবাদ বাক্য নয়। বলিয়া হাসিলেন।

শহরে বেড়াচ্ছিস তো খুব?

হুঁ। একটা মাসিক পত্র বেরিয়েছে লেক অঞ্চল থেকে, আমি তার সহঃ-সম্পাদক। রোজ আসাযাওয়া করি।

সাবাস! আমার পিঠে চাপড় মারিয়া তিনি বলিলেন, একেবারে ডবল প্রমোশন। কিন্তু আসাযাওয়া করলেই শুধু হবে না। আইজ এ্যাণ্ড নো আইজের গল্পটা মনে রাখবি।

হাসিলাম।

আচ্ছা ধর, কি রকমের দোকান চলছে শহরে? আঃ বোকারাম, রেষ্টুরেণ্টে কোনদিন ঢুকেছিস তো?

হাঁ—চ্যাঙোয়ায়—

সাবাস! এই চ্যাঙোয়ার চালে না চললে আজ কালকার দিনে ব্যবসা চলে না। খানকতক পালিশ-ওঠা চেয়ার, ফাটা অয়েলক্লথ মোড়া টেবিল, তার উপর সাজানো গোটা চার কাঁচের জার, ময়লা

শেল্‌ফে চামচ কাপ ইত্যাদি, ময়লা ফতুয়া গায়ে একটা লক্ষ্মীছাড়া শুকনো চেহারার বয় এসে চা দিয়ে গেল—ওসব একদম চলে না রে।

কেন, তেমন দোকান তো আছে।

থাকবে না কেন। মল্লিক বাড়ির পাশে যেমন খোলার ঘর আছে। কেউ বেঁচে থাকে সুস্থ শরীরে—কেউ টেঁসোমরা হয়ে। টেঁসোমরা কথাটা বুঝিস তো ?

হাঁ, ঝড়ে পড়া আম শুকিয়ে যেমন পাকার মত হয়।

ফুলগাছও থাকে—আগাছাও থাকে। শহরে থাকতে হলে আগাছা কেন হতে যাবি—ফুলগাছ হবার চেষ্টা কর।

তারপর দুইজনে নীরবে পথ অতিবাহন করিয়া গোলদীঘির ধারে আসিলাম।

গোলদীঘিতে ঢুকিয়া অতুলদা বলিলেন, খবরদার সামনের স্ট্যাচুটার পানে তাকাস নে। চটি পায়ে—সত্যিবাদী ও পণ্ডিত মানুষটির যুগ আর নেই।

ওঁর জন্ম তারিখে ঘটা করে পূজো করেন সকলে।

জন্ম-উৎসব, মৃত্যু-উৎসব ওগুলো হ'লো একালের রেওয়াজ। একালটা কি জানিস—ভুলে যাওয়ার কাল। তাই ঢাকঢোল বাজিয়ে মহত্ত্বকে মনে করিয়ে দিতে হয়।

মনে করানোর মূল্য আছে দাদা।

একটা কথা মনে পড়লো। চালতা বাগানেই হবে—একদিন ভাগবত শুনতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি—বেদিতে বসে কথকঠাকুর পাঠ করছেন—সামনে পুঁথি খোলা ; তার পাশে ফুল আর তুলসীপত্র তার পাশে একটি ঘড়ি। ঘণ্টা ধরে পাঠের ব্যবস্থা বলে ট্যাকঘড়ি এনেছেন ঠাকুর। সেকথা যাক, যন্ত্রযুগের দিনে মানুষকে সবদিকে সতর্ক হয়ে

চলতে হয়। যে ছেলেকে এইমাত্র পড়িয়ে এলাম—সাতটার আধমিনিট এদিক-ওদিক পাছে হয় বলে—সোজা দেখে একটা অঙ্ক দিলাম। মেধাবী ছাত্র হ'লে পাঁচ মিনিট আগেই ছুটি পেতাম, ম্যাদামারা বলে—ছেলেটা একটা মিনিট বেশি নিলে। তোর ভাল লাগছে না বুঝি ?

' এ রকম করে পড়াতে গিয়ে আপনার মনে ঘা লাগে না।

উঁহু যন্ত্রযুগের মাহাত্ম্য তো ঐটুকু। ওপক্ষ থেকে যেমন পুষিয়ে নেবার চেষ্টা—এপক্ষ থেকেও তেমনি পুষিয়ে দেবার কৌশল। ওরা কি করে জানিস ? একটা ছেলেকে পড়াবার নাম করে মাঝে মাঝে বাহিনী ছেড়ে দেয়। আমরাও ছিঁটে-ফোঁটা ছড়িয়ে আসলটাকে ঠেলে রাখি। ব্যবসাদারি তো এক পক্ষের নয়।

তবু শিক্ষকের কত্তব্য—

ছাত্রের কর্ত্তব্য বুঝি শূন্য ? বিশ টাকা লিখিয়ে দশ টাকা মাইনে দিয়ে সরকারী সাহায্যকে ওরা যেমন আদায় করে, আমরাও তেমনি গেরস্থ বুঝে দুধে জল মিশেল করি। দু'পক্ষই জানি দু'পক্ষকে, অথচ মনে করি জিতে গেলাম। নলচে আড়াল দিয়ে তামাক খাওয়া আর কি !

গল্প করিতে করিতে একটা পাক শেষ হইয়া গেল। অতুলদা বলিলেন, আয় একটু বসি। বেশ লাগছে কথা বলতে। সারাদিন ছাত্র পড়িয়ে মাথায় কি আর কিছু আছে রে !

বেঞ্চের উপর বসিয়া বলিলাম, ভাগবতের কথা কি বলছিলেন ?

ওই দেখ, মাষ্টারি রোগে পেয়েছে কিনা, খেই হারিয়ে ফেলেছি। কথকঠাকুর সেদিন ব্যাখ্যা করছিলেন—ভাগবৎ কি ? অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এই তিন যুগে যেমন অবতার আছে—কলিতে তো তা নেই। ভাগবৎগ্রন্থ সেই অবতারের সাবষ্টিটিউট—কিনা বদলী।

কেন কলিতে মনুষ্যমূর্ত্তি ধরে অবতার হলেই তো ল্যাঠা চুকে যেত।

ল্যাঠা তাতে চুকতো না, বাড়তো। সত্যযুগে ছিল তপস্যা, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে সেবা আর কলিতে হলো নাম সংকীর্ত্তন। তাই মানুষের বদলে পুঁথি।

আপনি ভাগবত জানেন কিছু।

ওরে পাগল, এ এমন যুগ সব জিনিসই জানা চাই। আইনষ্টাইন থেকে ভাগবত সব কিছু। কন্টিনেণ্ট্যাল লিটারেচার, স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো লেকচার, দ্বৈতবাদ, অদ্বৈতবাদ, হেগেল, কাণ্ট, শকুন্তলা, রম্যা-রোলাঁ, গর্কি, নুটহ্যামসুন, বার্গসঁ, মারকনি, টলস্টয়, কার্লাইল, স্পিনোজা, কাইসারলিং, কিপলিং, পিরাণ্ডেলো, রিউপার্ট, বিটফেন, ইসাডোরা ডানকান, ম্যাইনক্যাম্ফ, শ, ক্রোপট্‌কিন, হ্যাভলক এলিস—

থামুন, থামুন—অতসব পডবার সময় কোথায় ?

নামগুলো আর সুবিধা মত দু'একটা কোটেশন মুখস্থ রাখলেই চলে। তার বেশি এগোবার দরকার হয় না। তুমি যতটুকু ওদের কথা পাড়বে কর্ত্তাও ততটুকু ওদের কথা শুনবেন। বেশি প্রশ্ন করলে তোমার যেমন বিপদ, ওঁদেরও সমঝদারিত্বের বানচাল হওয়া সম্ভব। দু'পক্ষই কৌশলী কিনা।

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

হাসির কথা নয় ছোক্‌রা—দেড়টি যুগ আঠারো বছর এই করে চলছে—আরও আঠারো বছর চালাবার আশা রাখি।

কেউ আপনাদের ফাঁকি ধরতে পারে নি ?

পারলেও—এড়াবার কৌশল আছে। যেমন ধর না, একবার একজন আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন—অবশ্য প্রশ্নটা অভদ্র—যে আপনি কি পাস ? শুনে হেসে তাঁর প্রশ্নকে উড়িয়ে দিয়ে বললাম, পাস! এ-পাশ আর

ও-পাশ! য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রির কোন মূল্য আছে নাকি? শুনে ভদ্র-লোক ধারণা করে নিলেন—আমি গ্রাজুয়েট।

মন্দ নয়। অশ্বত্থামা হত ইতিগজের মত।

তবে একালের দ্রোণাচার্য্যেরা একটু বেশি হুঁসিয়ার বলে—আমাদের তূণেও অনেক অস্ত্র সজ্জিত রাখতে হয়। কখনো শুনেছিস—ক্লাস থ্রীর ছেলেকে পড়াতে গিয়ে ডান্সের ব্যাখ্যা করতে হ'য়েছে?

আপনি করেছিলেন নাকি ব্যাখ্যা?

অতুলদা হাসিতে লাগিলেন। খানিকপরে বলিলেন, দেরি হলে ওরা কিছু মনে করবে না ত?

না। ডিউটির দিক দিয়ে আমি সৌভাগ্যবান।

ভাল, ভাল। তোকে একটা কথা বলবার জন্যই টেনে নিয়ে এলাম—কিন্তু স্থানটা তেমন নির্জ্জন বোধ হচ্ছে না। অতুলদা এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

কোন গোপনীয় কথা?

হাঁ। কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন, তুই নাকি—না, বাসায় চল।

দু'জনে উঠিলাম।

অতুলদা বলিলেন, হাঁ, আর একটা কথা। জানিস তো এ যুগ প্রোপাগাণ্ডার যুগ। নিজেকে নিজে জাহির না করলে কোন দিক দিয়ে সুবিধা করতে পারবি নে।

হাসিয়া বলিলাম, আপনি নাকি বালিগঞ্জে জমি কিনেছেন?

শুনেছিস—শুনেছিস একথা? স্বর নামাইয়া বলিলেন, বাইরে তাই প্রচার বটে, তবে কিনব শীগ্‌গির।

জমি না কিনে বাইরে প্রচার করার মানে?

পোজিশন বাড়ানো। আমি যে শুধু মাষ্টার নই—এ কথাটা জানিয়ে

অনেকখানি লাভ রে। আর একটা খবর জানিস নে বোধ হয়—নোটের বই লিখছি একখানা।

বলেন কি !

হাঁ—তবে দোরে খিল লাগিয়ে রচনা করি বই।

না হলে গোলমালে লেখা চলে না ?

দূর বোকা ! একি তোদের থীসিস না নভেল লেখা ! যে বইয়ের গোড়াতেই গোল—গোলমালে তার কি করবে !

তবে ?

ক্রমে—ক্রমে প্রকাশ্য। অব্যবসায়ীর কাছে ব্যবসায়ের মূলসূত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ। এমন দিন আসবে—আপনিই ওকথা বুঝতে পারবি।

সাহস পাইয়া বলিলাম, অভয় দিলেন তো আর একটা প্রশ্ন করি।

শিষ্যকে অদেয় গুরুর কিছু নেই, তবে দেখিস—গুরুমারা বিদ্যেটা যেন চালাস নে আমার ওপর দিয়ে।

আপনারা নাকি ছাত্রকে পরীক্ষা-সাগর পারের ব্যবস্থাও করে দেন।

তা না দিলে শিক্ষক নাম হবে কেন ?

না, না, সোজা উপায়ে নয়। ধরুন কোন ছাত্র ফেল করলে—তাকে পার করবার ব্যবস্থাও—

কুন্ঠিত হচ্ছিস কেন, বুঝেছি। কাণ্ডারী যখন আমরা—পার করাই তো আমাদের ধর্ম্ম। তবে পারের কড়ির ব্যবস্থাটা ভাল রকম হওয়া দরকার।

কি করে সম্ভব হয় ?

সে অবস্থায় যদি কখনো পড়—শরণাপন্ন হয়ো—উপায় বাৎলে দেব। নইলে সে গুহ্য তত্ত্ব শোনা নিষেধ।

আর আলোচনা হইল না—আমরা গলির মুখে আসিয়া পড়িয়াছি।

অতুলদা বলিলেন, বেশিক্ষণ তোকে আটকে রাখবো না। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করব। উঁহু লৌকিকতা নয়, নিজের পেট চুঁই চুঁই করছে কিনা!

সিঁড়ি দিয়া উঠিবার কালে মনে মনে বিরক্ত হইলাম। রন্ধনগৃহ হইতে কাঁচা তেল ও মাছ ভাজার গন্ধ আসিতেছে, সিঁড়ির মুখে আলোটা তেমন উজ্জ্বল নহে, কতযুগ সঞ্চিত ধুলা ও ঝুল যে সেটির গায়ে লাগিয়া আছে! এ ঘরের ভাঙ্গা জানালার পাশ দিয়া সরু একটু গলি—তারপর বাঁধানো উঠান। উঠানের এক কোণে এঁটো পাতা, কুটনার খোসা, উপচিত ডাল তরকারি ইত্যাদি ফেলিবার জন্য একটা বড় ফুটা বালতি আছে; কিন্তু বালতিতে সামান্য মাত্র উচ্ছিষ্ট জমিয়াছে, উঠানের চারিপাশে সেগুলি ছড়ানো। কাকে এবং বিড়ালে আহার্য্য বাছিয়া লইবার কালে উঠানকে এভাবে কলঙ্কিত করিয়াছে। এ কলঙ্ক আজ সারারাত্রিতে ধৌত হইবার উপায় নাই। কাল দুই দণ্ড বেলায় ঝাড়ুদার না-আসা পর্য্যন্ত মাছি ও দুর্গন্ধ সমান প্রবল থাকিবে। সে জন্য কাহারই বা মাথাব্যথা! আপিস-পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া যে যাহার আধ-ময়লা শয্যায় চক্ষু বুজিয়াছেন। রান্নাঘরের হাতা-খুন্তির ঠনাঠন থামিলে পিঁড়ি পাতার শব্দ যেমন উঠিবে—অমনি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত পরিশ্রান্ত নির্জ্জীব দেহগুলি চঞ্চল হইবে। পিঁড়ির শব্দের সঙ্গে খড়মের শব্দ তুলিয়া দ্রুতপদে উঁহারা রন্ধন গৃহের অভিমুখে 'কুইক মার্চ্চ' করিবেন। বিলম্বে হতাশ হইবার হেতু বিদ্যমান। সঙ্কীর্ণ ভোজনাগারে বেশি লোকের সঙ্কুলান হয় না। অগ্রে আহার করিবার জন্য কখনও কখনও বা সামান্য তর্ক, কলহ ও ঠেলাঠেলি হয়। বৃহৎ কার্য্যে সেটুকু অবশ্য ধর্ত্তব্যের মধ্যে নহে।

রাত্রি আটটা বাজে—এখনও অনেকে আপিস হইতে ফেরেন

নাই। তালা-লাগানো ঘরের ভিতরটা অন্ধকার—সেই অন্ধকারে ইঁদুররা সকলরবে ছুটাছুটি করিতেছে। যে ঘরে লোক আসিয়াছেন —সে ঘরেও আলো নাই। অন্ধকারে তক্তাপোষের আধ-ময়লা বিছানার উপর মালিকরা চিৎ হইয়া শুইয়া শ্রান্তি দূর করিতেছেন। মৃদুস্বরে পরস্পরে গল্পও চলিতেছে। সে গল্পের বিষয়বস্তু আমার অজানা নহে। আপিসের সাহেব-প্রীতি হইতে বাড়ির পত্নী-প্রীতির পরিচয় পর্য্যন্ত তাহাতে উচ্ছ্বসিত। জিনিস কেনাবেচার কৌশল, বাজারের আলু, পটোল ও সোনারূপার দর, যুদ্ধের খবর, কংগ্রেস বা মুস্লিম লীগের তত্ত্ব, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নারীধর্ষণ ও প্রগতির মুণ্ডপাত প্রভৃতি মন্তব্যসহ আলোচিত হইতে থাকে। সংবাদগুলি ঠিক সংবাদ হিসাবে আলোচিত হয় না, মনের রসে ভিজাইয়া সুখদুঃখের রাংতায় মুড়িয়া সেগুলিকে বাজারে ফিরি করিতে আমরা ভালবাসি। তাই—বহু গবেষণাপ্রসূত জিনিসগুলির অপব্যাখ্যা দুই কথায় সারিয়া—অত্যন্ত খেলো এবং সরল করিয়া দিয়া তৃপ্তি লাভ করি। যেমনঃ হিটলার যদি ও চালটা না দিয়ে এই চাল দিতেন তো...., চেম্বারলেনের পলিসিটা কিছু নয়, ফ্রান্সে কি আর ষ্টেটস্‌ম্যান আছে, ষ্ট্যালিন ভারি ধূর্ত্ত, ইটালী আবার একটা শক্তি, প্যারিস নেওয়া দেড় দিনের কাজ ইত্যাদি ইত্যাদি। এক পক্ষের এক মন্তব্যে অপর পক্ষ সায় দেয় না অবশ্য। কথা কাটাকাটি হইতে মনান্তর। সে মনান্তর এমন প্রবল যে, গ্রেট ব্রিটেন ও জার্ম্মেণীর মধ্যে যদিবা কোন দিন সন্ধি হইবার আশা করা যায়, ইহাদের বিবাদ সম্বন্ধে সে আশা পোষণ করা নিষ্ফল। একখানি জারুল বা শিমুল কাঠের তক্তাপোষের উপর শুইয়া পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার সে কি অদম্য উৎসাহ! সে উৎসাহে, জানালার বাহিরে নির্ম্মল আকাশ কৌমুদীস্নাত হইয়া কতবার যে ঘরের

মানুষকে সৌন্দর্য্য-সাগরে টানিবার চেষ্টা করিয়াছে—এবং কতবার যে ব্যর্থ হইয়াছে! পাশের বাড়ির রেডিয়োটা একটানা গান, অভিনয়, কথকতা, ছেলেদের আসর, দাঠাকুরের ভাঁড়ামি ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া কানের কাছে সুধা পরিবেশনের প্রচেষ্টা করিতেছে—সেদিকে মন রাখিবারই বা অবসর কই? মেস আর ঠাকুর, মাছের মুড়া, চাকরের বড়বাবুর প্রতি পক্ষপাতিত্ব আর সাহেবের সোহাগ এই লইয়াই তো অছিদ্র বেলুন ফুলিয়া আছে। সংসারের অভাবের খোঁচায় মাঝে মাঝে চুপসাইয়া যায় বেলুন, সেই চুপসানো বেলুনের বাহাদুরিই কি কম! আর ঘরের সাজসজ্জা? এখানে ছেঁড়া কাগজ, ও কোণে রংচটা ডালা-তোবড়ানো ট্রাঙ্ক, দেওয়ালের গায়ে পানের পিক ও নস্যের দাগ, কতকগুলা ধুলামাখা খালি শিশি বোতল এখানে-ওখানে ছড়ানো, ময়লা কাপড়ের স্তূপ, ছাতায়-লাঠিতে-কাপড়ে-জামায় ভর্ত্তি ছোট্ট একটি দেওয়াল আলনা, কীটদষ্ট দুই একখানি ছবি চিরধরা কাঁচের ফ্রেমে বাঁধানো, শততালি-দেওয়া বিবর্ণ জুতা....অন্ধকারই ওঘরে মানায়। আলোর যে একটি মনোজ্ঞ ভঙ্গি আছে, পরিচ্ছন্ন রুচি আছে, পারিপাট্যের মধ্যে যে বুদ্ধি বা শ্রী নিহিত, সুসংবদ্ধ আলাপ-আলোচনার মধ্যে যে মার্জ্জিত বিদ্যাবত্তার পরিচয়—সে তো চোখে আঘাত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মনকে পীড়া দিতে থাকে। নিজেকে দুদিন ধনী প্রাসাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিয়া এই রুচি-দৈন্য আমাকে অতিষ্ঠ করিতেছে না অবশ্য। যেটুকু আমরা অনায়াসে করিতে পারি, সেটুকু আলস্যে ও অবহেলায় কত বীভৎসই না হইতে পারে—তাহাই শুধু ভাবিতেছি! এমনি করিয়া বাঁচিয়া থাকা—এবং এমনি দুঃখদৈন্য লইয়া গৌরব বোধ করা আমাদের মূলধন হইয়া দাঁড়াইতেছে। ঈশ্বরকে মানিয়া দেহকে এবং চারিদিকের বস্তুপুঞ্জের উপর কি অপরিসীম ঔদাসীন্য! শুধু দেবতাই বুঝি সমস্ত আবর্জ্জনাকে

পরিশুদ্ধ করিয়া ভক্তের সর্ব্বপ্রকার কলুষকে নষ্ট করিতে পারেন! সাত্ত্বিকতার নামে এই তামসিকতার ভড়ং কতদিন আমরা বজায় রাখিব!

অতুলদার ঘরটি নির্জ্জন এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যন্ত্রযুগের মর্য্যাদা অতুলদা বোঝেন, নিজের বাজার দর সম্বন্ধেও সচেতন তিনি। তাঁহার ঘরে বসিলে মন বিমুখ হইবার অবসর পায় না—অন্তরাত্মা পালাই-পালাই ডাক ছাড়ে না। বহিঃসৌন্দর্য্য যদি অন্তঃসৌন্দর্য্যের প্রতীক না হয়—তবু সে সৌন্দর্য্য ভাল। সুন্দর প্রকাশের মধ্যে চমৎকারিত্ব আছে—মনকে যে সাদর অভ্যর্থনা করে।

ফ্যানটা খুলে দেব?

না। শীতকালে আর হাওয়া খায় না।

কিন্তু যাঁরা আসেন ডিসেম্বরের দিনে—তাঁরাও হাওয়া খেয়ে যান।

তাঁদের গরম হয়ত বা অন্য রকমের।

অতুলদা হাসিয়া বলিলেন, ঠিক বলেছিস। বলিয়া স্বয়ং উঠিয়া দুয়ার অর্গলাবদ্ধ করিলেন। আমাকে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া নিজে একখানি চেয়ার টানিয়া এধারে সরিয়া বসিলেন। এইবার চুপি চুপি বলিলেন, তোদের কাগজের আপিস কোথায় বললি? লেক রোডে? কত নম্বর—?

নম্বর ও রাস্তার নাম বলিলে তিনি মাথা নাড়িয়া বলিলেন, হুঁ, নম্বরটা মিলছে—রাস্তাটাও। পরে আমার মুখের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন, কতদিন হ'লো ওখানে আপিস খুলেছে?

কতদিন আর, এই পনেরো-কুড়ি দিন হবে।

তার আগে?

তার আগে আমি তো জানি না।

ঠিক কথা। তার আগে তুই বা কোথায়! আচ্ছা সুপ্রিয়, একটা

কথা এবার জিজ্ঞাসা করব—ঠিক উত্তর দিবি? ঠিক উত্তর না পেলে তোরই ক্ষতি।

কি জানি অতুলদার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে হৃদ্‌পিণ্ডটা একবার ধ্বক্ করিয়া উঠিল কেন? এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বের সে প্রাণখোলা মানুষটি যেন কতদূরে সরিয়া গিয়াছেন। তীক্ষ্ণ প্রশ্নের বাণ সাজাইয়া এক ঝুনা উকিল বুঝি আমায় জেরা করিতেছেন।

বেশ ত, বলুন না।

স্বর আর একটু নামাইয়া তিনি বলিলেন, ওখানে কাগজের আপিস ছাড়া আর কোন সংঙ্ঘর বা সমিতির কোন আপিস আছে?

কৈ, দেখিনি তো।

কোন খাতাপত্র, নোটিশ বোর্ড, হ্যাণ্ডবিল, সাইনবোর্ড কিছুই নজরে পড়ে নি?

না, কেন?

বলছি। কোন লোক আসেন না—যাঁরা মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করেন? একটু থামিয়া বলিলেন, কিংবা সন্ত্রাসবাদের কথা বলেন?

চমকিত হইয়া শুষ্ককণ্ঠে বলিলাম, এ কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

তুই যদি ওদের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়তিস—আমার মাথাব্যথা ছিল না কিছু। খুব হুঁসিয়ার সুপ্রিয়, স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকে কলকাতা ছেয়ে আছে। ডুবে জল খেলে শিবের বাবাও টের পান না, ওঁরা টের পান কিন্তু।

আপনি সন্দেহ করেন নাকি কিছু?

কানে কথাটা এলো—তাই জিজ্ঞাসা করলাম। তবে জেনে রাখ, কর্ত্তৃপক্ষের কড়া নজর ওদিকে—বেচাল দেখলেই প্রমাণ-সাক্ষ্যের দরকার হবে না—টেনে নিয়ে জেলে পুরবে।

দোষী নহি, তথাপি হৃৎপিণ্ড সজোরে লাফাইতে লাগিল। বিনা বিচারে আটকের অর্থ বুঝি। ভারতবর্ষের এই অভিশাপকে কোন তরুণই বা না জানে!

অতুলদা বলিলেন, তাই ত বলছিলাম, পথ চলবি চোখ খুলে, মিশবি সাবধান হয়ে। বেশ—আমি যে এত কথা জিজ্ঞাসা করলাম—খবরদার ওদের জানাস নে। শুধু সন্ধান রাখবি—তেমন সমিতি কোথাও আছে কিনা।

নিমেষে ভয় চলিয়া গেল, অতুলদার উপর কৃতজ্ঞতাবোধ বিলুপ্ত হইল। আমার নিয়োগ হইতে এই মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অতুলদার দ্বারাই কি আমি নিয়ন্ত্রিত হইতেছি? স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের স্বরূপ আমি জানি না, অতুলদারও তো একটা ছদ্মবেশ থাকা আশ্চর্য্য নহে! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলাম, পরের গতিবিধির ওপর নজর রাখাকে আমি ঘৃণা করি। আমায় মাফ করবেন।

হো হো করিয়া অতুলদা হাসিয়া উঠিলেন, বলিস কি সুপ্রিয়, আমাকেই শেষে গোয়েন্দা ঠাওরালি!

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, আপনি অমন কথা বললেন কেন?

বলি কি আর সাধে! তোর মা যদি আমার হাতে তোর ভালমন্দের ভার না ছেড়ে দিতেন! তাছাড়া তোকে ভালবাসিও। যে ছেলেরা পাড়াগাঁয়ের গোঁড়া ভক্ত—তাদের আমি দেখতে পারি নে।

তা হলে বলুন না, আজই চাকরি ছেড়ে চলে যাই আমি।

চাকরি ছাড়বি আমার কথায়? পারবি?

হুকুম করুন।

একটু থামিয়া অতুলদা বলিলেন, না আজ সে হুকুম করতে পারলাম না ভাই। সে হুকুম করতে পারলেই বুঝি ভাল হ'তো। তবু থাক।

আসল বিপদ আসবার আগে তোকে হয়ত বাঁচাতে পারব—অবশ্য তুই যদি সে সুযোগ আমায় দিস।

কি বলুন?

রাগ করিস না, চোখ খুলে চলতে হবে। আমায় রিপোর্ট না দিস, নিজে অন্তত সাবধান হোস।

আচ্ছা অতুলদা, সত্যিই কি আপনার ধারণা—বিপ্লববাদীরা মন্দ কাজ করে?

আমার ধারণায় তো রাজত্ব চল্‌ছে না ভাই, আমার মতটা নাই বা শুনলি। রাজনীতি উচ্চাঙ্গের জিনিস—ওসব আমরা বুঝি না।

বোঝেন না, না এড়িয়ে যেতে চান?

কথা সমানই। কাগজে বা প্ল্যাটফরমে যে মত দিতে পারে না—তার মতামতে কার বা কতটুকু ক্ষতি!

ভারতের গণ-আন্দোলনকে আপনি অস্বীকার করতে পারেন না।

চক্ষু কপালে তুলিয়া অতুলদা বলিলেন, ওরে থাম, থাম। আমরা সব জিনিসই অস্বীকার করতে পারি নিজেকে ছাড়া।

গণ-আন্দোলন কি নিজেকে বাদ দিয়ে?

সুপ্রিয়, তুই চাকরি ছেড়ে দে ভাই। বেকার অবস্থায় কার্ল মার্কসীয় নীতি ভাল লাগে--

আপনি ঠাট্টা করছেন।

করছিই তো। মারাত্মক সত্যিকে বাঁচাবার উপায় একমাত্র ঠাট্টা। হাঁ ভাল কথা, তোর একখানা চিঠি এসেছে। কদিন থেকে রি-ডাইরেক্ট করব ভাবছি, হয়ে ওঠে নি।

আপনি কথা চাপা দিলেন, অতুলদা!

লাভ ছাড়া তোর অতুল দা—কথার জের টানে না। ব্যাঙ হয়ে আবার ব্যাঙাচির প্রসঙ্গ কেন? তাকের উপর হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া আমার দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, তোমাকর্ত্তৃক উপকৃতা সেই ভদ্রমহিলা। এর মধ্যের চেকখানা আমার প্রাপ্য বলে নিয়েছি—এবং ভাঙ্গিয়েচিও। চিঠিখানা শুধু তোর।

আনন্দে তক্তাপোষ হইতে নামিয়া কহিলাম, দেখলেন অতুলদা, ভুল করি নি।

না।

সেদিন ওঁদের বাসা বদলানোতে আপনি কিন্তু হেসেছিলেন।

আমার অনেক কালের অভিজ্ঞতা যে, সুপ্রিয়। অনেককেই ঠিকানা বদলাতে দেখলাম কিনা।

কিন্তু সবাই সমান নয়।

হাঁ—ব্যতিক্রম আছে বৈকি। চিঠিখানা পড়—আমি হাতমুখ ধুয়ে আসি। খাবার খাবি কিছু। চা?

আনান। না হ'লে তো বলবেন বড়লোকের বাড়ি গিয়ে চাল বিগড়ে গেছে।

অন্যে যে বলুক—আমি বলব না। আমি জানি যে, বড়লোকের বাড়ির খাবার খাওয়াতে কোন পক্ষকেই কুণ্ঠিত হতে হয় না।

গরীবের খাওয়ানোটা বুঝি কুণ্ঠার জিনিস?

কতকটা তাই বৈকি! যখন নিজেরাই গল্প শুনি বা শোনাই তখনই ও কথাটা আমার কেমন মনে হয়। অবশ্য তাদের অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহ করি না, তাদের ব্যগ্রতার মানেও বুঝি—তবু ও কথাটা আমার মনে হয়। কালই তো গিরিশবাবু বলছিলেন—ওঁদের দেশে জগদ্ধাত্রী পূজোয় অনেক আত্মীয় বন্ধু গিয়েছিলেন ঠাকুর বিজয়া

দেখতে। ছিলেন তাঁরা একটি দিন, ওঁর আস্ত দশটাকার নোটখানা থেকে মাত্র ক'গণ্ডা পয়সা নাকি পড়ে আছে!

উনি বোধ হয় কৃপণ।

আমিও তো কথার পৃষ্ঠে বললাম, দোলের সময় আমাদের বাড়িতে যা ধুম হয়। তারপর সকলেরই অতিথ অভ্যাগতের খরচের অঙ্কটা—অর্থাৎ আন্‌ফোরসান একস্‌পেণ্ডিচারের কলামটা—

সেটা গল্প করে গৌরববোধ হয়।

আমি দেখি তার তলার দৈন্যকে। গৌরববোধ কি অভাববোধ থেকেই জন্মায় না? যাঁরা মুখেও ওসব কথা উচ্চারণ করেন না— তাঁদের গৌরবটা না শুনলেও বুঝতে পারি।

আপনি এত ভাবেন?

এইট্টিন ইয়ারস্ একস্‌পিরিয়েন্স রে ভাই—স্রেফ দেড়টি যুগ। কি লিখেছেন ভদ্রমহিলা?

যেতে লিখেছেন একদিন। এত কৃতজ্ঞতা দেবতাকে আমরা দিতে পারি না অতুলদা।

আমরা দেবতা মানি নাকি? একটু থামিয়া বলিলেন, তা যাস, কাছেই তো।

না, যাব না।

কেন রে?

আপনার কথাটা আমার ভারি মনে লেগেছে। মিছিমিছি অভাবের সংসারে খরচ বাড়ানো।

এইতো, ভুল করলি! কৃতজ্ঞতার বোঝা যেখানে ভারি হয়ে উঠে— খোলসা না করে দিলে সেখানে গ্লানি জমে। ওসব ক্ষেত্রে খেয়ে দেয়ে গল্প করে না কেউ—খাইয়ে ধন্য হয়ে যায়।

আপনি পরস্পর-বিরোধী কথা বলছেন।

একটুও না! ঠাকুরের সেবা করে কেউ বুঝি বলে—অমুক দিলাম, তমুক দিলাম!

ঠাকুর তো খান না।

নিবেদন করে মানুষকে বিলোতে হয় তো জিনিসগুলি। দায়ে পড়ে মান রক্ষা, প্রাণের টানে স্নেহ দেখানো—দুটোকে এক করিস নে।

আপনি বড়—

এইট্টিন ইয়ারস্ একস্‌পিরিয়েন্স সুপ্রিয়, ইউ মাষ্ট গো।

আজ তাহলে চলি।

আমি কিন্তু চা জলখাবার খাইয়ে ওদের কাছে গল্প করতে যাব না।

যান, আমি যেন তাই বলছি। হাসিতে হাসিতে অতুলদা—কক্ষ ত্যাগ করিলেন। চা জলখাবারের প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

৮

অতুলদার কথাটা মনের কোথায় গাঁথা ছিল বুঝি—'প্রতিবাদ' কার্য্যালয়ে উঠিবার মুখেই ক্রিয়া আরম্ভ হইল। ভাল করিয়া বাড়িটা দেখিলাম, সিঁড়িটার কয়টা ধাপ আছে—নিজের অজ্ঞাতসারেই গনিয়া ফেলিলাম, এবং ঘরে আসিয়া আর একটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করিবার জন্য ক্ষুদ্র বস্তুকণার উপরও সতর্ক দৃষ্টিপাত করিলাম। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘর। কোথাও আলমারি নাই, কাগজপত্রের ফাইল নাই, ট্রেতে প্রুফের বাতিল কাগজ ছাড়া একখানি পত্রও নাই, ড্রয়ারে কয়েকজন অনামী লোকের রচনা। অত্যন্ত নিরীহ সে রচনা। স্বদেশ স্বাধীনতা সূচক শব্দ দু' একটি থাকিলেও যুক্তিহীন সে উচ্ছ্বাসের পিছনে—সঙ্ঘবদ্ধতার সুনির্দ্দিষ্ট বাণী নাই। কবিতার মধ্যে ছন্দের অভাব—গদ্য কবিতায় প্রকাশ-দার্ঢ্যতা নাই।

আগামী সংখ্যার জন্য এই আগাছা হইতে পুষ্প চয়ন করিতে হইবে। নূতন বাড়ির—নূতন ঘর। দেওয়ালে কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন নাই, কন্‌ক্রীটের ছাদ বলিয়া কড়িকাঠের রহস্য লুপ্ত। একটা তাক—বা কুলুঙ্গি নাই, এমন ঘরে বিপ্লবী সঙ্ঘের অবস্থিতি!

কবিতা ও গল্প লইয়া নির্ব্বাচন করিতে বসিলাম। চমৎকার শীতকালের দুপুর। গাছের মাথায় রোদ আলস্যভরে পড়িয়া আছে, ধুলামাখা সবুজ পাতাগুলি উত্তর বাতাসে ঈষৎ কাঁপিতেছে। ও পারে কোন গৃহস্থের বাড়ির ভিৎপত্তন সুরু হইয়াছে—তাহার গা ঘেঁষিয়া পশ্চিমা গোয়ালাদের বেড়া দিয়া ঘেরা দুখানি করোগেটেড টিনের ছাউনিতে একটি নাতিবিস্তীর্ণ গোয়াল ঘর। গোয়ালে অনেকগুলি দুগ্ধবতী গাভী। কাহারও বৎস আছে, কেহ বা খড়ের তৈয়ারী বাছুরের গা চাটিয়া বাৎসল্যরসে অভিষিক্ত হইয়া গোয়ালার ধনবৃদ্ধির সহায়তা করে। কাঠের নাদায় শুকনা বিচালি। প্রচুর জল টানিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হইবে বলিয়া ছাতু ও গমের ভূষি ইহারা গরুকে দিয়া থাকে। গৃহস্থের সম্মুখে গো দোহন করিলেও—জল মিশাইবার কাজটা পূর্ব্বাহ্নেই এই ভাবে সারিয়া রাখা যায়। খড়ের কুচির সঙ্গে প্রকাণ্ড ঘুঁটেগুলি রৌদ্রে উল্টাইয়া দিয়া এক বুড়ি পা ছড়াইয়া রোদ পোহাইতেছে। একটি নয়-দশ বছরের মেয়ে—সম্ভবত বুড়ির নাতিনী হইবে—দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার মাথার উকুন বাছিতেছে। গোপবধূ লোটা বর্ত্তন লইয়া এক কোণে বসিয়া ঘসর ঘসর শব্দে সেগুলি মাজিতেছে। সামনের খোলা মাঠে—স্কুল-পালানো বা বিদ্যাবিমুখ ছেলেরা ক্রিকেট খেলিতেছে। তাহাদের কোলাহল জানালা দিয়া এই ঘরে আসিতেছে, তার সঙ্গে ফিরিওয়ালার বিচিত্র কণ্ঠস্বর। নিঃসঙ্গ ঘরে বসিয়া দুপুরের রাগিণীকে ঠিক গ্রহণ করিতেছি না, অথচ কবিতা বা গল্পের আসর ভেদ করিয়া সে

উঁকিঝুঁকি মারিতেছে। কবিতা ভাল লাগিতেছে না, বহিঃপ্রকৃতিও না। অতুলদা মনে একটা ছাপ মারিয়া দিয়াছেন।

খুটা খুট্ করিয়া সিঁড়ি দিয়া কে উঠিয়া আসিতেছে। হয়ত রিণিই কবিতা-লেখা অভ্যাস করিতে আসিতেছে। স্থির করিলাম উহাকে বেশি সময় দিব না। কবিতা যেন অঙ্ক - তাই প্রথামত তাহার নির্ভুল উত্তরটা বাহির করিয়া দিব।

গুড্ আফ্‌টারনুন—মিঃ রায়।

গুড্ আফ্‌টারনুন মিস সেন। আপনি—হঠাৎ—

কাল তো লেখা নিয়ে আলোচনার অবসর পেলাম না, আজ এলাম।

কাল আপনি হঠাৎ চলে গেলেন।

চলে যাইনি—ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছলাম অথচ ফিরে আসিনি।

কেন আসেন নি, সেটা জিজ্ঞাসা করা অশোভনজ্ঞানে চুপ করিয়া রহিলাম।

মানুষের প্রতিজ্ঞা তো—কথায় কথায় ভঙ্গ হয়। রেবা হাসিল।

হাসিয়াই বুঝিল, কৈফিয়ৎটা যুক্তিসহ হয় নাই। বিনা প্রশ্নে এমন একটা কৈফিয়ৎ দিবারই বা কি প্রয়োজন ছিল!

সুপ্রিয়বাবু, আপনাদের কাগজ সম্বন্ধে আর কি শুনলেন?

না, বিশেষ কিছু নয়। আজ হকারদের কাছে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে।

আমার কাপিটা কাল পাই নি।

তাই নাকি। ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই রেবা বলিল, ব্যস্ত হবেন না, বসুন। কাল আপনারা চলে যাবার অনেকক্ষণ পরে আমি মিঃ সিনহাকে নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

ওঃ।

কাগজ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'লো। তাতে এই স্থির হলো যে—ওখানা রাজনৈতিক সাপ্তাহিকে পরিণত করা হবে। কতকগুলো কবিতা আর গল্প ছাপিয়ে পয়সা নষ্ট করার কোন মানে হয় না।

মনে মনে আহত হইয়া বলিলাম, কবিতা আর গল্প কি বাজে জিনিস মিস সেন?

রস-সাহিত্য বাজে নয়। সে রস পরিবেশনের ভার যাঁরা নিয়েছেন—তাঁরাই তা বিলোতে থাকুন। আমরা একটা দিক বেছে নিই না কেন?

পলিটিক্স কি স্কুলের ছাত্রীদের পক্ষে সুবিধা হবে?

নিতান্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের মত কথা বললেন যে! শোনেন নি—বয়োবৃদ্ধেরা ছেলের ধর্ম্মে মতি দেখলে বলে থাকেন, আরে বাপু, কিসের বয়স তোমার যে ধর্ম্ম-কর্ম্ম করতে যাবে। আগে চুল পাকুক—দাঁত পড়ুক—। তার পূর্ব্বে ধর্ম্ম চর্চ্চাটা যেন অত্যন্ত অশোভনীয় ব্যাপার।

মানে ক্ষমতার মধ্যে আমরা ভোগকেই শুধু স্বীকার করি।

রেবা বলিল, সেই জন্য ধর্ম্ম আমাদের দুর্ব্বল। শুধু হৃদয়াবেগ নিয়ে কারবার। 'হা গোবিন্দ' বলে চোখের জল ফেলা। ঈশ্বর তুমি এর বিচার করো বলে নিষ্ফল অভিযোগ করা, বা জোর অভিসম্পাৎ—এত পল্‌কা কাঠামোর ওপর আমাদের ধর্ম্মকে দাঁড় করিয়ে রেখেছি আমরা।

তা ছাড়া ধর্ম্মের অন্যরূপ আমরা মানি না।

মানিনা, না, মানবার সাহস নেই? গোবিন্দর জন্যে কাঁদলাম তো অনেক দিন ধরে, চোখের জলে সমুদ্র তৈরী করলাম—নিজেকে ভাসিয়ে দেওয়া ছাড়া—সংসার না পেয়ে সংসার ত্যাগের বড়াই করা ছাড়া আর কিছু লাভ করলাম কি?

তা ছাড়া আমরা আর কি করতে পারি!

ঠিক বলেছেন। পথ হারিয়েছি—পথ খুঁজে বার করবার সাহসই বা কই! ভিক্ষা ছাড়া আমরা আর কি-ই বা করতে পারি। কিন্তু ভিক্ষায়াং নৈবচ নৈবচ। কমলা তাতে প্রসন্ন হন না। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—এ উক্তি একালের দুর্য্যোধনেরাও করেন!

রেবার কথায় যেন হঠাৎ আলোক জ্বলিয়া উঠিল। এই বাড়িতে ঢুকিবার মুখে যে রহস্যের সন্ধান করিয়াছিলাম—সেই রহস্যের যবনিকা বুঝি তুলিয়া উঠিতেছে। অতুলদার কথাই কি সত্য হইবে অবশেষে!

কি জানি, মুখে আমার কি ভাব খেলিয়া গিয়াছিল—রেবা যেন মুহূর্ত্তের অসংযত উচ্ছ্বাসকে দমন করিয়া লইল। শান্ত কণ্ঠে কহিল, বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র রাখতে হলে রাজনীতিকে বাদ দিলে চলবে না। আপনার যদি অমত হয়—ওটা মাসিকই থাকুক, ওর রাজনীতি সম্পর্কীয় বিভাগটা আমি নিতে ইচ্ছা করি।

বেশত। রেবা কাগজখানা তুলিয়া লইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। কয়েক মিনিট পরে স্মরজিৎ প্রবেশ করিয়াই—ভয়ানক আশ্চর্য্যভাবে থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রেবা মুখ হইতে কাগজ নামাইয়া স্মিতহাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল, আসুন, আসুন, স্মরজিৎ-বাবু।

প্রত্যভিবাদনে শির ঈষৎ নামাইয়া স্মরজিৎ চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িল এবং একটা কিছু না বলা অত্যন্ত অশোভন হইবে ভাবিয়া আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, প্রকাশযোগ্য লেখা কিছু পেলেন?

কৈ না ত। গল্পের কয়েকটা ফাইল তাহার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলাম, রেবা দেবী বলছিলেন কতকগুলো বাজে গল্প না দিয়ে—

বাজে গল্প? স্মরজিৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিল।

বাজে নয়? রেবা চেয়ার টানিয়া আগাইয়া আসিল। অমুর এই যে প্রেমের ঘ্যানর ঘ্যানর—এ সহ্য করতে পারেন আপনি?

স্মরজিৎ আমার পানে চাহিয়া উত্তর দিল, যা জীবনে ঘটে—রেবা সেটা লেখায় বাতিল করতে চান।

রেবা বলিল, জীবনে আরও অনেক জিনিস ঘটে—লেখায় তা ফোটাবার সামর্থ্য কই আমাদের?

যথা? একটা উদাহরণ দাও।

বেশত, উদাহরণে কাজ কি। রাজনীতির অধ্যায়টা আমিই লিখব আসছে মাস থেকে।

রাজনীতি? কোন্ পার্টি?

পার্টি ছাড়া বুঝি রাজনীতি হয় না?

কানু ছাড়া গীত আছে নাকি? যেখানে থাকুক—আমাদের দেশে সে আলুনি রাজনীতি কারও মুখে রুচবে না। মাঝে হতে কাগজখানা নষ্ট হবে।

রেবা বলিল, আপনি তো কংগ্রেসের একজন ভক্ত।

ওটা আমাদের ট্রাডিশন। বাপ-ঠাকুরদাদা থেকে চলে আস্‌ছে কিনা। বোম্বাইয়ে যেবার প্রথম কংগ্রেস হয়—আমার ঠাকুরদাদা ছিলেন একজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী ডেলিগেট।

তবে রাজনীতির চর্চ্চা—

রাজনীতি আমার শ্রদ্ধার জিনিস—ওকে হাটের জিনিস করতে বড় বাধে।

রেবা আহত হইয়া বলিল, দলবৃদ্ধির নাম হেটো জিনিস নয়। তাহলে কংগ্রেসের আজ এত মেম্বার হতো না।

আমাদের সদ্যোজাত কাগজের রাজনীতি-বিলাসের সঙ্গে কংগ্রেস-

নীতির তুলনা করো না। পুঁজি নেই—অথচ জাঁক করব এমনটা তো ভাল নয়। হো হো করিয়া স্মরজিৎ হাসিল। বেশ বুঝিলাম, সে হাসি রেবাকে আঘাত করিবার জন্য। গত কালের উষ্ণতা ওর মনে এখনও বিদ্যমান।

রেবা খোলা পত্রিকাখানা টেবিলের উপর নামাইয়া রাখিয়া নিরুত্তাপ কণ্ঠে উত্তর দিল, আপনি আমার ওপর রাগ করেছেন স্মরজিৎবাবু?

রাগ! হাসিটাকে আরও উচ্চ ও বিলম্বিত করিয়া স্মরজিৎ বলিল, হঠাৎ এ সন্দেহ তোমার হ'লো কেন?

তা বটে, এখনও তুমি ছেড়ে আপনি বলেন নি—সন্দেহ না হওয়াই উচিত। কিন্তু আমার কথায় এভাবে প্রতিবাদ করেন নি তো আগে—তাই ভাবছি। রেবাব মুখখানি কেমন ম্লান ও করুণ হইয়া উঠিল।

স্মরজিৎ এতক্ষণ আমার পানে অথবা দেওয়ালের দিকে চাহিয়া কথা বলিতেছিল। রেবার করুণ কণ্ঠস্বরের স্পর্শে হঠাৎ সেইদিকে চাহিল—আমিও চাহিলাম। চাহিবামাত্রই স্মরজিৎ আর আপনাকে সম্বরণ করিতে পারিল না। তাহার ডান হাতখানা অল্প কাঁপিতেছে, সেই সঙ্গে অতি-কোমল মুখভাবে শিহরণ ও চক্ষুর কোলে অশ্রুপতনের আবেগও বুঝি দেখা দিল। সবেগে মুখ ফিরাইয়া সে চেষ্টাকৃত রূঢ়কণ্ঠে কহিল, না, রাগ করিনি।

রেবা মৃদু হাসিল নিঃশব্দে। স্মরজিতের আবেগ-স্ফুরিত মুখের পানে চাহিয়া নিজেকে হয়ত বা নিঃসংশয় করিয়া লইল। মৃদুস্বরে কহিল, আমার তাই মনে হলো। পনেরো মিনিটে ফিরব কথা দিয়েছিলাম।

আমি দু'ঘণ্টা অপেক্ষা করেছিলাম।

দু'ঘণ্টা! কেন অতক্ষণ অপেক্ষা করলেন?

কেন! কথা দিয়েছিলে আসবে, তাই। দুর্লভ সঙ্গ যে সময়জ্ঞান ভুলিয়ে দেয়—তা ধারণা করতে পারিনি।

রেবা সহজ সুরে বলিল, দুর্লভ সঙ্গ সময়জ্ঞান ভোলায় না, কর্ত্তব্যে বাদসাধে বটে!

যাই হোক—যারা অপেক্ষা করে—তাদের পক্ষে কোনটাই কম মারাত্মক নয়।

মারাত্মক! আসবেন স্মরজিৎবাবু আমার সঙ্গে?

কোথায়?

আমাদের বাড়িতে। আসুন না?

রেবার অনুনয়ে স্মরজিৎ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইয়া উহার পানে চাহিল, কেন বল তো?

কারণটা ওখানেই শুনবেন। অবশ্য সে কারণ এমন কিছু গোপনীয় নয়।

তাহলে এখানেই বল না।

না, আপনি মনে রাগ পুষে রাখলে আমার সে কথা বলা হবে না।

আমি তো বলছি আমার রাগ নেই। স্মরজিৎ শুষ্কভাবে হাসিল।

এখানে বসে থাকলে বুঝবো—রাগ আপনার পড়েনি।

স্মরজিৎ বিরক্তির ভান করিয়া কহিল, ভাল বিপদ! কাগজ সম্বন্ধে দুই-একটা আলোচনা করলেও বলবে—রাগ করে রয়েছি।

নিশ্চয় বলবো। চলিতে চলিতে রেবা উঠিয়া আসিয়া স্মরজিতের পিছনে দাঁড়াইয়া কহিল, ভাগ্যিস কাল কংগ্রেসে নাম লেখান নি।

চমকিত হইয়া স্মরজিৎ কহিল, আমি কংগ্রেসে নাম লেখাব কে তোমাকে জানিয়েছে?

যা আপনার মুখচোখের ভাব দেখলাম। রুমালখানা শুকুতে দিয়েছিলেন তো?

তুমিও কাল মিটিঙে গিয়েছিলে নাকি?

সাধারণের যোগদান প্রার্থনীয়—এই লেখা ছিল না?

কিন্তু তোমায় আমি দেখতে পাই নি।

কাল আমার আড়ালে থাকবারই কথা ছিল, ছিলামও আড়ালে

আমায় ডাকলে না কেন?

সাহস হয় নি।

আজ ডাকছ কেন?

এইমাত্র যে অভয় পেলাম। বাঃ রে! বলিয়া স্মরজিতের স্কন্ধে হাত রাখিয়া মৃদুস্বরে বলিল, ওঠ।

দ্বিতীয়বার আপত্তি না করিয়া স্মরজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল।

চল।

স্মরজিৎ দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। কোন চৌম্বক শক্তি যেন ভারি লৌহপিণ্ডকে নিঃশব্দে আকর্ষণ করিল।

বহির্গমনের মুখে রেবা ফিরিয়া কহিল, মিঃ রায়, এখান থেকে ফিরবার আগে—আপনি সন্ধ্যায় আমার ওখানে চা খেয়ে যাবেন। এঁকে অবশ্য আমি ততক্ষণ রাখতে পারব।

ধন্যবাদ। যাবার চেষ্টা করব।

শহুরে ভদ্রতা রাখুন—নিশ্চয় যাবেন বলুন।

হাসিয়া বলিলাম, যাব।

উহারা বাহির হইয়া গেল।

নেগেটিভ আর পজিটিভের সংযোগ—শত বিরোধ সত্ত্বেও—ঘটিবেই। কালই স্মরজিৎ মুক্তির প্রশস্তি গান করিয়াছিল?

আর একটু বেলা বাড়িলে অনু আসিল। আমাকে অভিবাদন করিয়া বলিল, এ মাসের জন্যেও একটা লেখা এনেছি।

বেশ তো, দিন না।

এখুনি একবার চোখ বুলিয়ে নিন না। ভাল না লাগে ফেরৎ দিয়ে দিন।

রণজিৎবাবুকে একবার দেখিয়ে প্রেসে দিয়ে দিই না।

না। মুখ নামাইয়া অনু বলিল, রণজিৎবাবু অবশ্য ভাল ক্রিটিক, তবু ওঁকে দেখাতে আমার কেমন ভয় করে।

ভয়!

কাগজে ছাপাবার আগে পাঁচজনে এই নিয়ে যদি হৈ চৈ করে তাতে বড় অস্বস্তি বোধ করি।

কেন বলুন তো? পাঁচজনকে পড়িয়েই তো লেখকের আনন্দ।

না, ছাপার হরপে বেরুবার আগে আমার লেখাকে আমি বিশ্বাস করি না। কেমন যেন মনে হয়, সামনে মন-রাখা-গোছ ভাল বলে পেছনে এই নিয়ে সবাই হাসাহাসি করবেন।

তাই আপনার মনে হয়? আশ্চর্য্য তো!

আমি তো বেশি লিখি না, হয়ত ভালও লিখি না। তবু নিজের লেখাকে নিজে ভাল জানি।

নিজের লেখাকে ভাল না বাসলে লেখার ওপর দরদ জন্মায় না।

কিন্তু সে ভালবাসা যদি কাণা ছেলেকে মায়ের বেশি আদর দেওয়ার মত হয়? তাইতো লজ্জা করে।

অথচ প্রকাশও করতে চান তাকে।

তাতো চাই। লিখলাম, অথচ প্রকাশ হ'লো না, তার বেদনা কি কম!

কিন্তু আমি যদি প্রতিকূল সমালোচনা করি?

তবু বিশ্বাস আছে—অন্যায় করে কিছু বলবেন না। আর দু'জনের মধ্যে লেখার দোষগুণ বিচার করাতেও খানিকটা স্বাধীনতা আছে, তেমন লজ্জাও বোধ হয় না।

অনু দেবী, আপনি প্রকাশভীরু।

অনু হাসিয়া বলিল, তার মানে—আমার হাতের লেখা বড় খারাপ। খারাপ হাতের লেখা পাঁচজনের সাম্‌নে বার করতে লজ্জা করে। আর পাঙ্কুয়েশন। ভাল তো জানি না, ওটাও প্রুফের মুখে আপনারা শুধরে দেন।

দেখি আপনার গল্প?

কাউকে দেখাবেন না কিন্তু।

ফাইল হাতে লইয়া বলিলাম, আমি পড়ব আপনি চুপ করে বসে থাকবেন?

না, আমি ঘুরে আসছি। বলিয়া উঠিল।

না হয় এই কাগজখানা পড়ুন।

না—বিচারকের সাম্‌নে বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে বসে থাকা আমার পোষাবে না। ঘুরেই আসি।

একটু দাঁড়ান তো। রিণি দেবীর কথা একবার জিজ্ঞেস করি।

সে তো এখানে নেই।

সে কি, কোথায় গেলেন?

আজ সকালেই চিটাগং চলে গেল। কে ওর মাসতুত ভাই এসেছিল তার সঙ্গে।

রণজিৎবাবুও—

না, না, তিনি হয়ত এখুনি আসবেন। তিনি আসবার আগেই

ওটা শেষ করে ড্রয়ারে লুকিয়ে রাখবেন। বলিয়া তাড়াতাড়ি নিজেকে অপস্থৃত করিয়া লইল।

অন্নুর গল্পের হাত ভারি মিষ্ট। প্রকাশভঙ্গিতে সংযম আছে। সংবেদনশীল ওর মন। মননশীলতার দিক দিয়া খাটো হইলেও—হৃদয়ের দিক দিয়া মূল্যবান। মনোনয়ন—চিহ্ন দিয়া গল্পটা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিলাম।

পেন্সিলের চিহ্ন দিয়া সবেমাত্র ফাইলটা টেবিলে রাখিয়াছি অন্নু সসঙ্কোচে প্রবেশ করিয়া কহিল, দেখলেন?

আশ্চর্য্য, যেন সিঁড়ির ঘরে লুকাইয়া আমার পাঠশেষের প্রতীক্ষা করিতেছিল!

মনোনীত।

সত্যি?

এই দেখুন। নীল পেন্সিলে 'ম' চিহ্নটি দেখাইলাম।

কোন দোষ ত্রুটিচোখে পড়লো না?

সামান্য কিছু বললে বলা যায়, মোটের ওপর লেখাটা উৎরেছে।

কি সামান্য দোষ? শুষ্ককণ্ঠে অন্নু প্রশ্ন করিল।

ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, মননশক্তির কিছু অভাব বোধ হ'লো।

অন্নু ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, মননশক্তি বলতে ঠিক পেডাণ্টিক হওয়া কিনা আমি বুঝতে পারিনে।

আপনি তো ডষ্টয়েফস্কি পড়েছেন। ব্রাদারস্ কারামোজোভের 'আইভান'স নাইটমেয়ার' অধ্যায়টা নিশ্চয় মন দিয়ে পড়েছেন।

অদ্ভুত অধ্যায়। রিণি একদিন পড়ে শোনাচ্ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলি, মোপাঁসার গল্প এসব কিছু কিছু পড়েছেন নিশ্চয় ?

অল্পই পড়েছি। একটু থামিয়া বলিল, বুঝেছি। কিন্তু বেশি পড়া-শোনা না থাকলে—

তবু আপনার একটি সম্পদ্ আছে—সে হচ্ছে হৃদয়। মনন আছে অথচ হৃদয় নেই, তেমন লেখা সকলের উপভোগ্য হতে পারে না। রবিবাবুর লেখায় এই দুয়ের আশ্চর্য্য সমন্বয় লক্ষ্য করবেন।

আমরা রবিবাবু হবার আশা রাখি না।

রবিবাবু না হোন—লক্ষ্য উঁচু হওয়া ভাল। জগতের চারদিক ঘুরে দেখে শুনে বেড়ালে—এই শক্তি বাড়ে।

আমার ইচ্ছে অনেক দেশ দেখি—শুধু বেড়াই। কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত।

কতদূর বেড়িয়েছেন ?

কোথায় ! একবার বাবার সঙ্গে বেনারস গিয়েছিলাম, সেই আমার সবচেয়ে দূর দেশ যাওয়া। এদিকে রাণাঘাটের ওপিঠে যাইনি।

পাড়াগাঁয়ে আপনি বাস করেছেন অনেকদিন ?

কোথায় ! জন্মে অবধি ঢাকুরেয় আছি। তবে আগে এদিকটা শহর ছিল না, পাড়াগাঁ বলতে পারেন।

আপনার লেখায় তার ছাপ পড়েছে।

ছেলেবেলা দেখেছিলাম একে পাড়াগাঁ—জ্ঞান হয়ে একে দেখছি শহর। সেই তত অল্প বয়সের কথা কি করে মানুষের মনে থাকে ?

মনীষী ফ্রয়েড বলেন, অবচেতন মনের কোণে অত্যন্ত অস্পষ্ট ও সূক্ষ্ম ঘটনাও লুকিয়ে থাকে। জলের তলায় যেমন সামান্য ময়লা থিতিয়ে পড়ে থাকে। কিছুই নাকি হারায় না। অনুকূল প্রতিবেশটি এলে তারা আপনি জেগে ওঠে।

ফ্রয়েড একটা যুগ পরিবর্ত্তন করে দিয়েছেন, নয়? তবু অনেকে তাঁর নিন্দা করেন।

মনীষী ফ্রয়েডের আবিষ্কার শুধু বুদ্ধিবৃত্তিকে নাড়া দেয় নি, এমন কতকগুলি তথ্য তিনি প্রচার করেছেন—যাতে করে মানুষের চিরাচরিত প্রথাগুলিকে আঘাত করেছে। তাই তিনি অনেকের কাছে অপ্রিয়। ফ্রয়েড সম্বন্ধে আমিও বেশি কিছু জানি না।

অনু এতক্ষণে সুস্থির হইয়া বসিল। খোলা পত্রিকাখানা হাতে লইয়া কহিল, ওই হৃদয়বৃত্তির কথা যা বললেন, ওতো হাসি-ঠাট্টার বিষয়।

ঠিক বুঝতে পারলাম না।

কাল অন্তত দশজনকে আমার গল্পটা শুনিয়েছি। একজন ছাড়া সবাই ঠাট্টা করেছে।

সেই একজনই হয়ত প্রকৃত সমজদার।

কিন্তু তিনি আমার সব কিছুই ভাল বলেন। তিনি আমার মা।

তাহাকে প্রফুল্ল করিবার মানসে বলিলাম, মায়ের চেয়ে বড় বিচারক আর কেউ আছেন?

অনু খুসী হইল না। কহিল, তাঁর কাছে যুক্তি নেই। তাঁর মেয়ে লিখেছে এইটিকে তিনি সবচেয়ে বড় যুক্তি বলে মনে করেন। একটু থামিয়া বলিল, আর সবাই কি বললে জানেন, বড্ড উচ্ছ্বাস তোর লেখায়।

পরে অবশ্য এ উচ্ছ্বাস থাকবে না। স্টাইল আর ভাবকে আয়ত্ত করতে পারলে ওগুলো আপনিই কমে যাবে। নিজের লেখা বারবার পড়বেন। বারবার সংশোধন করবেন। বেচারীকে এমনভাবে উপদেশ দিলাম, যেন আমি একজন পাকা স্টাইলিষ্ট। কিন্তু হাসিবেন না, মেয়েটি লজ্জাশীলা বলিয়াই আমার সাহস হয়ত বা সীমা অতিক্রম করিতেছিল।

পাতকুয়ার কাছে পুকুরেরা একটু গর্ব্ব করিয়াই থাকে, নদীর কাছে যদিও তাহার নির্ব্বাক থাকিবার কথা। নিজেকে প্রকাশ করিতে কে না ভালবাসে। নিমন্ত্রণ-বাড়িতে শাড়ী-গহনার প্রতিযোগিতা দেখিয়াছি, স্কুল-কলেজে ডিবেটিং ক্লাবে বা ক্রিকেট-ফুটবলের ম্যাচেও ওই প্রকাশ-ব্যাকুলতা। যাত্রার আসরে বা প্রতিমা বিসর্জ্জনের শোভাযাত্রায় নিজেকে জাহির করিবার চেষ্টা, এসব তো অহরহ দেখিতেছি। সাহিত্যের পূজা-বেদীতে প্রণাম সারিয়া রাতারাতি যে পুরোহিত হইয়া উঠিব—অনুর মত প্রতিবাদ-অশক্ত ভক্ত না পাইলে সে কথা তো কেহ বুঝিবেন না। এখানে আমার পদমর্য্যাদা সকলেই জানে। অনুও জানে হয়ত, তবু আমাকে সে একজন শক্তিমান ও ন্যায়বান বিচারক কল্পনা করিয়া তাহার অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য যাচাই করিতে দিয়াছে। রাতারাতি পুরোহিত না হইব কেন? মেয়েটি শ্যামলা না হইলে—ইলার পরেই হয়ত মনের মাঝে মুদ্রিতই হইয়া যাইত! ওর কুণ্ঠিত গতি, রক্তোচ্ছ্বাসে আরক্ত গণ্ড, (আরক্ত উপমাটা ভুল। কালোরা লজ্জিত হইলে বেগুণে ভাবটাই না ফুটিয়া উঠে!) মৃদু এবং মিষ্ট কথা কতক্ষণ মনে রাখিতে পারি? যেমন দুপুরের আকাশকে কিছুক্ষণ ভাল লাগে, যেমন আহারের পর মিনিট পনেরোর মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাটা আরামের, যেমন কবিতা লিখিবার কালে নক্ষত্র-স্পন্দিত সেদিনকার অন্ধকার রাত্রির প্রসন্ন পরিবেশটি ভাল লাগিয়াছিল। সে সব তো আজ আর মনে নাই। কিছুক্ষণ আগে যে দুপুর দেখিয়াছিলাম—হৈমন্তিক অপরাহ্নের ভালো-লাগার দায়ে পড়িয়া সেটুকুও তো ভুলিলাম বলিয়া। অনুর মত মেয়েকে কৃপা করাই যায়।

আমার গল্প-দেখার মনোযোগে ও-বেচারী গল্প করিবার মুহূর্ত্তকে সংক্ষিপ্ত করিয়া লইল। খানিকক্ষণ কাগজ নাড়াচাড়া করিয়া 'নমস্কার' বলিয়া বিদায় লইল।

শীতকালের সংক্ষিপ্ত দিন ফুরাইয়া আসিতেছে। গোপবধূ বর্ত্তন মাজা শেষ করিয়া ঘুঁটে তুলিতেছে। বুড়ি কাঁথা মুড়ি দিয়া সেইখানেই গড়াইতেছে, নাতিনীটা তাহার ছেলেদের দলে যোগ দিয়াছে। সূর্য্যের আহ্নিক গতির সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের পটপরিবর্ত্তন সুরু হইয়াছে—শুধু ক্রীড়ারত বালকবালিকার দল জনতায় পরিণত হইতেছে। আজ আর কেহ আসিবেন না, আপিস বন্ধ করিয়া রেবাদের ওখানে চায়ের নিমন্ত্রণটা রাখিয়া যাই।

সিঁড়ির ধারে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, বাহিরে দুইজন বয়োবৃদ্ধের কথোপকথন কানে গেল।

এটা আবার কিসের আপিস দাদা?

ঐযে রংচঙে সাইনবোর্ডটা দেখছ না? প্রতিবাদ।

কিসের প্রতিবাদ?

আমার মাথা আর মুণ্ডুর। সাহিত্যের কি আর মা বাপ আছে? খুড়ো, মেসো, পিসের পয়সা পেয়ে ব্যাঙের ছাতার মত নতুন নতুন কাগজ গজাচ্ছে।

ওঃ, প্রগতি!

হাঁ, আমাদের ছেলেবেলায় ও জিনিসটি তো ছিল না—এখন হয়েছে। আধুনিক সাহিত্যই দেশটা উচ্ছন্নে দিলে।

কেন দাদা, বঙ্কিমবাবু যখন কলম ধরলেন—তখন একদল রক্ষণশীল 'গেল' 'গেল' রবে কি চীৎকার করেন নি? রবিবাবুর বেলায় তার ব্যতিক্রম হয়েছিল?

ওঃ, তুমিও ওই উচ্ছন্নর দলে! বৃদ্ধ মুখ ভ্যাংচাইয়া মন্তব্য করিলেন।

আমি ততক্ষণে বাহিরে আসিয়াছি। প্রৌঢ় ভদ্রলোক বৃদ্ধের পিছু

পিছু একটু দ্রুত চলিতে চলিতে বলিলেন, রাগ করেন কেন দাদা—রাগ করেন কেন?

অতঃপর তাঁহাদের বাদানুবাদ শুনিতে পাইলাম না।

নূতন প্রতিভার পথ চিরদিনই এমন কণ্টকাবৃত। চিরদিনই বিরুদ্ধ মত ও আলোচনার কুয়াশায় সে সূর্য্যকে ঢাকিয়া দিবার ষড়যন্ত্র চলে। অথচ কালকে অতিক্রম করিয়া সূর্য্য নূতন জ্যোতিতে মহিমময় হন—কুয়াশা কোথায় মিলাইয়া যায়। কে বাঁচিয়া থাকিবে—কে মুছিয়া যাইবে, মানুষের নির্দ্দেশে কোন দিন ঘটে না, মহাকাল নীরবহাস্যে সে বিচার নিষ্পন্ন করিয়া দেন।

রেখার পিতা বাহিরের ঘরে অনেকগুলি কোষ্ঠী ছড়াইয়া লগ্নফল বিচার করিতেছিলেন। সেইদিনকার মতই তন্ময়—আত্মসমাহিত। এই ঘরে একটা ভৃত্যও নাই—যাহাকে ডাকিয়া রেবার কথাটা জিজ্ঞাসা করিতে পারি। শব্দ না করিয়া চেয়ার টানিয়া বসিলাম। মানুষের এ দুর্দ্দৈবও আছে। নিজের অক্ষমতা বা নিজের দুর্ব্বলতা জ্যোতির্ব্বিদের কাছে প্রকাশ করিতে তার কুণ্ঠা নাই। যিনি একদিন অপ্রতিহত-প্রভাবে বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়া ন্যায়দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন—অদৃশ্য লেখার কাছে তিনিও মাথা নীচু করিয়া বিচারদণ্ড গ্রহণ করেন। তিনিও অদৃশ্য শক্তিকে ভয় করেন—রুষ্টগ্রহের প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতে জ্যোতির্ব্বিদের দ্বারস্থ হন। বাহিরের জাঁকজমকটা মানুষের সর্ব্বদিক দিয়াই কি বেলুনধর্ম্মী? অদৃশ্য হাওয়ার পরিচালনায় তার গতি হয় নিয়ন্ত্রিত—সেটুকু স্বীকার করিবার মত সবলতাও তার মধ্যে নাই। পাছে কুসংস্কার বলিয়া আর কেহ হাসিবে—সেই বাহির-আগলানো সম্মানের ভয়টাই না প্রবল! কুসংস্কারকে দৃঢ়ভাবে মানিবার সৎসাহস আমাদের

নাই, কাজেই কুসংস্কারকে উড়াইয়া দিয়াও অদৃশ্য সূতায় টানিয়া রাখি। দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে দৈব মানি, রুষ্টগ্রহের প্রসন্নতায় যাগযজ্ঞ করি, কবচ-মাদুলি ধারণ করি, রবি বা সোমবারে দেহ নিরাময়ের জন্য হবিষ্যান্ন গ্রহণ করি। আমরা সুস্থ ও সবল অবস্থায় জ্যোতিষের বেকারত্ব বৃদ্ধি করি, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তার পরিপোষণের ভার লইয়া থাকি।....এমনি অনেক কথাই ভাবিতেছিলাম, রেবার পিতা মুখ তুলিলেন এবং সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, আপনি হঠাৎ যে?

ত্রস্তে নমস্কার করিয়া বলিলাম, আজ্ঞে রেবা বলেছিলেন—

সে কথায় কান না দিয়া তিনি বলিলেন, আজও এলেন ঠিক সন্ধ্যা-বেলায়! সেইদিনই কি বলিনি দিনের বেলায় একদিন আসবেন? আপনার কপালের রেখা ভারি সুন্দর, কর-রেখার সঙ্গে মিলিয়ে মোটামুটি আপনার ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারি।

শুষ্ক স্বরে বলিলাম, আমি তো ভবিষ্যৎ জানবার জন্য ব্যাকুল নই।

নন?—আশ্চর্য্য তো! খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তিনি আমার পানে চাহিয়া বলিলেন, ভয় করেন না ভবিষ্যৎকে?

ভয় কিসের?

গ্রহেরা মানুষের মুখ চেয়ে কৃপা করেন না, বা তার কাকুতিতে প্রসন্ন হন না।

কিন্তু আপনারা গ্রহকে প্রসন্ন করবার জন্য নানান প্রক্রিয়া করেন।

গ্রহ প্রসন্ন না হ'লে আমরা যে প্রসন্ন হই না। বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। ললাটের ত্রিপুণ্ড্র রেখা বলিরেখায় তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, হাসির সঙ্গে চোখের দৃষ্টি প্রখরতর হইল—ধ্বনিতেও কেমন যেন মন-বিমুখ-করা ইঙ্গিত।

রেবা দেবী তাহলে নেই?

মোটর এলে রেবা দেবী থাকেন না। গ্রহউপগ্রহ সদাই ঘুরছে। আহা বসুন না। আমার সঙ্গেই দুটো কথা বলুন। সারাদিন ব্যস্ত ছিলাম বলে —কাজের কথা ছাড়া অন্য কথা ভাল লাগছে এত! কাগজপত্র একধারে ঠেলিয়া দিয়া তিনি আমার দিকে চেয়ারখানা আগাইয়া আনিলেন।

কি কথা কহিব! আমার বিদ্যা আর ওঁর বিদ্যার মধ্যে—এতই তফাৎ যে আলোচনাটা উপদেশ শোনার মতই বিস্বাদ লাগিবে। জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমার কৌতূহল থাকিলেও বা কথা ছিল।

কি বলেন, জ্যোতিষ মানেন না বলে—জ্যোতিষীদের সঙ্গও ভাল লাগে না!

না, তা নয়।

আচ্ছা বলুন তো—রেবা সম্বন্ধে আপনাদের ধারণা কি? আহা মুখ নামাচ্ছেন কেন। আপনাদের সকলকারই চন্দ্রের ক্ষেত্র তো আর উচ্চ নয়! বলিয়া হাসিলেন। সহসা হাত বাড়াইয়া আমার ডান হাতখানি টানিয়া অভিনিবেশ সহকারে দেখিতে দেখিতে বলিলেন, যতই চেষ্টা করুন যশোরেখা আপনার বিস্তৃত নয়। ধনসঞ্চয় মাঝামাঝি, একদিক দিয়ে আপনি সৌভাগ্যবান।

কোন্‌দিক দিয়ে?

তিনি হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, তবে না ভবিষ্যৎ জানতে চান না? ভবিষ্যৎ জানতে কে না চায়? ভবিষ্যৎ না জেনে মানুষের নিস্তার আছে!

কিন্তু ভবিষ্যৎ জেনে মানুষের লাভ?

লাভ আছে, ক্ষতিও আছে। লাভ এই, প্রবল একটা ইচ্ছার বেগকে মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিয়ে তাকে উপরে উঠিয়ে দেয়। মনোবল এনে দেয়।

ক্ষতি কিসের ?

ব্যর্থ হবার ভাবনা। আমি কার্য্য করলে কি হবে—দৈব প্রতিকূল—এমনি ভেবে হাত-পা ছেড়ে দেওয়া। তাই তো প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হয়।

প্রতিকারে কোন ফল হয় ?

কেন হবে না ? যাগযজ্ঞে গ্রহের ক্রিয়া নষ্ট না হোক মনের ক্রিয়া ভিন্নমুখী হয়। আমার অশুভ কেটে গেল—এ একটা কম নির্ভরতার কথা নয় কি ?

কিন্তু আসলে তো ফাঁকি।

ফাঁকি! কাকে আপনি ফাঁকি বলেন ? যে চিকিৎসক সঙ্কটাপন্ন রোগীর চিকিৎসা করেন—তিনি কি নিশ্চয় করে বলতে পারেন ব্যাধি আরোগ্য করে দেবেন ? কতকগুলো ফরমূলা নিয়ে তাঁর কারবার। সাধারণত সেগুলোর ক্রিয়া নার্ভের উপর। আমরাও স্নায়ুর চিকিৎসা করে থাকি। আরোগ্য হওয়া না-হওয়া রোগীর হাত।

আপনার ব্যবসাকে আপনি খেলো করে দিচ্ছেন।

মোটেই না। প্রাণ যাঁদের সঙ্কটাপন্ন—তাঁদের চিকিৎসকের শরণ নিতেই হয়। ব্রিটিশ ফার্ম্মাকোপিয়ায় যদি বিশ্বাস অটল থাকে—গ্রহশান্তিতে কেন বিশ্বাস রাখবেন না ? এসব কি বিজ্ঞান ছাড়া ?

আসলে যাহা জানি না—তাহা লইয়া তর্ক চলে না। চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, বিজ্ঞানের একটা বড় অংশ জ্যোতিষ—অথচ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ বিভিন্ন। দূরবীন চোখে লাগিয়ে তার গতি বা অবস্থানের স্বরূপ নির্ণয় করা কিংবা অঙ্ক কষে মানুষের ভাগ্যের উপর গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব নির্ণয় করা—

তাঁহার বক্তৃতায় বাধা পড়িল। একটি ছোকরা চাকর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমরা চা পান করিব কিনা।

রেবার পিতা বলিলেন, রেবা জিজ্ঞাসা করছেন বুঝি ?

না, গিন্নিমা জিজ্ঞাসা করছেন।

হাঁ আমিই—বলিতে বলিতে এক প্রৌঢ়া মহিলা হাসিমুখে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। বাইরের কে-না-কে আছে বলে ঢুকতে পাচ্ছিলুম না, তুমি তো আমার ছেলের বয়সী।

প্রণাম করিব কিনা ইতস্তত করিতেছিলাম।

জ্যোতিষী বলিলেন, ইনি রেবার মাসীমা। ইনি সংসার তরণীর কর্ণধারণ না করে থাকলে—আমরা হাবুডুবু খেয়ে মরতাম! রেবার বয়স যখন পাঁচ তখন ওর মা মারা যায়।

মাসীমা ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, পাঁচ নয়—চার বছর তিন মাস।

তা হবে। তা তিনি এখন কোথায় গেলেন ?

কি জানি, মোটর তো আসছেই—আসছেই। স্মরজিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল—কার্নিভাল না কি দেখতে গেল।

তুমি বারণ করলে না কেন ?

ছেলেমানুষ—একটু বেড়িয়ে এলই বা। আর মানী ঘরের ছেলেরা সব আসেন—বারণ করা কি ভাল দেখায়! কি বল বাবা ?

আমাকেও উনি মানী ঘরের ছেলে মনে করিয়াছেন নাকি ?

রেবার পিতার পানে চাহিয়া বলিলাম, আজ তা হ'লে উঠি।

মাসীমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, ওমা, সে কি কথা! একটু চা না খেয়ে গেলে মেয়ে এসে কি আমায় আস্ত রাখবে!

রেবার পিতা হাসিয়া বলিলেন, রেবা কি তোমার গায়ে হাত তোলে ?

শোন কথা! হাত তোলার কথা বললুম? মানে সামাজিক খুঁত ধরতে তোমার মেয়ে খুব মজবুত। অমন যে বালিগঞ্জ অঞ্চলের মিসেস রায়—তিনি কি বললেন সেদিন। রেবার মত নিখুঁত সামাজিক মেয়ে আমাদের গৌরবের বস্তু। বলেন নি?

পিতা বলিলেন, রেবার শিক্ষা কার কাছে! এক সময়ে মিসেস টি, গুপ্তারও সমাজে নামডাক ছিল।

যান। বলিয়া প্রৌঢ়া টি, গুপ্তা ব্রীড়াবনতমুখী বালিকায় পরিণত হইলেন। রেবার পিতা হাসিতে লাগিলেন, আমি সেই অবসরে উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

আজ মাপ করবেন, আর একদিন এসে আপনার হাতের চা খেয়ে যাব।

আসবেন, ভুলবেন না যেন। বলিয়া কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট ও দৃষ্টি সলজ্জ করিয়া টি, গুপ্তা অনুরোধ জানাইলেন।

বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। দুয়ারের বাহিরে মোটরের হর্ণ না শুনিয়া মহিলাটিও নিশ্চয় নিশ্চিন্ত হইবেন। আর একদিন চা খাওয়াইবার কষ্ট-স্বীকার হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া মনে মনে অনেকখানি কৃতজ্ঞও হইবেন। নিঃস্বদের চা পরিবেশন করিয়া পরিশ্রমটা বেশি হইবারই কথা।

আরও নিশ্চিন্ত হইলাম স্মরজিতের কথা ভাবিয়া। রেবা এক মুহূর্তে তাহার বৈরাগ্য-বন্ধন মোচন করিয়া দিয়াছে। মুক্তির কথা অতঃপর সে জিহ্বাগ্রে আনিবে না নিশ্চয়।

৯

বাড়ি ঢুকিবার মুখেই দেখিলাম, গেটের ওপাশে দাঁড়াইয়া বিনয়বাবু একজন অপরিচিত তরুণের সঙ্গে কি আলাপ করিতেছেন। আমার প্রবেশ দুইজনেই লক্ষ্য করিলেন—দুইজনেরই ভাবভঙ্গির মধ্যে কি যেন একটা গোপন সঙ্কেত হইয়া গেল—পাশ কাটাইবার সময় সেটুকুও আমার দৃষ্টি এড়াইল না। আমিই কি তবে উহাদের আলোচ্য বিষয়?

দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে সবে পা দিয়াছি—পিছন হইতে বিনয়বাবু ডাকিলেন, শুনছেন?

আমায় কিছু বলছেন?

হাঁ। Kindly একবার বাইরের ঘরে এসে বসবেন? আপনার সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বসিলাম।

আজ আপনি চলে যাবার পর—মেজ বৌরাণী একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলেন আমায়। কেন জানেন? ওঁর বিশ্বাস—ওঁর ছেলেমেয়ের পড়াশোনা ভাল হচ্ছে না।

হৃদ্‌পিণ্ডটা ধ্বক্ করিয়া উঠিল। মুখ আমার শুকাইয়া গেল।

চশমার কাঁচ মুছিবার ছলে—চোখ হইতে চশমা নামাইয়া আমার মুখের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, কর্ত্তা বাড়ি থাকলে অবশ্য এ নিয়ে আমার মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সেক্রেটারি হিসাবে কিছু দায়িত্ব তো রয়েছে। আজ কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি—আপনি একবেলা মাত্র ওদের নিয়ে বসেন, তাও বেশিক্ষণ না।

একটা কিছু না বলিলে অশোভন হইবে বলিয়া কৈফিয়ৎ দিবার মত করিয়া কহিলাম, স্মরজিৎবাবু ডাকলেন, না বলতে পারলাম না।

তিনি হাসিলেন মাত্র।

একটু পরে বলিলেন, কিন্তু আসল ডিউটি আপনার ভোলা উচিত নয়, সুপ্রিয়বাবু। স্মরজিৎবাবু ডাকতে পারেন, ইলা ডাকতে পারেন, (এবার চশমার মধ্য দিয়াই তিনি দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করিলেন) মোটকথা আসল কাজ ঠেকিয়ে তবে ওঁদের অনুরোধ রাখলে আর ক্ষতি কিসের!

মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিলাম। স্মরজিতের সান্নিধ্যে নিজের প্রকৃত অবস্থা ভুলিয়া যাই, বিনয়বাবুর সম্মুখে আসিলে নিজেকে চিনিয়া সঙ্কুচিত হইয়া পড়ি। এবং সেই কারণেই হয়ত বা লোকটিকে আমি মনেপ্রাণেই অপছন্দ করি।

বিনয়বাবু বলিতে লাগিলেন, কাল পরশুর মধ্যে কর্ত্তা এসে পড়বেন, মেজ বৌরাণী যদি অভিযোগ করেন—আমরা কি উত্তর দেব বলুন তো? একটু থামিয়া সহসা প্রসঙ্গ পাল্টাইয়া কহিলেন, আপনারা বুঝি একখানা মাসিকপত্র বার করেছেন—বালিগঞ্জ থেকে? সেইখানেই বুঝি ছিলেন এতক্ষণ?

হাঁ। কোনমতে ঘাড় নাড়িয়া জানাইলাম।

কিন্তু সেখানেই বা এত রাত হবে কেন? সন্ধ্যার পর তো আপনাদের আপিস খোলা থাকে না।

না। অন্য এক জায়গা হয়ে আসছি।

ও, তাই বলুন। সেখানে কি বিশেষ দরকার ছিল?

বিশেষ দরকার নয়, রেবা দেবী বলেছিলেন—

ওহো, রেবাদের বাড়িতে বুঝি?

ওইখানেই বটে।

তার বাবা জ্যোতিষ চর্চ্চা করেন। তাঁকে হাত দেখাতে গিয়েছিলেন বুঝি?

এই সব ব্যক্তিগত প্রশ্ন ভাল লাগিতেছিল না। নিস্পৃহ কণ্ঠে জবাব দিলাম, ঐ রকম একটা কিছু।

বিনয়বাবু আমার বিরক্তি বুঝিয়া কহিলেন, তা আপনাদের মাসিক-পত্র আমায় দেখালেন না তো? আমিও কিছু কনট্রিবিউট করতে পারতুম।

আপনি তো বাংলা লেখেন না।

লিখি—তবে সাহিত্যের ভাষা আমার দুরস্ত নয়। বেয়ার ফ্যাক্টস্ নিয়ে আমার কারবার।

খানিক থামিয়া বলিলেন, অবশ্য যদি রাজনীতির কোন অংশ থাকে—আমায় জানাবেন। ওটা আমার ভালমত রপ্ত আছে! মিঃ দাশের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে—ওঁর রিপোর্ট লিখে লিখে—বুঝলেন না?

আচ্ছা—জানা রইলো। আসচে মাস থেকে—একটা ফরমা, বোধ হয় রাজনীতি সম্বন্ধে থাকবে।

থাকবে? বেশ, বেশ! যদি রিভলিউশনারি কিছু থাকে তাও জানাবেন। সন্ত্রাসবাদটাই হলো আসল—রাজনীতিতে অহিংসা টহিংসা আবার কি! কি বলেন? সোনার পাথরবাটি! বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

চট্ করিয়া মনে হইল, লোকটা আমায় প্রতারণা করিতেছে না তো? আমি যাহা কল্পনা করি নাই—তেমন কথা উনি বলেন কি করিয়া? সাবধানে কথাবার্ত্তা কহাই উচিত। গোয়েন্দা না হউন—একটা মতবাদের মধ্যে জড়াইয়া ফেলিয়া এ বাড়িতে আমার সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ ধারণাও তো অনায়াসে গড়িয়া তুলিতে পারেন।

বলিলাম, হিংসানীতি আমি সমর্থন করি না। মহাত্মা গান্ধীর ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে।

গান্ধী! ওই—বণিক মহাজন! জানেন দেশের লোকের মাথায় হাত বুলিয়ে মহাত্মা সেজে উনি কি সর্ব্বনাশটা আমাদের করছেন! সারা জাতটাকে অহিংসার মন্ত্র দিয়ে ক্লীব বানিয়ে দিলে মশাই!

অহিংসার শক্তিকে আপনি অস্বীকার করেন?

সবাই করে। ইহুদীদের অহিংস অসহযোগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা কি বলেছিল জানেন তো? নাৎসী কোঁৎকা দেখলে—আর ওসব জারি-জুরি চলে না। স্রেফ ঘাড়টি ধরে পগার পার করে দেবে—কার সঙ্গে অসহযোগ করবে শুনি?

তর্ক করিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া বলিলেন, ওসব চলে না। শক্তিই হলো আসল।

বলিলাম, পশুশক্তির চেয়ে দেবশক্তি কি উৎকৃষ্ট নয়?

তপস্যার যুগ আর নেই—সুপ্রিয়বাবু। মাইট এসার্ট না করতে পারলে কোন ফল নেই। অমন যে কাল মার্কসের নীতি—তাও গায়ের জোরে—চালাতে হয়েছে—পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাটা আকাশ থেকে পড়েনি। আর—বলছিই বা কাকে। আপনারা মাষ্টার মানুষ—মার্কসও জানেন, ডেমোক্রেসিও বোঝেন।

না, মার্কসের বই আমি পড়িনি।

একথাটা এযুগে আমায় বিশ্বাস করতে বলেন? অশিক্ষিত মজুরগুলো—তাঁর স্লোগান আউড়ে পথ দিয়ে শোভাযাত্রা করে চলে—আর মাষ্টার মানুষ আপনি মার্কস বোঝেন না? হাসালেন!

হাসি থামিলে বলিলেন, স্ট্যালিনের চেয়ে ট্রট্স্কিকে আমার ভাল লাগে। ওয়ার্লড রিভলিউশন। এ না হলে মানবজাতির মুক্তি কিসে! আমি তো জানি—স্বরজিৎবাবুরা সোভিয়েট-নীতির সমর্থক। নয় কি?

আপনি জানেন, আমি জানি না।

জানেন না? আচ্ছা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন। বলশেভিক মুভ্মেণ্ট না থাকলে কি কার্ল মার্কস ঠাঁই পেতেন রাশিয়ায়! লেনিন—আহা কি জীবন! এমন জীবনলাভ করতে লোভ হয় না কি? আগ্রহভরে আমার পানে চাহিলেন।

কোন উত্তর না দিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম।

উঠছেন? আচ্ছা আটকাবো না আপনাকে। আমার পিছু পিছু আসিতে আসিতে বলিলেন, আমাকে আপনার বন্ধু বলেই জানবেন: প্রত্যেক তরুণ—এযুগে প্রত্যেক তরুণের বন্ধু। প্রত্যেকেই নির্য্যাতিত—প্রত্যেকের মনেই আগুন জ্বলছে।

উত্তর না দিয়া চলিতে লাগিলাম।

একটা কথা চুপি চুপি বলি আপনাকে। এ বাড়ির মব্র্যাল—ওর নাম কি নৈতিক আবহাওয়াটা খুব ভাল নয়। রাত্রির ডান্স-টান্স গুলো এড়িয়েই চলবেন।

ফিরিয়া দৃঢ়স্বরে কহিলাম, আপনি আমার চরিত্রে সন্দেহ করেন নাকি?

হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া তিনি বলিলেন, আরে, না, না, তা নয়। চরিত্রবল আপনার যথেষ্ট—তবু মেয়েরা ওর নাম কি—

দ্রুতপদে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিলাম।

ইলা বসিবার ঘরে হয়ত আমারই অপেক্ষা করিতেছিল। আমাকে দেখিয়া কহিল, উঃ—কতক্ষণ ধরে যে বসে আছি আপনার অপেক্ষায়!

কেন—কেন?

আজ আপনাকে একটা নতুন জিনিস দেখাব বলে। আঃ, আর একটু আগে যদি আসতেন!

চেয়ারে বসিয়া বলিলাম, আমার অদৃষ্ট।

আমারও। কাল রাত্রির আর একটা আন্তরিক ধন্যবাদ পাওনা ছিল আপনার। পেলে খুসীই হতেন।

একটা ধন্যবাদই আমায় যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে—মিস দাশ।

তা জানি। আজ কি আর একবার বাইরে যাবার সুবিধা হবে আপনার?

আজ! কোথায়? বিনয়বাবুর সন্দেহটা মনে না উঁকি মারিয়া পারিল না!

যদি বলি, গ্রেট ঈষ্টার্নে 'কাবারে ডান্স'এ।

সত্যই কি তাই?

যদি বলি, লেকে একটা চক্কর দিয়ে আসা যাক।

না, মাপ করবেন আমায়। আজ আমি বড় শ্রান্ত। চেয়ারের পিছনে মাথা হেলাইয়া শ্রান্তির অভিনয় করিলাম।

ইলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

চক্ষু বুজিয়া কহিলাম, হাসলেন যে?

এমনি। রাত নটা বাজেনি—এর মধ্যে এত শ্রান্তি! পরে কণ্ঠে অনুনয় ঢালিয়া কহিল, চলুন না—কার্নিভালে যাওয়া যাক।

কার্নিভালের নামে সোজা হইয়া বসিলাম। রেবা ও স্মরজিৎকে সেখানকার প্রমোদ-উল্লাসের মধ্যে কল্পনা করিয়াছিলাম—প্রত্যক্ষ করিতে আগ্রহ হইল বৈকি। কিন্তু আমার পাশে ইলাকে দেখিয়া নৈশ প্রমোদক্ষেত্রে স্মরজিৎ কি সুখী হইতে পারিবে? ক্ষণিকের উৎসাহ—নিমেষেই লোপ পাইল। চেয়ারের পিঠে আবার মাথাটা এলাইয়া দিলাম।

ইলা আমার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া কহিল, রাজী নন?

স্মরজিৎবাবুরা ওখানেই আছেন হয়ত। মৃদুস্বরে বলিলাম।

কাকা! কার্নিভালে গেছেন? এখনই আপনার খাবার পাঠিয়ে দিচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যে রেডি হয়ে নিন।

ইলা চলিয়া গেলে—ধীরে ধীরে আমার লুপ্ত উৎসাহ ফিরিয়া আসিল। বিনয়বাবুর কুৎসিত ইঙ্গিত মনের কোথাও শিকড় গাড়িতে পারে নাই। প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ—একপক্ষ যদি ইচ্ছা করিয়াই ভুলিয়া যায়, অন্যপক্ষের সাধ করিয়া মনে রাখিবার এত কি দায়! চিরদিনের নহে বলিয়াই তো এই ধনীবাঞ্ছিত মুহূর্ত্তগুলিকে লোলুপের মত আত্মসাৎ করিতে চাহিতেছি। হয়ত আমি সচেতন আছি, কিন্তু অন্য একটা বিরুদ্ধ শক্তির ক্রিয়াকে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছি না। এই বিলাস-বাহুল্যের ধাঁধায় দৃষ্টি আমার আবিল হইয়া উঠিতেছে। নতুবা অতুলদার মেসে গিয়া সেখানকার রিক্ততা ও দৈন্য আমাকে পীড়া দিল কেন? মার্জ্জিত রুচির নামে পরিবর্দ্ধিত বিলাসকেই ভালবাসিতেছি। বুঝিতেছি এ উচিত হইতেছে না, তবু সৌন্দর্য্যধর্ম্মী মন—রোমান্স-পিপাসু যৌবন—ঐশ্বর্য্যবঞ্চিত লোলুপতা—আমায় প্রচণ্ড বেগে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে!

কার্নিভালে—এই মদ-মত্ততার উৎসবই দেখিলাম। সমুদ্রের ফেনার মত পুঞ্জিত বিলাস এখানকার ঐশ্বর্য্য। এত আলো, এত চাঞ্চল্য, এত তারল্য—শহর যেন আকণ্ঠ সুরা পান করিয়া এই উৎসব ক্ষেত্রটিকে বমনপাত্র মনোনীত করিয়াছে। নাগরদোলায় যুগলে বসিয়া অর্দ্ধ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায়—হাসিতে উপচিয়া উঠিতেছে, ছুইপের যাত্রীরাও সেই উন্মাদনায় অস্থির। উপর হইতে গড়াইয়া পড়ার খেলাটিতেও আশ্লেষানন্দ যথেষ্ট। একটি রাত্রিকে নিঃশেষে পান করিবার—কি

অধীর আগ্রহ! একই সঙ্গে মনে উত্তেজনা জাগিল এবং অবসাদ আসিল।

আঘাত আসিল আর একটু পরে। স্মরজিৎ বা রেবার চিহ্ন কোথাও ছিল না। আমার দৃষ্টি তাহাদেরই খুঁজিতেছিল, ইলার দৃষ্টি ছিল অন্যদিকে।

হ্যালো—মিস দাশ—

ফিরিয়া দেখি—সুবেশ—সুসজ্জিত এক তরুণ হাসিমুখে আমাদের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

সুকুমার সেন—সুপ্রিয় রায়।

ইলা আমাদের পরিচয় করাইয়া দিল। মুখখানা আমার বিশেষ উজ্জ্বল হইল না, আরসী না থাকিলেও বেশ বুঝিতে পারিলাম। তবু হাসিলাম!

সুকুমার বলিল, আজ আটটা পর্য্যন্ত আপনার জন্য অপেক্ষা করে ছিলাম সুপ্রিয়বাবু।

ইলা বলিল, ইনিই সেই আশ্চর্য্যবস্তু—তাইতো টেনে নিয়ে এলাম ভদ্রলোককে।

কিন্তু আমার সঙ্গে আলাপ করে উনি নিশ্চয় আশ্চর্য্য হন নি।

আনন্দিত হয়েছি।

রীয়্যালি? থ্যাঙ্ক ইউ। আসুন না—হুইপটায় একটা ট্রায়াল দেওয়া যাক।

ইলা সত্রাসে বলিল, মাপ কর। টার্ন নেবার সময় এমন মাথা ঘুরে ওঠে!

আমরা তো থাকব। না হয় চোখ বুজো।

না, না, তার চেয়ে নাগরদোলায় চড়িগে।

ওর মধ্যে থ্রিল নেই—সেন্‌সেশন নেই। ঘুম এলে ওতে গোটাকতক পাক দেওয়া যেতে পারে। কি বলেন সুপ্রিয়বাবু?

আমার কিন্তু সত্যিই ঘুম আসছে। নিরুৎসাহিত কণ্ঠে বলিলাম।

আপনি ঠাট্টা করছেন। ইলা বলিল।

সত্যি নয়। আপনি যদি জানতেন আজ সারাদিন কি খাটুনি আমার গেছে।

সরি—সুপ্রিয়বাবু। চলুন আমরা ফিরে যাই।

সুকুমারের মুখ ম্লান হইয়া গেল। হাতের কব্জি উল্টাইয়া সে কহিল, এখনও দশটা বাজে নি।

আমি তাড়াতাড়ি বলিলাম, আপনারা এত শীঘ্র যাবেন কেন।

ইলা বলিল, সে হয়না সুপ্রিয়বাবু। আপনাকে সঙ্গে এনে ছেড়ে দেওয়া! মাথা নাড়িয়া বলিল, আউট অব্‌ এটিকেট।

বলিলাম, আমার সঙ্গে তো নতুন পরিচয় নয়—ঠিক জানবেন, আমি কিছু মনে করব না। উহাদের অভিবাদন করিয়া দ্রুতপদে অগ্রসর হইলাম।

সুকুমার দ্রুত আসিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল, উনি নতুন না হতে পারেন—আমি তো নতুন।

হাসিয়া বলিলাম, না—ইলা দেবীর সম্পর্কে আপনিও নতুন নন।

সুকুমার সোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, আপনি জানেন?

ঘাড় নাড়িয়া কার্নিভাল ত্যাগ করিলাম। জানিতাম না, এখন জানিলাম। এবং এই জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল, রুগ্ন—বিকৃত উত্তেজনাপ্রবণ কলিকাতা প্রবলবেগে ওখানে বমন সুরু করিয়া দিয়াছে।

রাত্রির আকাশের রূপবিস্তারের মধ্যে আবার নিজেকে ফিরিয়া পাইলাম। ভালবাসার বিনিময় করিয়া ওই আকাশ ও এই রাত্রি অসংখ্য-বার হয়ত বা শহরকে স্পন্দিত করিতে চাহিয়াছে। এক দীঘি জলের মধ্যে থাকিয়াও পদ্ম পাতায় যেমন জলের দাগ লাগে না, তেমনই নরনারীর হৃদয়-বিনিময়-মুহূর্ত্তে শহরের অঙ্গে শিহরণ জাগে না। শহরকে ভাল-বাসিতে আরম্ভ করিয়াছি—শহর হইবার সাধনা কি এতই দুষ্কর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

শীতের রৌদ্র বলিয়াই বুঝি—উত্তাপটা তেমন প্রখর হয় নাই। তন্দ্রাচ্ছন্ন সন্তানের গায়ে মাতৃপাণির মৃদু চাপড়ের মতই রৌদ্রের এই সুকোমল স্পর্শ। রাত্রি জাগরণ-জনিত আলস্যের বোঝাটাও ছিল ভারি। যে কর্ত্তব্যত্রুটির জন্য কাল মৃদু ভৎর্সিত হইয়াছিলাম—আজ প্রভাতেও সেই অপরাধ করিতেছি এ জ্ঞান ছিল না। শীতের সুখশয্যায় এক চোখ তন্দ্রা লইয়া সে জ্ঞান থাকাও শক্ত! দুয়ারে ধাক্কার শব্দে বিরক্তি বোধ করিলাম। চোখ চাহিতেই বিরক্তির স্থলে কর্ত্তব্য দেখা দিল। বাহিরের রৌদ্রের পানে চাহিয়া কিছু আত্মগ্লানিও হয়ত অনুভব করিলাম। তাড়াতাড়ি দুয়ার খুলিয়া ছাদের উপর আসিলাম।

বই ও খাতা হাতে আমার ছাত্রছাত্রী দাঁড়াইয়া আছে।

তরু অরু—লক্ষীটি, চেয়ার নিয়ে বোস, আমি চট্ করে মুখ ধুয়েই আসছি।

তরু বলিল, আসুন, আপনাকে একটা মজার খবর দেব।

ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সামনে বসিয়া বলিলাম, কি মজার খবর?

অরু ফস্ করিয়া বলিল, আজ সকালে পিসিমা এসেছেন।

তরু তাহার পিঠে একটা চাপড় মারিয়া বলিল, মুখপোড়া ছেলে—তুই বললি যে!

অরুও প্রহারোদ্যত ভঙ্গিতে দাঁড়াইয়া বলিল, বেশ করলুম। এ্যাইসা গাঁট্টা লাগাব!

তাহাকে শাসন করিলাম, ছি, অরু!

আপনি আমায় বকছেন, আর ওযে মারলে,—জামার হাতায় চোখের জল মুছিতে গিয়া বাকি কথাটা তাহার আর বলা হইল না।

তরুকেও শাসন করিলাম।

সে দমিল না। সতেজ কণ্ঠে কহিল, পিসিমা আমায় বলতে বললেন যে। এই দেখুন না—তাঁর চিঠি। আমার হাতে অকাট্য যুক্তি সঁপিয়া দিয়া গর্ব্বিতভাবে ছোট ভাইটির পানে চাহিল।

অতঃপর অরুকে সান্ত্বনা দিয়া পত্রপাঠ করিলাম।

আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলাম, এতো পত্র নয়—দৈবপ্রেরিত সান্ত্বনা। কাল বিনিদ্র রাত্রিতে আকাশের পানে চাহিয়া যে যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি,—আজ প্রভাত অপরূপ স্নিগ্ধতায় সে ক্ষতে প্রলেপ লাগাইয়া দিল। নারীকে ঠিক ভালবাসিয়াছি কিনা জানি না, যন্ত্রণার তো লাঘব তাহাতে একটুও হয় নাই। ইলাকে পাওয়ার আশা আমার মনে ছিল না, তবু চ্যাণ্ডোয়ার একটি রাত্রিতে যে প্রত্যাশা নিবিড় সুখে বর্ণরঞ্জিত হইয়া মনকে আকাশমুখী করিয়াছিল, কার্নিভালের কঠিন ভূমিতে নামিয়া তাহার আসল রূপটির সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলেও—প্রত্যাশা কোথায় লাগিয়া ছিল, বেদনাও বাড়িতেছিল।

আমার প্রণয়গর্ব্ব আহত হইয়া এমন যন্ত্রণার সৃষ্টি করিয়াছিল, না, তরুণ মনের আত্মম্ভরিতার অপমৃত্যুতে এই শোক? স্বপ্নের ঘোরে কতবার ইহাকেই প্রকৃত ভালবাসা বলিয়া আবৃত্তি করিয়াছিলাম:

True love in this differs from gold and clay,

That to divide is not to take away?

মনে মনে প্রণাম করিয়া বলিয়াছিলাম, হে অমর কবি, তুমি শুনেছিলে মানুষের শাশ্বত বৃত্তির সন্তর্পিত পদধ্বনি। তুমি পেয়েছিলে সান্ত্বনা। হে শেলি, তুমি মৃত্যুঞ্জয়। পৃথক সত্তাতেই তো চির বিদায়ের পথে প্রেমের তিরোভাব ঘটে না। প্রথম বেদনার মধ্যেই তার অনুভব—সমগ্র জীবনে তার ব্যাপ্তি। পাত্র পরিবর্ত্তিত হয় না—নব সূর্য্যকিরণে সে অনুরঞ্জিত হইয়া থাকে।

খানিক পরে অরু বলিল, মাষ্টার মশায়, আজ আমাদের সকাল সকাল ছুটি দিন না।

না। কাল পরশু দু'দিন তোমাদের ভাল পড়া হয় নি।

বাঃ রে, কতটা এগিয়েছে দেখুন না।

আপনি আপনি পড়া তৈরী করেছ?

তা কেন? মা কিছু বলে দিলেন, দিদি কিছু বলে দিলেন।

আমি পড়াই নি বলে তোমার মা কিছু বলেন নি?

তরু বলিল, না তো। মা বরঞ্চ বললে, তোদের মাষ্টার মশায়ের যে কদিন শরীর খারাপ থাকে—আমার কাছে পড়া বলে নিস।

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, আমার শরীর খারাপ একথা তাঁকে কে জানালে?

বাঃ রে, আপনি পড়াতে পারলেন না—শরীর খারাপ নয় তো কি! আমাদের শরীর খারাপ হলে আমরা ইস্কুলে যাই!

স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ প্রয়োগের অপেক্ষা রাখে না। ছাত্র-ছাত্রীর উপর খুসী হইয়া তাহাদের ছুটি মঞ্জুর করিলাম। বলিলাম, বিকেলে ঠিক সময়ে আসবে কিন্তু।

হুঁ। ঘাড় দোলাইয়া তরু বলিল, ছোট পিসিমা আপনাকে খাবার নেমন্তন্ন করেন নি? এখনই মুকি আসবে'খন।

নাচিতে নাচিতে তাহারা চলিয়া গেল।

বিনয়বাবুকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলাম, তবু কর্ত্তার কাছে একটা মন-গড়া কৈফিয়ৎ খাড়া করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। খানিকপরে দুর্ব্বল কৈফিয়ৎকে এক পাশে ঠেলিয়া দিয়া দিদির কথাই ভাবিতে লাগিলাম। তাঁহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মন বড় ব্যাকুল হইল। কেন এমন হয়? কাল রাত্রির আঘাতের পর চোখের জল মুছিবার জন্য এমনই এক টুকরা শুভ্র অঞ্চলের প্রয়োজন হয়ত আমার আছে। এ ব্যথা দিদির কাছে মেলিয়া ধরিবার নহে—তবু দু'একটি স্নেহগর্ভ কথা না শুনিলে নিশ্বাস সরল হইবে না।

খানিক পরে স্মরজিৎ আসিল। আমার পানে চাহিয়া কহিল, আপনার কি অসুখ করেছে সুপ্রিয়বাবু?

কৈ না ত! কাল খানিকটা রাত জাগা হয়েছে, তাই।

আমিও তো সারা রাত হৈ হৈ করে এলাম। আবার সকাল বেলায় খবর পেয়ে বাবাকে আনতে হাওড়া ষ্টেশনে গেছলাম।

এই স্মরজিৎই ম্লানমুখে পরশু মুক্তির উল্লাস-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিল। বড় ইচ্ছা হইল, উহাকে একবার জিজ্ঞাসা করি—বন্ধনের দারুণ জ্বালার মধ্যে সারারাত্রি জাগরণেও মুখের সজীবতা কি করিয়া এমন অম্লান থাকে? কিন্তু থাকে। একটি জিনিস জীবনীরসের ঔজ্জ্বল্যে মানুষের মুখকে কমনীয় করে। শুধু একটি জিনিস।

তাই কি সত্যদ্রষ্টা বলেন :

Faces are but a gallery of pictures when there is no love?

স্মরজিৎ বলিল, কি ভাবছেন? আমার কথা বিশ্বাস করছেন না।

বলিলাম, কিন্তু আপনারা তো কার্নিভালে ছিলেন না?

কার্নিভালে আমাদের খোঁজ করেছিলেন নাকি?

হাঁ। রেবার মাসীমা বললেন—

ওহো, বুঝেছি। প্রথমটা কথাও ছিল তাই। এসেছিলাম—সহ্য করতে পারলাম না, সুপ্রিয়বাবু। খানিক পরে বুঝলাম—মনের মধ্যে যখন কলরব ওঠে—তখন বাইরের কোলাহল সে চায় না। সে চায় নির্জ্জনতা।

কিন্তু মনের কোলাহল বাইরে না ছড়িয়ে দিলে—খানিক হৈ হৈ না করলে ভাল লাগবে কেন?

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, যদি কিছু মনে না করেন—একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব?

স্মরজিতের জিজ্ঞাসার রূপটি ঠিক স্পষ্ট না হইলেও—ইঙ্গিতটি যেন বুঝিলাম। ঢোক গিলিয়া বলিলাম, বেশ ত—জিজ্ঞাসা করুন।

সস্মিত মুখে আমার পানে চাহিয়া সে কহিল, আপনি বোধ হয় কাউকে ভালবাসেন নি। মানে কোন মেয়েকে।

যদি বলি, না।

সম্ভব। তাহলে কার্নিভালের চেয়ে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-সৌধের মাঠ বেছে নিতেন। ভালবাসা হাটের গোলমাল থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়।

আর যদি বলি—ভালবাসার ধর্ম্ম সঙ্কীর্ণতা নয়, বিস্তৃতিতেই তার স্ফুরণ।

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, এইতেই প্রমাণ হ'লো আপনি ভাল-বাসেন নি।

কি প্রমাণ?

ভালবাসা বিস্তার চায়—সে কখন? যখন ভালবাসার পাত্র দূরে। সে কাছে থাকলে সঙ্কীর্ণতাই তার ধর্ম্ম। 'মিলনে নিখিল হারা—বিরহে নিখিলময়।'

তাহ'লে ভালবাসাকে উচ্চবৃত্তি বলব না।

স্মরজিৎ হাসিমুখে বলিল, সব জিনিস নিয়ে তর্ক চলে—এইটি শুধু সব তর্কের নিষ্পত্তি করে দেয়। যে এত সঙ্কীর্ণ ও এত ব্যাপক, যে একই সঙ্গে দাহন করে ও আনন্দ দেয়—তা যে মানুষের দ্বৈতধর্ম্মী স্বভাবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঐশ্বর্য্য। ইচ্ছে করলে মানুষ সারা জীবন তর্ক করতে পারে—ভালবাসা অর্জ্জন একটা শুভক্ষণের দৈবঘটনা।

নিজের সঙ্গে তুলনা করিলাম। প্রভেদটা স্পষ্ট হইল না। তবে ইলা আর সুকুমারের ভালবাসা কেমন? উহারা কোলাহল-মুখর প্রমোদক্ষেত্রেই সে অমৃত আস্বাদের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। অন্তরের ঐশ্বর্য্য ছিল না বলিয়াই কি বাহিরের জাঁকজমকে সে দৈন্য ঢাকিবার প্রয়াস?

স্মরজিৎ বলিল, তারপর শুনুন। কার্নিভাল থেকে গেলাম স্মৃতি-সৌধের মাঠে। আশ্চর্য্য ছিল কালকের জ্যোৎস্না-রাত্রি। শীতকালের ধোঁয়াটে জ্যোৎস্না নয়—ঠিক যেন শরৎকালের আকাশ।

সত্য বলিতে কি, কপিশ জ্যোৎস্নায় ভরা গতকালের রাত্রিকে আমার কুৎসিততম মনে হইয়াছিল।

দু'জনে ঘাসের ওপর বসলাম। ভিজে—নরম ঘাস—আমাদের মনের মতই নরম। রেবা কোন কথা বললে না, আমিও না। শুধু ওর

একখানা হাত আমার মুঠোর মধ্যে ছিল। কিছু না বলেও আমরা পরস্পরকে ফিরে পেলাম।

হঠাৎ বলিলাম, আবার বন্ধনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন?

হাঁ—বন্ধন। কিন্তু ওখানেই যে মুক্তি ছিল—তা আগে বুঝি নি। একটু থামিয়া বলিল, একেবারে কথা বলিনি—তা নয়। মনে নেই কি বলেছিলাম, অথচ সে সামান্য কথা বলতে এত ভাল লাগছিল!

সারারাত কাটালেন ওখানে?

তাই কি সম্ভব! স্মরজিৎ হাসিল। রেবার বাড়িতেই গেলাম। ওর পড়বার ঘরে গিয়ে ব'সলাম। শেলি, ব্রাউনিঙ্ আর রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করে রাত কেটে গেল।

রেবার বাবা কিছু বললেন না?

পরের ভাগ্যের ভাবনায় নিজেই তিনি সারারাত ঘুমোতে পারেন না। আর মাসীমা—ঘুমকাতুরে। একজন সারারাত জেগেই—বাড়িতে কি হচ্ছে ভুলে রইলেন—আর একজনের ঘুম এমন গাঢ় যে নিজেদেরই রান্নাঘর থেকে খাবার বেড়ে নিতে হ'লো। স্মরজিৎ হাসিতে লাগিল।

আমি সহসা বলিলাম, আপনার বাবা কি এখন ঘুমুচ্ছেন?

না, না, দিনের বেলায় তিনি কখনও ঘুমোন না। এইমাত্র চা খেয়ে বেরুলেন।

ওঃ।

আজ বিকেলে প্রতিবাদ আপিসে যাচ্ছেন তো?

কর্ত্তা কিছু মনে করেন যদি?

বাবা! কিছু ভাববেন না, ওঁর চেহারাটাই যা ভয়-দেখানো গোছের, আসলে এ বাড়ির টিকটিকিটি পর্য্যন্ত ওঁকে ডরায় না।

সে ও ভাল নয়।

কি ভাল নয় সুপ্রিয়বাবু? কর্ত্তা যদি রাশভারি হন—সেটা কি সংসারের পক্ষে ভাল?

একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা থাকে।

সে থাকে বাইরে। মনকে পঙ্গু করে যে শাসন—তা উনি পছন্দ করেন না। আশ্চর্য্য মানুষ উনি। আমরা দোষ করলে তিরস্কার করেন না, ভাল কাজ করলে প্রশংসা করেন না।

তাহলে আপনাদের অসুবিধা কিছু নেই।

ওই তো মুশকিল। মন্দ কাজ করে তাইতো আমরা নিজে নিজেই পীড়িত হই। কেউ বকলে মন্দ কাজ করার দায়িত্ব অনেকটা হাল্কা হয়ে আসে নাকি? তাঁর চরিত্র সমালোচনা করে নিজের দুর্ব্বলতাকে পোষণ করবার একটা যুক্তিকেও খাড়া করতে পারি।

না শাসন করার দরুণ উচ্ছৃঙ্খলতা বেড়ে যায় না কি?

শাসন করে সময়কে কেউ পিছু হটাতে পারেন? একটা দৃষ্টান্ত এইমাত্র দিয়েছি সুপ্রিয়বাবু? কাল সারারাত্রি আমি যে বাইরে রইলাম—সেটা সংসারের পক্ষে খুব শোভন কি?

না, নয়।

অথচ সেই বাইরে থাকায় সংসারের লৌকিক আচার ছাড়া আর কোন দিক দিয়েই আমরা অপরাধী নই। লোকাচার আমাদের সৃষ্টি—ভেঙ্গে ওর নতুন রূপ দেওয়াও আমাদের সাধ্যায়ত্ত। অথচ,—একমিনিট থামিয়া সে বলিতে লাগিল, অথচ লোকাচার রক্ষা করেও কত অন্যায় যে প্রত্যহ হয় তার খবর রাখেন কি?

মাথা নাড়িলাম।

আমরা আজন্ম শহরে আছি—আমরা তো জানি কোথায় এর গলদ। লোকাচারের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হবার সুযোগই বরং যথেষ্ট। আর একটু

খোলসা করেই বলি। বাড়িতে অনুমতি নিয়ে—সিনেমায় যাওয়া যায়, থিয়েটার কার্নিভ্যালে যাওয়া যায়, ফুটবল ক্রিকেটে যাওয়া বা মাঠে বেড়ানো চলে, কিংবা মোটরে করে কাউকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়াও অশোভন নয়। অনুমতি নেওয়া আছে—কাজেই বিবেকের দায় থেকে মুক্ত। এতবড় শহরে ওটুকু সময়ের মধ্যে নীতিকে অগ্রাহ্য করা কি খুবই শক্ত ব্যাপার?

বুঝেছি। বলিয়া নিজের মনেই শিহরিয়া উঠিলাম।

তবে? যার মধ্যে খারাপ হবার সম্ভাবনা প্রচুর—কোন বাঁধনই তার পক্ষে কঠিন নয়। শক্ত বেড়ার ওপারে সতেজ নটেগাছে ছাগলের মুখ পৌঁছয়—সে কথা রূপকথার শেষে ঠাকুরমার মুখে শোনেন নি কোন দিন? বালিগঞ্জ আপনি দেখেছেন—কিন্তু ঠিকমত ওকে চেনেন নি।

হয়ত কিছু চিনেছি—মাঝে মাঝে দু' একটা কেস যা কাগজে ওঠে—

স্মরজিৎ হাসিয়া বলিল, সে তো নেহাৎ বর্ষাদিনে মোটরের চাকায় ছিট্‌কে-ওঠা কাদা। সারা বছরের তুলনায় বর্ষাকাল কতটুকু, কতটুকুই বা শহরের পিচ-বাঁধানো রাস্তায় কাদা জমে? একটু থামিয়া বলিল, কাল রাত্রিতে আমিও অন্যায় করতে পারতাম—কৈফিয়ৎ নেবার কেউ ছিল না যখন। তবু—তা পারিনি। অমন সুন্দর রাতে শেলি, ব্রাউনিঙ্‌ রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছাড়া উপভোগের পরম বস্তু আর কি-ই বা ছিল! দু'জনের কাছে দু'জনে মাথা তুলে দাঁড়াবার মত নির্ভরতা আমরা হারাব কেন? যে প্রেম মহৎ—তাকে টেনে ধুলোয় নামাব কোন্‌ দুঃখে?

স্মরজিতের কথাগুলি আদর্শবাদের দিক হইতে প্রশংসনীয়, বাস্তবে ওর মতামতকে মূল্য দেওয়া কঠিন। প্রেম কি শুধুই বৃন্তহীন পুষ্প? কামজ বৃন্ত না থাকিলে ফুল বিকাশলাভ করিত কোন আশ্রয়-ভূমির

উপরে? মৃত্তিকার মধ্যে লয় হওয়ার আকর্ষণ আছে বলিয়াই না—স্বর্গের তপস্যায় সে অনন্তকালের জীবন লাভ করিতে পারিল না। মাছের চোখের পলক নাকি পড়ে না, নিদ্রার মধুর স্বাদ মাছেরা কি বুঝিবে?

স্মরজিৎ বলিল, আপনি হয়ত বলবেন ভাল হওয়াটা দৈবঘটনা।

না, তা বলব না। মন্দ হওয়াটাও যখন দৈবের উপর নির্ভর করে না।

স্মরজিৎ বলিল, প্রত্যেক মানুষের মনের গঠন আলাদা—স্বতন্ত্র তার বুদ্ধিবৃত্তি—তার উপভোগ-তৃষ্ণা। বাবা একথা প্রায়ই বলেন, আত্মরক্ষার অস্ত্র সৃষ্টিকর্ত্তা অসহায় প্রাণীদের দিয়েছেন—আর মানুষকে দেন নি এতবড় অসামঞ্জস্য বিশ্ববিধানে হয় না। নিজেকে ইচ্ছে করলেই আমরা বাঁচাতে বা নষ্ট করতে পারি।

স্মরজিৎ যেন তর্ক করিবার জন্যই ভাল করিয়া আসন গ্রহণ করিল. আমার তর্কস্পৃহা রহিল না। আমার মনের মধ্যে কার্নিভালের নাগর-দোলা একটানা ঘুরিয়া চলিয়াছে। সব মানুষের প্রকৃতি সমান নহে বলিয়াই তো স্মরজিৎরা ওখানে মন বসাইতে পারিল না, ইলারা উহারই আলোয় ও গতিবেগে তন্ময় হইয়া গেল। স্মরজিতের প্রয়োজন ছিল আকাশের বিস্তৃতি—আদর্শবাদের উপযোগী কাব্যিক পরিবেশ, ইলা চাহিয়াছিল মৃত্তিকার গণ্ডি—বাস্তববাদের অনুযায়ী স্বয়ংসম্পূর্ণ অবসর।

আমার অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া স্মরজিৎ কহিল, আজ বিকেলে যাবেন তো তাহলে?

দেখি।

হাঁ—ভালকথা, রিণি কি করেছে জানেন? কাল কলকাতা থেকে চম্পট দিয়েছে—তার মার নামে একখানা চিঠি লিখে।

বটে।

হাঁ, রেবার ওখানে আজ সকালে জানতে পারলাম। তাতে লিখেছে —কলকাতার হাওয়া তার অসহ্য হ'য়েছে—তাই চিটাগঙ্ চললেন। গান শেখবার ঝোঁক হয়েছে, কে একজন বান্ধবী তাঁকে কোন্ সুর-সাগরের সন্ধান দিয়েছেন—উনি তাঁরই উদ্দেশে—

বাধা দিয়া বলিলাম, উনি কিন্তু আমার কাছে কবিতা লেখা শিখতে চেয়েছিলেন।

বটে! এতো একটা নতুন আবিষ্কার! খানিক পায়চারি করিয়া স্মরজিৎ আমার সম্মুখে আসিয়া স্মিতমুখে বলিল, মানে বুঝেছেন? ভালবাসা।

হাসিয়া বলিলাম, কাকে ভালবাসতেন উনি?

সে কথা আর একদিন বুঝিয়ে বলব। কিন্তু জেনে রাখুন সুপ্রিয়-বাবু ও কাকেও ভালবাসতে পারবে না। ওর মত চঞ্চলা মেয়ের পক্ষে ও জিনিস সম্ভব নয়।

কেন নয়? চঞ্চল তরুণেরাই তো ভালবাসে।

ভালবাসে—কি? খেলা। শুধু—খেলা ছাড়া—

স্মরজিৎকে বাধা দিলাম, ও কথা বললে নিজেদেরই খাটো করা হয়। ভালবাসা সুচিন্তিত কোন মন্তব্য বা সুলিখিত কোন প্রবন্ধ নয়, ওটা নেহাৎই যুক্তিহীন একটা সঙ্গীন মুহূর্ত।

স্মরজিৎ সশব্দে হাসিয়া উঠিল, বেশ বলেছেন। যুক্তিহীন সঙ্গীন মুহূর্ত!

তাহার উচ্চহাসিতে অপ্রতিভ হইলাম—কিন্তু তর্ক করিলাম না। রেবার প্রেমকে আদর্শ করিয়া উনি আজ মাটির মালিন্যকে ভুলিয়া গিয়াছেন, ক্ষণভঙ্গুর বিশ্ব উঁহার দৃষ্টির ওপারে সরিয়া গিয়াছে।

আচ্ছা—আচ্ছা—ওবেলা এ তর্কের জের টানা যাবে। গুডবাই।

স্মরজিৎ চলিয়া গেলে ভাবিলাম, তর্কের জের টানিয়া আমার লাভ কতটুকু? ভালবাসি আর নাই বাসি—কাল রাত্রির বেদনা মুছিবার আয়োজন আমার ব্যর্থ হইয়াছে। স্মরজিতের উজ্জ্বল চক্ষু ও প্রসন্ন স্বর আদর্শবাদের অবাস্তবতায় সে বেদনাকে খানিক বাড়াইয়া দিল শুধু।

২

দ্বিপ্রহরে পার্টিশন-দেওয়া বারান্দায় আহার করিতে বসিয়াছিলাম। সম্মুখে তালবৃন্ত হস্তে দিদি বসিয়াছিলেন। গ্রীষ্ম কাল নহে, মাথার উপর বৈদ্যুতিক পাখাটাও ইচ্ছামাত্র ঘুরিতে পারে—তবু তালবৃন্ত হাতে করিয়া আহার্য্যের সামনে বসা মেয়েদের সযত্ন পরিচর্য্যার একটি অঙ্গ।

সেদিন হঠাৎ চলে গেলুম—তোমার সঙ্গে গল্প হলো না।

আপনি তো অনেক দেশ ঘুরে এলেন।

হাঁ, দেশ ঘোরা ছাড়া আর আমার আছেই বা কি! মৃদু একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি তালবৃন্তের গতি শ্লথ করিয়া দিলেন।

দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে যে কথা বাহির হয়—তাহার পিছনে থাকে বেদনার ইতিহাস। সে ইতিহাস না শোনাইলে মানুষের তৃপ্তি নাই, অথচ শ্রোতা পাওয়াও কঠিন। নিজের দুঃখ যেন মনের তলায় চাপিয়া বসে—শীতকালের শহুরে ধোঁয়ার মত, পরের দুঃখ তেমনি শরৎকালের লঘু মেঘের মতন উড়িয়া চলে। বিভিন্নমুখী হাওয়া স্তব্ধ হইলে তবেই বর্ষণ সম্ভব।

দেখ সুপ্রিয়, রাজার ঘরে জন্মালে মানুষ সুখী হয় না, তপস্যায় শিবের মতন স্বামী লাভ করলেও তার অভাব মেটে না।

সে কথা সত্য।

কিন্তু কেন সত্য হয় জান? আমাদের অহঙ্কার বড় বেশি—অল্পতেই ফুলে উঠি, তাই দেবতা তামাসা করে সে দর্প চূর্ণ করেন।

আচ্ছা দিদি, দর্প চূর্ণ করে দেবতার কি লাভ?

লাভ তাঁর কিছু নয়—শুধু মানুষকে শিক্ষা দেওয়া।

তিনি তাহলে একজন কড়া মেজাজের শিক্ষক?

দিদি হাসিয়া বলিলেন. যিনি পালক—তিনি শাসক তো বটেই।

আস্তিক্যবাদ আমাদের মত বয়সে সম্ভব নয়, তবু সরলবিশ্বাসী দিদিকে আঘাত দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

তাহলে দিদি, দূর থেকে ওঁকে নমস্কার করাই ভাল।

উনি তো শুধু নমস্কার-প্রত্যাশী নন। নমস্কার করেই কি বাপ ছেলের সম্পর্ক বজায় রাখা চলে? চলে না। ওঁর মত প্রেমময়—দয়াময় এ বিশ্বে কেউ নেই।

জানি সর্ব্বহারার ধ্রুব বিশ্বাসে মনের ভারকেন্দ্রটিকে অটল রাখা যায়। ঐশীশক্তি নহিলে দুর্ব্বল মানুষকে খাড়া করিয়া রাখা দায়। বয়স যত বাড়িতে থাকে, আঘাত যত অসংখ্য ও প্রচণ্ড হইতে থাকে—ঈশ্বর-অবিশ্বাসী মানুষ ততই আত্মকেন্দ্র হইতে স্খলিত হইয়া পরম আশ্বাসের এই ভিত্তিভূমিতে নিজেকে দাঁড় করাইতে চাহে। একদিন যাহা কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দেয়—অন্যদিন তাহারই ভার স্কন্ধে তুলিয়া লইয়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, বেশ এ জীবন। অবলম্বন ছিল না বলিয়া কিছুতেই সে আশ্বস্ত হইতে পারে না। সে শুধুই চলিতে থাকে, কিংবা অদৃশ্য যৌবন-শক্তি তাহাকে চালায়। যাহারা এই বিশ্বস্তভূমিতে সুখ-শয্যা পাতিয়া চলমান তারুণ্যের পানে ক্ষুব্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবে, সৃষ্টির

একি বিপর্য্যয়—তাহাদের ফুরাইয়া-আসা দিনগুলির সঙ্গে আমাদের অফুরন্ত প্রাণশক্তির যোগ কোথায়?

ওকি, সব কটি ভাত খেলে না?

না, আর পারব না। উঠিয়া পড়িলাম।

আজ খেয়েই কিন্তু যেতে পাবে না। .তোমার গল্প শুনব আর আমার গল্প শোনাব।

আমার কি গল্পই বা শোনাব আপনাকে?

কেন, তোমার মার কথা বলবে, বোনের কথা বলবে, ঘর-সংসারের কথা বলবে।

আঁচাইয়া আসিয়া খাটে বসিলাম। তিনি রেকাবে মশলা রাখিয়া বলিলেন, বল তাঁদের গল্প।

একটি লবঙ্গ মুখে ফেলিয়া বলিলাম, দুঃখের সংসার—অভাব অনটন—আপনার ভাল লাগবে না।

তিনি হাসিয়া বলিলেন, বল না। দুঃখ কি শুধু সংসারেরই আছে—মনের নেই! শেষ কথাটি তাঁহার মৃদু হইয়া মিলাইয়া গেল।

অগত্যা সে কাহিনী আরম্ভ করিলাম—তিনি মনোযোগ দিয়া শুনিলেন। কখনও তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইল—কখনও ছল ছল করিয়া উঠিল। কাহিনীশেষে বলিলেন, তোমার মা-ও দুঃখী। তবু আমার মত দুঃখ তাঁর নয়।

আপনি জানেন না দিদি, পয়সা না-থাকার কত কষ্ট।

তুমিও জানলা ভাই, পয়সা থাকার কি ব্যথা। তোমার মা দুঃখের সংসার পেয়ে দুঃখ ভুলতে পেরেছেন—কিন্তু সুখের সংসারে আমার দুঃখটা যে কত বড় হয়ে উঠেছে তা কি তুমি বুঝতে পারবে? একটু থামিয়া বলিলেন, কেউই তা বুঝতে পারে না।

আমি বুঝেছি দিদি।

না—বুঝতে পারনি। সবাই যেখানে রাজভোগ খায়—সবাই যেখানে মোটর চড়ে বেড়ায়, সবাই যেখানে থিয়েটার বায়স্কোপে আমোদ করে আসে—সেখানে একজনের না-পাওয়ার দুঃখটা ভাবতো ভাই। স্বামী সৎকাজে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন—সে গৌরবে কেন আমার বুক ভরে ওঠে না—জান? আমি—আমি গরীব নই বলে।

গরীব হলে আপনি সান্ত্বনা পেতেন?

সান্ত্বনা না পাই—খানিকটা ভুলবার সময়ও যে পেতুম। ঘুম ভাঙ্গতেই মুখের কাছে বিনা আয়াসের অন্ন—এতে কি যে অস্বস্তি! তুমি বুঝবে না, বুঝবে না, কেউ বোঝে না। তিনি দ্রুতপদে ঘরের বাহির হইয়া গেলেন।

ভাবিবার সময় হইল না, স্তম্ভিত হইয়াই রহিলাম। ঐশ্বর্য্য থাকিলে মনকে সমব্যথাতুর করিয়া তোলা হয়ত সম্ভব ছিল, কিন্তু তাঁর বেদনা শরতের মেঘের মতই শূন্যে ভাসিতে লাগিল—কোথাও ছুঁইতে পারিল না।

অবিলম্বে তিনি ফিরিয়া আসিলেন ও হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, বাইরে গেলে মনে হয় কি জান? আমি দূরে চলেছি—তিনি নিকটে রয়েছেন। এইখানে তিনি দেহরক্ষা করেছিলেন—তাই এখানেই তাঁর মৃত্যুটা সত্য বলে বিশ্বাস হয়। বাইরে গেলে মনে হয়—তিনি মরতে পারেন না। এই বাড়ির আর কোথায় লুকিয়ে আছেন। অনেকদিন তো লুকিয়ে ছিলেনও জেলে।

জেলে!

তাই তো ভাবি ভাই, কিছুরই অভাব ছিল না তাঁর—তবু কেন সাধ করে লাঞ্ছনা সহ্য করলেন—কেন তাতেই প্রাণ দিলেন!

দেশকে ভালবাসতেন বুঝি ?

আমাকেও কম ভালবাসতেন না। তবু মন তাঁর পূর্ণ ছিল না তাতে। এক একটা মনের এমনি ধারা—এমনি ফাঁক। সাধারণের সামান্যে যা ভরে—ওঁদের পক্ষে তা তুচ্ছ। যদি বলতুম, ভগবানকে ভালবাস—মন ভরবে। বলতেন, আমার শূন্যতাকে শূন্য দিয়ে ভরাব না। বিশ্বকে বুকে টানতে পারলাম না, বিশ্বের রাজাকে বসাব কোথায় ? সে তিনি চাইতেন না।

খানিকক্ষণ দুইজনেই চুপ করিয়া রহিলাম। অতঃপর দিদি ধীরে ধীরে বলিলেন, একটু বুঝবার ভুল আমার সেই সময়ে হয়েছিল। ওঁকে নিয়ে যদি কলকাতার বাইরে যেতুম !

তাহলে ওঁকে বাঁচাতে পারতেন ?

তা জানি না। তবে মাঝে মাঝে একথা আমার মনে হয়। এই শহর মানুষকে ভালবাসল না কোন দিন, অথচ মানুষ একে ভালবেসে জীবন দিচ্ছে। হাসছ ভাই ? কিন্তু এর মনটি কোথায় ? কোথায় এর আকাশ ? ষড়ঋতু এ শহরে কটা দিন চোখে পড়ে ? এ মনকে ভাসিয়ে নিয়ে বেড়ায়—শিকড় গজাতে দেয় না।

তবু আমরা একেই তো ভালবাসি।

দিদি কথা কহিলেন না। ভালবাসা সম্বন্ধে সব তর্ক তাঁহার শেষ হইয়া গেল বুঝি। যে জীবন হরণ করিতে পারে—তাহাকে জীবন দানের দায়িত্ব আমরা কেন বহন করিব। অথচ এ রচনা আমাদেরই। এর সৌধ—কলকারখানা, আপিস, কোলাহল—সহস্রমুখী কর্ম্মের আড়ালে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সুকঠিন সংগ্রাম—এ সৃষ্টি তো আমাদেরই।

বাবাকে অনুরোধ করলুম, তোমাদের মধ্যে এই রোগা মানুষটিকে

টেনো না। বাবা হাসলেন। রোগ? দেহের রোগ ডাক্তারে সারায়, মনের ব্যাধির চিকিৎসক কই। শেষে একদিন দুর্ব্বল শরীরে—ওই সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে—

সুদীর্ঘ নিস্তব্ধতা। দুপুরের অলস মুহূর্ত্তগুলি করুণ হইয়া উঠিতেছে। তবু হৃদয় মেলিয়া দিতে পারিতেছি না—এই দুঃখের মধ্যে। অপঘাত মৃত্যু করুণ বটে, চিকিৎসার সান্ত্বনা সে দেয় না—শুনিলে মানুষ আঁৎকাইয়া উঠে। অন্যের মৃত্যুর দুঃখে সে শিহরণ নহে—নিজের অদৃষ্টকে সেই অঘটনের মধ্যে টানিয়া আনিয়াই হয়তো তার আশঙ্কা বাড়ে।

বাবা গীতা আওড়ালেন, জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। মনে ঠাঁই পেল না। ঝড় বইলে—টিনের চালায় আপনি শব্দ ওঠে। সে শব্দ ঠেকানো মুশকিল। তাই বাইরে বাইরে ঘুরি।

দিদির করুণ উক্তির শেষটুকু এবার হাওয়ায় মিশিল না, মনের মধ্যেই মিশিয়া গেল। চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম।

যাচ্ছ? আচ্ছা এসো। কিন্তু বলে যাও—যে ক'দিন এখানে আছি—এখানেই খাবে।

খাব।

৩

বাহিরে আসিবার মুখেই নীতিশবাবুর প্রকাণ্ড শরীরটা দৃষ্টিগোচর হইল। অভিবাদন করিবার আগেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, হ্যালো প্রফেসার—ওই যাঃ, নামটা ভুলে গেছি।

সবিনয়ে হাসিমুখে বলিলাম, সুপ্রিয়—

নীতিশবাবু বলিলেন, অমন গন্ধময় নাম যারা ভুলতে পারে—তাদের গন্ধময় জীবনের ওপর একটু অনুকম্পা রেখ। আমরা অনেক কাজের মানুষ হয়ে—সত্যিই অকেজো হয়ে পড়ছি!

আমাদের সামান্য নাম—

বিনয় করো না সুপ্রিয়। তোমরা—যুবকরা কোনকালেই সামান্য নয়। কোন দেশেই নয়।

আমার কথা বলছি। বিনীতভাবে নতমুখে বলিলাম।

কিন্তু জান, নিজের সম্বন্ধে এমন ধারণা করাটা আমি পছন্দ করি না। তোমার কি আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আছে—তাই বলছ ওকথা?

না, সেজন্য নয়।

টেবিলে চাপড় মারিয়া বলিলেন, তবে? বৈষ্ণবী বিনয় ভাল কিন্তু নিজের কর্ম্মক্ষমতা সম্বন্ধে নিজের স্পষ্ট একটা ধারণা থাকা উচিত।

চুপ করিয়া রহিলাম।

তুমি হয়ত বলবে—অভাব-অনটনের সংসারে এই আত্মপ্রত্যয় ক'জন বজায় রাখতে পারে? কতদিনই বা পারে? কথাটা একদিক দিয়ে দেখলে সত্য। আবার অন্যদিকে ওর মত মিথ্যা আর নেই।

মিথ্যা নয়। অভাব এমন জিনিস—মানুষের সবকিছু নষ্ট করে।

বাধা দিয়া নীতিশবাবু বলিলেন, জানি, বহুবার শুনেছিও ওকথা। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারি না সুপ্রিয়। এমন মানুষও চোখে দেখলুম—যার সারা জীবন অভাব,—সারা জীবন বৃহৎ সংসারের অভিযোগ শুনতে শুনতে যে মাথা তুলবার ফুরসৎ পেলে না—তার সামনে দুঃখ একদিনের জন্যও ঘেঁষতে পারলে না। তোমার বয়স অল্প, হয়ত তেমন মানুষের সাক্ষাৎ পাওনি।

মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম।

কিন্তু তেমন মানুষ আছেন। কেন দুঃখকষ্ট তাঁদের কাছে পৌছয় না জান? তাঁদের জীবন-দর্শনটা একটু ভিন্ন ধরণের বলে। কথাটা স্পষ্ট করেই বলি। তোমার কাজ নেই তো? তবে বসে বসে খানিকটা না হয় বুড়োর লেকচারই শুনলে! বাইরে বক্তৃতামঞ্চে কাটছাঁট করে যে জিনিস দাঁড় করাই—সে তো আর লেকচার নয় ঠিক। আইন বাঁচিয়ে রাজনীতি করার মত দুর্ভোগ। বলিয়া হাসিলেন।

শোন তাহলে, জীবন দর্শন হয় দু'রকমে। এক সান্ত জীবন—আর অনন্ত জীবন। সান্ত জীবন—যা এই পৃথিবীর সীমা রেখায়—ঠিক পৃথিবী নয়—যা শহর গ্রাম বা আমার সংসারের সীমায় বাঁধা। এ জীবনে সুখ আর দুঃখকেও আমরা অবশ্যপ্রাপ্য রূপে কল্পনা করি! জ্যোতিষের গণনায় গ্রহের দশাফল যেমন বর্ষভাগ করে নিয়মিত আসে যায়, সান্ত জীবনকে তেমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে ভাগ করে আমরা পরিবর্ত্তন প্রত্যাশা করি। তাই, দুঃখ যখন আসে—তখন কয়েক বৎসর ভোগের পর সুখ এলো না বলে—অধৈর্য্য হয়ে উঠি। সেই দুঃখই আমাদের ভেঙ্গে দেয়—মাথা তুলতে দেয় না।

চিরকালের জন্য দুঃখভোগ কে করতে পারে বলুন।

যিনি অনন্ত জীবন দর্শন করেছেন। যিনি জ্যোতিষের গণ্ডির বাইরে দাঁড়িয়ে অনন্ত আকাশের পানে চাইতে পেরেছেন। তিনি কি ভাবেন না, অমৃতের পুত্ররা কেন অনৃতের বিষ পান করে মৃত্যু বরণ করবে? কতকগুলি অবস্থাকে স্বীকার করে নিজেকে কেন করবেন খাটো? মৃত্যুহীন প্রাণ কি একটা কথার কথা? তুমি সত্য বল, দেখবে কাউকে তোমার ভয় করবার কিছু নেই। তুমি জিতেন্দ্রিয় হও, দেখবে দেহের তেজশক্তিতে তুমি অনন্ত শক্তিধর। নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি—এমন যে আত্মা—সে তো তুমিই।

আমি অবাক হইয়া তাঁহার দীপ্ত মুখের পানে চাহিয়াছিলাম। কংগ্রেসকর্ম্মী যখন তত্ত্বজ্ঞানের কথা তোলেন—যখন পরিদৃশ্যমান জগৎ ও অতীন্দ্রিয় রাজ্য একই সঙ্গে দেখা দিবার চেষ্টা করে—তখন স্বতঃবিরোধ বাধে যুক্তি আর কল্পনার সঙ্গে। যুক্তি মানুষকে ভবিষ্যৎ পন্থা নির্দ্ধারণে সাহায্য করে—কল্পনা নিরঙ্কুশ গতিতে তাহার রথ চালাইয়া দেয়। সত্যকথা বলিতে কি, যুক্তির সতর্কতায় সদাজাগ্রত মন একটু যেন দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কল্পনার ক্ষেত্রে গতিই আসল কথা। দু'টির পরিণাম অবশ্য ভিন্ন। যুক্তিতে পথ না মিলিলেও অবসাদে মন ভরিয়া যায় না, কল্পনা টুটিয়া গেলে উদ্যমের চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট থাকে কি? কিন্তু অতীন্দ্রিয় রাজ্যের এই কল্পনার ধর্ম্ম ভিন্ন। জীবনকে এক অখণ্ড আনন্দ-সত্তায় ব্যাপ্ত করিয়া রাখিবার জন্য এই কল্পনাকে অনন্ত রূপের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। যে শক্তি খণ্ডীভূত—প্রতি মুহূর্ত্তের কর্ম্মস্রোতে যে মনোবল ক্ষয় হইয়া আসিতেছে, অনন্ত কল্পনা নহিলে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে কে? তাই বুঝি অনন্ত জীবনের কল্পনা!

তিনি হাসিয়া বলিলেন, তোমরা কবি—খানিকটা এই অনন্ত জীবনের আস্বাদ পেয়ে থাক বৈকি। কল্পনা কি কম শক্তি ধরে! শুধু বাস্তব নিয়ে আমাদের যদি বাস করতে হতো তো—এ জীবনের মেয়াদ কতটুকু? বড় জোর আঠারো বা কুড়ি।

কুড়ি!

আশ্চর্য্য হয়ো না। কুড়ি বছরই কি জীবনের সর্ব্বপ্রধান পরিবর্ত্তনের একটা যুগ আনে না? ধর কাউকে তুমি ভালবেসেছ—অথচ সে ভালবাসা তোমার সার্থক হলো না। তখন কি করবে তুমি?

লজ্জিত মুখে চুপ করিয়া রহিলাম।

কেন—আত্মহত্যা। এই সোজা উত্তরটায় এত লজ্জা কিসের। বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কিন্তু আত্মহত্যা করব কেন? মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম।

না হলে বেচে থাকার সার্থকতা?

আর কোন সার্থকতা নেই কি?

আছে বলেই তো আমরা আত্মহত্যা করিনে। যাই প্রণয়ে বিফল হই—অমনি কল্পনা আমাদের বলে—জীবনের বহু সম্ভাবনার কথা।

যদি বলি—তখনই আমরা সত্যকার বাস্তবকে দেখতে পাই।

তোমার চোখে নীল চশমা এঁটে দিলে—পৃথিবীকে কি সাদা দেখতে পাও?

তা কেন দেখব? নীল চশমার ধর্ম্ম যা—

ঠিক—প্রণয়ের ধর্ম্ম যা—তা প্রণয় ছাড়া আর কিছু নয়। ওইটার কাছে আর সব তখন অবাস্তব। তোমার আহারটাকে তুমি অবাস্তব বলনা, তোমার সাজসজ্জাকে তুমি অবাস্তব বলনা, তোমার জীবিকা-অর্জ্জনকে তুমি অবাস্তব বল না—শুধু জৈবধর্ম্মের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে বৃত্তি—তাকেই বলবে অবাস্তব?

কিন্তু প্রণয়—

দেহধর্ম্মকে আশ্রয় করে মনোধর্ম্ম পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। এ জগতের সেই তো শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম—যা বাস্তবে বিকাশলাভ করে কল্পনায় চিরজীবী হয়। দেহের ক্ষুধাই যদি চরম হতো—পশুত্বের কতটুকু ওপরে উঠতো মানুষ! তর্ক করো না। বিজ্ঞানটা কি? কতকগুলো থিয়োরী মিলিয়ে তবে তো প্রত্যক্ষের সৃষ্টি।

এমন সময় সেক্রেটারি প্রবেশ করিয়া কহিল, কর্পোরেশন থেকে

এইমাত্র সুব্রতবাবু ফোন করছিলেন—আপিসে যাবেন কি? না গেলে কোরামের অভাবে মীটিং হবে না।

নিশ্চয়—নিশ্চয়। সুব্রত এসে সুপ্রিয়কে কোনঠেসা করলেন' নৈলে আরও আধঘণ্টা চলতো আমার বক্তৃতা। বলিয়া উঠিলেন।

হাঁ, ভাল কথা—তোমার কষ্টটষ্ট নিশ্চয় হচ্ছে না।

না।

কটা কবিতা লিখেছ—বলত?

একটাও না।

একটিও না! নিশ্চয় বুড়োকে নিয়ে রহস্য করছ না।

বিনয়বাবু তাড়াতাড়ি বলিলেন, ওঁরা যে মাসিকপত্রিকা বার করেছেন।

বটে! তাই। বাগান তৈরী করে বলা হচ্ছে—ফুল তো ফোটাই নি! প্রাণখোলা উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, কাগজখানার নাম কি? প্রতিবাদ? কিসের?

সব বিষয়েরই।

কিন্তু সুপ্রিয়—শুধু প্রতিবাদে তো প্রতিষ্ঠা হয় না। ওর সঙ্গে কিন্তু সৃষ্টিবাদ চাই যে।

কেন, প্রতিবাদটাই তো সৃষ্টি।

হাঁ—উল্টো সৃষ্টি। যাই হোক—এখন তর্ক করব না—তোমাদের কাগজখানা পাঠিয়ে দিয়ো—রাত্রিতে চোখ বুলুবো একবার।

সারাদিন এত খেটে—

তাই তো বিশ্রাম নেব গো। পড়ায় খাটুনি—আবার পড়ার মধ্যেই বিশ্রাম—একথা তোমাদের আর বেশি বোঝাতে হবে কি?

নীতিশবাবু চলিয়া গেলে বিনয়বাবু বলিলেন, ছেলেদের পড়াশোনা যদি ধরেন—তাহলেই আমার শুদ্ধ কৈফিয়ৎ তলব পড়বে।

ঈষৎ অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিলাম, আপনি তো আর ওদের পড়ান নি।

না, কেমন পড়ানো হয়—সে সব দেখাশোনার ভার ছিল তো। এখন মাসিকখানা দেখে কর্তা সন্তুষ্ট হন—তবে তো।

না হলে আপনাকে বরখাস্ত করবেন না নিশ্চয়।

আমাকে গমনোদ্যত দেখিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, মিছে আমার ওপর রাগ করছেন। মাথা ঠাণ্ডা করে শুনবেন একটা কথা?

কি?

বসুন না। গোপনীয় কথা—দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলা ঠিক নয়।

আপনার সঙ্গে আমার কোন গোপনীয় কথা থাকতে পারে না। অসহিষ্ণু কণ্ঠে জবাব দিলাম।

আমার সঙ্গে নয়—কথাটা আপনার সম্বন্ধে। সেদিন দেখেছিলেন তো গেটের কাছে একজন লোক দাড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা কইছিলেন।

তাতে কি?

তিনি কে বলুন দেখি? আহা উঠবেন না—তিনি স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোক।

শুষ্কমুখে বলিলাম, আমার সঙ্গে স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকের সম্বন্ধ কি?

তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আমিও তো কদিন ধরে তাই ভাবছি। হয়ত কাগজে এমন কিছু বেরিয়েছে—

না। কাগজ আমাদের সম্পূর্ণ সাহিত্য-সম্বন্ধীয়।

সাহিত্যে কি আর সন্ত্রাসবাদ হয় না? ওর মধ্যেই তো বেশি করে আগুন থাকবার কথা।

আপনি ভুল বুঝেছেন।

আমি নয়—সেই স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের লোকটি। কিন্তু ওরা একটু গন্ধ না পেলে নাকি খোঁজখবর নেয় না।

বেশত, সার্চ্চ করবেন আমার ঘর। বলিয়া উঠিলাম।

যাই হোক—তেমন কাগজপত্র যদি কিছু থাকে সরিয়ে ফেলবেন। উহার—মুখ না দেখিতে পাইলেও—কল্পনা করিলাম—বিদ্রূপপূর্ণ উল্লাসে সে মুখ কুৎসিত হইয়া উঠিয়াছে।

৪

কয়েকদিন পরেই হইবে—প্রতিবাদের আপিসে বসিয়া আছি—অনু আসিয়া প্রবেশ করিল। ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া কহিল, আর দিন পনেরো আছে—কতদূর এগুলো কাগজ?

কই আর এগুচ্ছে! রেবা দেবী, স্মরজিৎ বা রণজিৎবাবু ওঁরা কেউ এখনও লেখা দেন নি। ছবি গোটাকতক পাওয়া গেছে—তারও সিলেকশান হয় নি।

দ্বিতীয় সংখ্যায় নতুন কাগজ দেরিতে বেরুনো—খুব সুনামের নয়।

নয় তো জানি, আমি একা কি করতে পারি? আপনার গল্প, আর প্রফেসার মিত্রের প্রবন্ধটা দিয়ে কোন রকমে দুটো ফর্ম্মার অর্ডার দিয়েছি।

একটা গানের স্বরলিপি ছাপাবেন?

সিনেমা, ফুটবল, রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্ম, বিজ্ঞান, ভ্রমণকাহিনী সবই যখন রয়েছে—সঙ্গীত-বিভাগটা খুলতে দোষ কি!

অনু হাসিয়া বলিল, এ কিন্তু আপনাদেরই একজন পৃষ্ঠপোষকের কীর্ত্তি।

কে তিনি ?

শ্রীমতী রিণি, এই দেখুন না, নিজের হাতে স্বরলিপি নকল করে—পাঠিয়েছে।

স্বরলিপির কাগজখানা হাতে করিয়া হাসিমুখে বলিলাম, অপরূপ বোসটি কে ?

স্বয়ং ওস্তাদজী। কথা ও সুরের রচয়িতা।

আর কিছু রচনা করছেন কি না কে জানে। অদ্ধস্বগতোক্তি করিলাম।

অনুও মৃদুস্বরে বলিল, আশ্চর্য্য নয়।

অনুর পানে চাহিলাম। আমার দ্ব্যর্থ উক্তির মর্ম্মগ্রহণ করিয়া এই সংক্ষিপ্ত উত্তর সে দিল, না আর কিছু? আশ্চর্য্যের কথা—উত্তর দিয়া সে-ও সেই দণ্ডে আমার পানে চাহিয়াছিল। চক্ষের দৃষ্টিতে শিহরণ জাগিল, দুজনেই বুঝিলাম—কোথায় সঙ্কোচ বা আগ্রহের উৎপত্তি। তৎক্ষণাৎ সেই সঙ্কোচকে জয় করিবার জন্য কথায় জোর দিয়া বলিলাম, বলুন তো ?

অনু নতমুখে বলিল, এ অনুমান তো আপনারই।

বলিলাম, সমর্থন করেছেন আপনি। সুতরাং মানেটা আপনার কাছেই শুনি না।

অনু বলিল, না, এমনি বললাম।

আমার কিন্তু একটু আগ্রহ ছিল শোনবার। সহজ হইবার চেষ্টায় কহিলাম, কেন জানেন ? আমার আর আপনার অনুমান এক কিনা—বুঝতে পারতাম।

এক না হলেই বা ক্ষতি কিসের ?

ক্ষতি নয়, কৌতূহল।

কাগজ খস্ করিয়া উঠিল—কি অনু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল—ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। পুনরায় তাহার পানে চাহিলাম। সে কিন্তু নতমুখে টেবিলের উপর রক্ষিত একখানি বই নাড়িতেছিল। মেয়েটি মিতভাষিণী না হইলে—এ বিষয়ে খানিকটা খোলাখুলি আলাপ করিতে পারিতাম হয় ত। পরে বুঝিয়াছি যে, ইহার মিতভাষণের সুযোগ লইয়া আমি যতখানি আত্মপ্রকাশ করিতে পারি—তেমনটা আর কাহারও বেলায় ঘটে নাই।

কাল আপনি রঞ্জি ট্রফি দেখতে গিয়েছিলেন?

না, ক্রিকেট আমার ভাল লাগেনা।

কেন?

বলিলাম, ওটা নেহাৎ আলসেমির খেলা। শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠায় বেঞ্চে বসে থাকা—খেলার উত্তেজনা নেই ওতে।

বলেন কি! পৃথিবীতে যে খেলার কদর—তাকে আপনি বলেন—আলসেমি। জানেন, ইস্‌লিংটনের খেলা দেখবার জন্য আপিসের ছুটি হয়েছিল।

সেটা—নিছক কমার্শিয়ালিজম। তা ছাড়া ওটা ক্রিকেট নয়।

নাইডু, অমরনাথ, পাতিয়ালা ওঁদের জগৎজোড়া নাম।

তার চেয়ে ফুটবল ভাল।

অনু বলিল, ওটা খেলা, না গুণ্ডামি!

হাসিয়া বলিলাম, পুরনো গল্প একটা মনে পড়লো। এক বামুনের গরু আর এক গোয়ালার গরু—দুজনে একদিন পরামর্শ হলো—নতুন একটা খেলা করা যাক।

জানি। গয়লার গরু বললে, এস, ছুটোছুটি করি। বামুনের গরু বললে, তার চেয়ে শুয়ে শুয়ে ল্যাজ নাড়া যাক। এক্ষেত্রে আমাকে—

হাসিয়া বলিলাম, না—ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ—তাই বলছি।

অনুও হাসিল।

সিঁড়িতে কয়েক জোড়া পদশব্দ হওয়াতে আমরা উৎকর্ণ হইয়া উঠিলাম। রেবা—স্মরজিৎ এবং সর্ব্ব পশ্চাতে রণজিৎ প্রবেশ করিল।

স্মরজিৎ প্রবেশ করিয়াই বলিল, শুনেছেন স্থপ্রিয়বাবু, রণজিৎবাবু সম্পাদকের দায়িত্ব আর নিতে চাইছেন না।

রণজিতের মুখের পানে আমরা চাহিলাম।

হাতের চুরুটের ছাই ঝাড়িতে ঝাড়িতে রণজিৎ বলিল, মানে—অন্য একটা কাজে জড়িয়ে পড়লুম কিনা। হয়ত আমায় শীঘ্রই কন্টিনেণ্ট ট্যুরে যেতে হবে।

কন্টিনেণ্ট ট্যুরে যাবেন? অনু জিজ্ঞাসা করিল।

উপায় নেই। বাবা বুড়ো বয়সে আর জাহাজে চাপতে রাজী নন। কারবার রাখতে গেলে একবার না বেরুলেই নয়।

রেবা বলিল, তবু ভাল! আমি ভাবলাম বুঝি মাসিকপত্রের কনট্রিবিউটার্সদের চড়া মূল্য দিতে হবে বলে কাগজের সম্পর্ক ত্যাগ করছেন।

রণজিৎ দাঁতে চুরুট চাপিয়া ধরিয়া ঠোঁটের কোণে বক্র হাসি হাসিয়া বলিল, সে কারণটাও নেহাৎ মিথ্যে নয়।

অনু বলিল, কিন্তু কনট্রিবিউটার্সদের আমরা এমন কি দিয়েছি—

রণজিৎ চুরুট হাতে লইয়া রেবার পানে ইঙ্গিত করিয়া কহিল, ওঁকে জিজ্ঞাসা করুন।

অনু রেবার পানে চাহিতেই সে কহিল, অথচ আমি ভাবতে পারি নি মূল্যটা এত বেশি। যদিও সেটা ফিরিয়ে দেওয়া আর চলে না—

রণজিৎ বলিল, ফিরিয়ে দিলেও—নেওয়াটা আমি পছন্দ করি না। যাক সে কথা, কাগজের সঙ্গে সম্পর্ক আমি রাখতে চাই না।

তাহলে কন্টিনেণ্ট ট্যুর একটা অছিলা!

যা বুঝুন—ক্ষতি নেই। সহসা চেয়ার হইতে উঠিয়া রণজিৎ ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, শুনুন রেবা দেবী, খেলা আমিও ভালবাসি, কিন্তু সীরিয়াসলি এমন খেলা খেলিনি কখনো।

রেবা কহিল, কেন খেলেন নি? আপনার মধ্যে সীরিয়াসনেস যথেষ্ট আছে—অথচ খেলার বেলায় হালকা হলেন কেন! আপনি তো জানেন বালিগঞ্জীয় সমাজকে। এর ফ্যাশন, রীতিনীতি, চালচলন সব তো আপনার কণ্ঠস্থ ছিল। আপনার প্রাসাদ আছে—মোটর আছে—এ সমাজে মিশবার সমস্ত সুযোগই আপনি পেয়েছেন—

রেবার পিঠের উপর হাত রাখিয়া স্মরজিৎ মৃদু কণ্ঠে কহিল, আঃ রেবা!

বলতে দিন স্মরজিৎবাবু। উনি চেয়েছিলেন শুধু হালকা আমোদ সাহিত্যের বেসাতি করে—

রণজিৎ কর্কশকণ্ঠে কহিল, রেবা দেবী আপনি মিছে উত্তেজিত হয়েছেন। আমি যা চেয়েছিলাম—তা হয়ত পাই নি। সে জন্য আমি খুব বেশি দুঃখিত নই। কিন্তু আপনার কাছে আমি কি ঠিক সোজা ব্যবহার পেয়েছি?

রেবা আরক্ত মুখ ফিরাইয়া কহিল, না।

কেন—আপনার বন্ধুদের জানাবেন কি? ব্যঙ্গস্বরে রণজিৎ প্রশ্ন করিল।

না, ওঁরা জেনে কোন লাভ নেই।

কিন্তু—একটা কথা আপনি ভুল করছেন রেবা দেবী। যা আমি

পাইনি, তা আমারই মর্জির উপর নির্ভর করছিল—আপনার অনুগ্রহের উপর নয়।

অর্থাৎ?

ইচ্ছে করলে—আপনার আপত্তি টিকতো না। আপনার মধ্যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আছে জানি, আমার মধ্যে আগুন আছে আপনি তা জানেন না।

রেবা হাসিয়া ফেলিল, আমি কি জানি না-জানি—আপনি তা-ও জানেন দেখছি!

রণজিৎ রেবার হাসিতে অধিক উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পকেটের মধ্যে হাত পুরিয়া কহিল, প্রমাণ চান?

কিসের প্রমাণ রণজিৎবাবু? প্রশান্ত-মুখে রেবা প্রতিপ্রশ্ন করিল।

আপনার ওপর জোর খাটাতে পারতুম কিনা?

রেবা স্থিরভাবে বলিল, আমি জানি, এরা কিন্তু জানেন না। আর এঁদের না জানালেই বা ক্ষতি কি!

তবু এঁরা সাক্ষী থাকুন—আমি নীচ নই। বলিয়া পকেট হইতে মুষ্টিবদ্ধ হাতখানি টানিয়া বাহির করিল। সভয়ে ও সবিস্ময়ে দেখিলাম—উদ্যতফণা সাপের মত চক্‌চকে একটা পিস্তল রণজিতের দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে আবেগে কাঁপিতেছে। রণজিৎ স্বর নামাইয়া কহিল, যা দিয়েছি—তার বিনিময় আদায় করা আমার পক্ষে কষ্টকর ছিল না রেবা দেবী।

রেবা অকম্পিত কণ্ঠে কহিল, বিনিময় কি পাইক-পেয়াদা লাগিয়ে আদায় করা যায়, না সেটা উচিত?

আমার কর্তব্য আমি জানি। টাকা নিয়ে যে ছিনিমিনি খেলে—জীবন নিয়েও সে ছিনিমিনি খেলতে পারে।

রেবা সানন্দে কহিল, তাহলে কেন বলছেন—আমি ভুল করেছি? স্ফুলিঙ্গ কখনও আগুনকে চিনতে ভুল করে না।

রেবা দেবী, আপনি পরিহাস করছেন।

না রণজিৎবাবু। আমি যখন পরিহাস করি—তখন পরিহাসই ভাল লাগে। যখন পরিহাস করি না—তখন—জানেন তো আপনি! স্থিরদৃষ্টিতে সে রণজিতের পানে চাহিয়া রহিল।

সে দৃষ্টিতে কি ছিল জানি না, সম্মোহিত সর্পের মত মাথা নামাইয়া রণজিৎ আসন গ্রহণ করিল। উদ্যত মুষ্টি তাহার পুনরায় পকেটে ফিরিয়া গেল।

রেবা কহিল, কথাটা খোলসা করেই বলা যাক। সুপ্রিয়বাবু, সিঁড়ির দরজাটা কাইণ্ডলি বন্ধ করে দেবেন?

দরজা বন্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে শুনিলাম রেবা বলিতেছে, আমি জানতাম—স্মরজিতের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা—সারা কলকাতার মধ্যে কারো অজানা নেই।

রণজিৎ অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, আমি জানতুম না।

সম্ভব। গলাটা পরিষ্কার করিয়া রেবা বলিতে লাগিল, জানলে মনে মনে অহেতুক দাবি করে এতটা কষ্ট পেতেন না। সে যাই হোক, সবাই জানে—আজ হোক, দু'দিন পরে হোক স্মরজিতের সঙ্গে আমার বিয়ে হবেই।

অণু হাসিয়া মুখ নামাইল। মুখ নামাইবার পূর্ব্বে চক্ষের ইঙ্গিতে আমাকে জানাইল—সে অন্ততঃ এ কথা জানে। স্মরজিতের স্বীকারোক্তি আমিও শুনিয়াছি, সুতরাং স্বাভাবিক ঘটনায় আমারও তেমন বিস্ময় বোধ হইল না। শুধু রণজিৎ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া রেবার পানে চাহিয়া রহিল।

রেবা বলিল, আপনি যদিও জানতেন না, তবু সন্দেহ করেছিলেন। জানি না, আপনার মনের কি গতি—কোন দিন যদি ওই পিস্তলের গুলিতে স্মরজিৎ আঘাত পেতেন—তাহলেও আমি বিস্মিত হতাম না।

রণজিৎ পুনরায় মাথা নীচু করিল।

রেবা বলিতে লাগিল, অথচ দেখুন, আসলে ব্যাপারটা কত ভুয়ো। সবাই যে কথা জানেন—ধ্রুব সত্য, শুধু আমি আর স্মরজিৎ জানি—তা হবার নয়।

রণজিৎ মাথা তুলিয়া অধীর কণ্ঠে কহিল, কেন, বাধা কিসের?

রেবা হাসিল।

রণজিৎ তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংশোধন করিয়া কহিল, জাতির প্রশ্ন কি এমন সঙ্গীন—

না, তাও নয়। আমার পিতা আর স্মরজিতের পিতা উদার মত পোষণ করেন—বাধা সেদিক দিয়ে নয়।

তবে? মূঢ়ের মত রণজিৎ প্রশ্ন করিল।

বাধা আমি নিজেই। ঠিক বিবাহের অনুকূল করে বিধাতা আমার হৃদয়বৃত্তি তৈরি করেন নি।

অধৈর্য্য হইয়া রণজিৎ উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, নাটকের ভাষা আমি ভালবাসি না।

রেবা কহিল, আমাদের জীবনই যে নাটক। আপনিও তো ভালবাসেন নাটক। নইলে পিস্তল দেখালেন কি করে!

আমায় মাপ করুন।

উঁহু, স্ফুলিঙ্গ কখনো আগুনকে মাপ করে না। ঈষৎ হাসিয়া রেবা বলিল, ঠকিয়ে কিছু আদায় করিনি রণজিৎবাবু। যা আমার কাউকে দেবার সাধ্য নেই—তা নিয়ে দোকানদারী করা আমার স্বভাব নয়।

আপনার অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি করলেন বড়াই, আপনার হলো ভুল, আমি কেন দোষ স্বীকার করব বলুন ?

রণজিৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল, স্বীকার করছি আমার ভুল। কিন্তু কেন আপনাদের বিবাহ হতে পারে না ?

স্মরজিতের পানে চাহিয়া রেবা বলিল, বলব স্মরজিৎ ?

স্মরজিৎ শুধু হাসিল।

রেবা কহিল, মেয়েরা ব্রত নিয়ে উপবাস করে থাকে কখনও দেখেছেন, কি শুনেছেন ?

রণজিৎ কহিল, মাকে দেখেছি।

আমিও ব্রত নিয়েছি রণজিৎবাবু। সে ব্রতের কথা আপনিও তো জানেন।

রণজিৎ অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল, যদি ব্যথা দিয়ে থাকি—

আমরা তো কিছু মনে করি না। সমুদ্রকে আশ্রয় করেছি—শিশিরে ভয় করব কেন ? তবে আপনি বড় সেন্টিমেণ্টাল। আগে জানতাম না।

রণজিৎ বলিল, শীঘ্রই আমি এদেশ থেকে পালাব ভাবছিলুম—

সেকি কথা, আপনাদের ব্যবসা আগে রক্ষা করবেন। Money is the honey of humanity একথা আমি বিশ্বাস করি।

তবু টাকা বা কোন কিছুতে আপনার আসক্তি নেই।

রেবা সশব্দে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, তেত্রিশ কোটি দেবদেবী আছেন এই ভারতবর্ষে—আর তাদের সংখ্যা বাড়াবেন না, রণজিৎবাবু।

রণজিৎ সগর্ব্বে বলিল, আমি মিথ্যা বলিনি।

রেবা বলিল, তাইতো মুশকিলে ফেললেন ! লেখিকা হয়ে কাঞ্চন-মূল্য আদায় করেছি—দেবী হয়ে কি অর্ঘ্য গ্রহণ করি ?

যা আপনার অভিরুচি। রণজিৎ গম্ভীর স্বরে উত্তর দিল।

বাঃ রে, অনু শুদ্ধ গম্ভীর হয়ে গেছে! আমার দেবীত্বটা এঁরা সবাই মিলে পাকা করতে চান দেখছি! সে কৌতুকে কেহ হাসিলেন না। কৌতুকের তলায় অন্তঃশীলা যে প্রবাহটি একটু পূর্ব্ব হইতে আমাদের নজরে পড়িয়াছে—তাহাতে রস না জমিয়া রহস্যই ঘনীভূত হইতেছে।

রেবাও সহসা গম্ভীর হইয়া কহিল, বেশ, ওই পিস্তলটা আমায় উপহার দিন রণজিৎবাবু।

বিনা বাক্যব্যয়ে পিস্তল বাহির করিয়া সে রেবার সম্মুখস্থ টেবিলে রাখিয়া দিল।

রেবা গম্ভীরমুখে পিস্তল গ্রহণ করিয়া কহিল, ঠাকুর কিছু স্বহস্তে পূজা গ্রহণ করেন না। তবু আমি নিলাম—কেননা, দেবদেবীর দিব্যদৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, এখন সমস্যা হ'চ্ছে এই—এ ফুল রাখি কোথায়? সেকালের দেবী নই যে ফুস্‌মন্তরে একে উড়িয়ে দেব। একাল বড় কঠিন—ফ্যাসাদ বাধতে বেশিক্ষণ নয়। কোন্ ভক্তকে এ প্রসাদ বিতরণ করি? স্মরজিতের পানে চাহিয়া কহিল, উঁহু। অনু? না—ওর দ্বারা মর্য্যাদা থাকবে কিনা বুঝতে পারছি নে। কেবল সুপ্রিয়বাবু—এ সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

বুক কাঁপিয়া উঠিল। স্পষ্টই কি বিপ্লবীদের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম? বিনয়বাবু যেভাবে আমার পিছনে লাগিয়া আছেন—স-পিস্তল ধরা পড়িলে কি আর বড় একটা ষড়যন্ত্রের আসামী না হইয়া নিষ্কৃতি লাভ করিব! হয়ত আমার মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল—বুকও কাঁপিতেছিল। সকলেই আমার পানে একযোগে দৃষ্টিপাত করাতে আরও কেমন যেন নার্ভাস হইয়া পড়িলাম।

রেবা তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, যতই নার্ভাস হোন সুপ্রিয়বাবু, এ দায়িত্ব আজ আপনাকেই গ্রহণ করতে হবে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের কাগজগুলোর মধ্যে ভরে এ নিম্মাল্য আপনাকেই পার করতে হবে। বলিতে বলিতে আমার ব্যাগের মধ্যে পরিপাটী করিয়া—সাহিত্য ও মারণাস্ত্রকে সুবিন্যস্ত করিয়া দিল।

আর দেরি নয়—আপনি বেরিয়ে পড়ুন। সোজা বাড়ি। আলমারির মাথায় যেখানে পুরনো খবরের কাগজগুলো আছে—তার মধ্যেই রাখবেন। যথা সময়ে ভার মুক্ত হবেন—কোন চিন্তা নেই।

অনু আমার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়া বলিল, আমাকেই দিন না, রেবাদি। এমন জায়গায় রাখব—

না রে, তোকে দিয়ে যদি হতো—তো ওঁকে কষ্ট দিলাম কেন? আমি কি জানি না—এ কাজের গুরুত্ব?

তথাপি অনু কি বলিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া রেবা হাসিয়া বলিল, ভাল কথা, জানালায় দাঁড়িয়ে থুথু ফেলবার নাম করে—দক্ষিণ কোণের বকুল গাছতলায় একবার চেয়ে দেখ দেখি। এক সেকেণ্ড চাইবি—কিছু দেখছিস বলে নয়—এমনি।

অনু জানালা হইতে ফিরিয়া আসিতেই রেবা প্রশ্ন করিল, কি দেখলি?

একটা লোক—এই বাড়িটার পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কেমন তার চেহারা?

ছিপছিপে—ছোকরা, অক্সফোর্ড কলারের ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে সিগ্রেট টানছে।

হুঁ। ও আমাদের দেখতে বড় ভালবাসে কিনা! বালিগঞ্জের সদালাপী ছোকরা নয় ও। চুণোপুঁটি ধরবার জন্য ওর জাল পাতা নয়—বুঝলি?

অনু শুষ্কমুখে কহিল, কিন্তু আমাদের পেছনে লেগেছে কেন?

আগুন আর স্ফুলিঙ্গকে ওরা বড় ভালবাসে—যদিও বাদ্‌লা পোকা নয় ও বেচারারা। কি বলেন রণজিৎবাবু?

রণজিৎ সকৃতজ্ঞ কণ্ঠে কহিল, আপনার দিব্যদৃষ্টিও আছে।

রেবা আমার পানে চাহিয়া কহিল, আর দেরি করছেন কেন সুপ্রিয়বাবু। নোট বইয়ে এই ঠিকানাগুলো নিয়ে—লেখকদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ুন তো।

বহির্দ্বারে আসিয়া রেবা কহিল, ওহো—অনুর গল্পের ফাইলটা দিতে ভুল হয়েছে—এটা নিন। কাগজখানি মেলিয়া ধরিল আমার সম্মুখে। সেইখানেই ব্যাগ খুলিয়া ফাইলটি ব্যাগের মধ্যে পুরিলাম। আড়চোখে দেখিলাম, বকুলতলায় সেই ছোকরাটি এইদিকে সাগ্রহে চাহিয়া আছে।

৫

বুকের স্পন্দন এমনিই দ্রুত হইয়াছিল, ট্রামে চাপিয়াও তাহা নিবৃত্ত হইল না। কোলের কাছে ব্যাগটিকে সন্তর্পণে চাপিয়া স্বচ্ছন্দভাবে বসিলাম। মনে হইল, স্বাচ্ছন্দ্য আমার কোথাও নাই। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট, মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, পকেট হাতড়াইয়া একটিও লবঙ্গ বা সুপারির কুচা মিলিল না—যাহাতে জিহ্বা খানিকটা সরস হয়। তা ছাড়া—রাসবিহারী এভিন্যুয়ের বকুলগাছটা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। এই ট্রামের সুবেশ কোন যুবকই যে গোপনে এই ব্যাগের উপর দৃষ্টি রাখিয়া আমাকে অনুসরণ করিতেছে না, তাহাই বা কে জানে? পিছনে কাহারও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সন্ধানী-আলোর মত আমার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করিতেছে হয়ত। যেমন ওকথা একবার মনে উঠিল, বারবার ওই কথাটাই মনের

মধ্যে পাক খাইয়া পীড়া জন্মাইয়া দিল। বেঞ্চে ছারপোকা কামড়ানোর ভান করিয়া খানিকটা নড়িয়া—পাশ ফিরিয়া পিছন দিকে চাহিলাম। গোয়েন্দারা কি আর অপরাধীর সঙ্গে দৃষ্টি-বিনিময় করিবার জন্য অসতর্ক হইয়া থাকে! তাহাদের চাতুর্য্য ভেদ করা কঠিন বলিয়াই তো অপরাধীরা টপাটপ ধরা পড়িয়া যায়। কিন্তু আর কোন্ চালে তাহারা চলে—তাহা অনুমান করাও আমার পক্ষে দুঃসাধ্য! এমন বেশি ডিটেক্টিভ নভেল পড়ি নাই—যাহার অভিজ্ঞতায় গোয়েন্দা-অনুসৃতিতে আমার অভ্রান্ত ধারণাকে সুপ্রয়োগ করিতে পারি! চুপ করিয়া বসিয়া থাকা এবং ভাগ্যে থাকিলে মাল সমেত গ্রেপ্তার—ইহার উপরই বাড়ি না-পৌঁছানো পর্য্যন্ত আমাকে নির্ভর করিতে হইবে। ভাবনার মধ্যে কণ্ডাক্টার আসিয়া টিকেট চাহিল, শ্যামবাজারের ট্রান্সফার লইলাম।

যতই এসপ্লানেডের আলোকমালা নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল, ততই চিন্তা জটিল হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্যামবাজারে পৌঁছিয়াই বা আমার নিস্তার কোথায়? সব গোয়েন্দার সেরা গোয়েন্দা বিনয়বাবু সেখানে চক্ষু শানাইয়া আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। বকুলতলার ছোকরা কি আর একটা ফোন তাঁহাকে করিয়া দেয় নাই? ও বিষয়ে উহাদের বড় একটা ভুল হয় না। একবার ইচ্ছা হইল, গাড়ি বদল করিয়া হাওয়া খাইবার ছলে গঙ্গার ধারে গিয়া পৌঁছাই এবং যে কোন সুযোগে পিস্তলটা গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া ভারমুক্ত হই। কুক্ষণে রণজিৎ প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এটিকে সঙ্গে লইয়া ফিরিতেছিল। নিষ্ফল প্রণয়ে আত্মহত্যা করিলেই তো সমস্ত সমস্যা মিটিয়া যাইত!

হাসিলাম। এত দুঃখেও হাসি আসিল, আশ্চর্য্য! রণজিতের বেদনা আমি কিছু বুঝিলাম। দাশসাহেবের কথা মনে পড়িল, কুড়ি হচ্ছে আত্মহত্যার উপযুক্ত সময়। কারণ ঐ সময়ে জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

পরিবর্ত্তন আসে। কিন্তু বহুসম্ভাবনাযুক্ত মানুষ আত্মহত্যা করে না। তাহা হইলে—আমিও তো ওই পথ বাছিয়া লইতে পারিতাম। ইলার স্বর্গলোকে যেইমাত্র আমার প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইল—তৎক্ষণাৎ জগৎ অন্ধকার হইলেও—মন হইতে আলোর শেষ রেখা মুছিয়া গেল না কেন? ঈর্ষা আমায় দগ্ধ করিতে লাগিল। এবং নিরুপায় বলিয়াই অহিংস ঈর্ষার জ্বালায় নিজেই জ্বলিয়া মরিতেছি। রণজিৎ শক্তিমান, কাজেই হিংসাকে সে রাজসিক পর্য্যায়ে উন্নীত করিয়া সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল। সুযোগ আসিয়াছিল কিনা জানিনা, তবু দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে তাকে আত্মসমর্পণ করিতে হইল। আমি যেন তাহার বোঝা বহিয়া যত রাজ্যের উদ্বেগ লইয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিতেছি। স্বার্থপর রেবা।

তবু, তাহাকে স্বার্থপর ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি না যে! ভাল, এ ভার গঙ্গায় নামাইবার জো নাই। যাহার জিনিস সে আসিয়া কৈফিয়ৎ তলব করিবে। শ্যামবাজার পর্য্যন্ত পৌছানোই বা নিরাপদ কিসে? ভাবিতে ভাবিতে নিরাপত্তার আর দু'টি পন্থা আবিষ্কার করিলাম। শ্যামবাজারে না গিয়া—অতুলদার মেসে কোন কৌশলে এ ভার নামানো যায় না কি? যায়, তাহাতে—লাভ এইটুকু হইবে যে, ধরা পড়িলে অতুলদাও জড়ীভূত হইয়া পড়িবেন। অথচ সব কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিবার উপায় নাই। আজকাল যে ব্যাপক খানাতল্লাসী হইতেছে! মেস হোষ্টেলগুলির উপর প্রভুদের খরদৃষ্টি কি আর নাই!

দ্বিতীয় উপায়—আমাদ্বারা উপকৃতা সেই মহিলাটির বাসায় এটি গচ্ছিত রাখা। যেমন একথা মনে উদয় হইল, অমনি 'ইউরেকা' শব্দে মনে মনেই লাফাইয়া উঠিলাম। যদিও তিনি অপরিচিতা, তবু সেই একদিনের উপকার স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার অন্ত তাঁহার নাই। কৃতজ্ঞতা

না থাকিলে ঋণ পরিশোধ করিবেন কেন? শহরে আসিয়া প্রথম যে পরিচয়—তাহাতে আমিই লাভ করিয়াছি অনেকখানি। প্রথম পরিচয়ের মুখে শহর আমাকে প্রতারণা করিতে পারে নাই।

অনেক খুঁজিয়া গলিটা বাহির করিলাম। শহরে নাম ধরিয়া ডাকার রীতি নাই। রীতি থাকিলে বিপদগ্রস্ত হইতাম সন্দেহ নাই। সজোরে কড়া নাড়িলাম।

ভিতর হইতে কর্কশ কণ্ঠে কে কহিল, কে র‍্যা? কড়া নাড়ছে না তো বুকে যেন হাতুড়ি পিটছে!

উত্তেজনার আতিশয্যে অতটা বুঝিতে পারি নাই। কড়া নাড়ার উপরই দেহের অনেকখানি শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। এবার মৃদুভাবে শব্দ করিলাম। সেই কণ্ঠ পুনরায় শোনা গেল, দেখ না রে হাবু, কাকে চায়।

হাবু বলিল, আমি পারবো না, তুই দেখ।

তা পারবি কেন—সারাদিন দস্যিবিত্তি করতে খুব পারিস। এই বুড়ি মরে গেলে তোর যদি শতেক খোয়ার না হয়—। গজ গজ করিতে করিতে বর্ষীয়সী আসিয়া দুয়ার খুলিলেন। কপাটের ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া কহিলেন, কাকে চাই বাবা?

এক কথায় বলা মুশকিল। তবু যতটা সংক্ষেপে সম্ভব তাঁহাদের পরিচয় দিলাম।

বর্ষীয়সী বলিলেন, বুঝতে পারলুম না বাপু। ভাইপো হও তো? তোমার খুড়ি, না জেঠী?

দুয়ারের ফাঁক দিয়া দেখিলাম, কলতলায় দাঁড়াইয়া একটি ছেলে কুঁজায় জল ভরিতেছে। কহিলাম, ওই ছেলেটিকে যদি ডেকে দেন—ওকে আমি চিনি।

বর্ষীয়সী সেদিকে চাহিয়া কহিলেন, ওরে ভোঁদর—ভোঁদর রে কে ডাকছে তোকে—ইদিকে এসে ভাখ। আমার আবার পরণে গামছা! নৈলে—, বলিয়া সশব্দে কপাট বন্ধ করিয়া দিয়া নিজের আব্রু রক্ষা করিলেন।

মিনিট দুই পরে ছেলেটি বাহিরে আসিতেই তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিলাম, কি খোকা চিনতে পার?

অন্ধকার গলি, আমারও পরিবর্ত্তিত বেশ—না চিনিবার অপরাধ তাহার ছিল না। তবু মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া সে জানাইল, চিনিয়াছে।

নিশ্চিন্ত হইয়া বলিলাম, তোমার মার কাছে বলগে আমি এসেছি।

ছেলেটি ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, কি নাম বলব আপনার?

হাসিয়া বলিলাম, না, তুমি আমায় মোটেই চিনতে পারনি খোকা। নাম বললেও চিনতে পারবে না। তার চেয়ে বলগে—সেদিন যাঁর সঙ্গে ভবানীপুর গেছলে—

পরিচয়ের আলোকে তাহার সারা মুখ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমাকে অতি আনন্দে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া কহিল, বাঃ রে, আপনি এতদিন আসেন নি কেন?

তাহার পিঠে চাপড় মারিয়া কহিলাম, এই তো এলাম।

সমস্ত ভাবনা পিছনে ফেলিয়া অতঃপর তাহার অনুসরণ করিলাম।

কম্বলের আসন পাতিয়া পাতানো-মা বলিলেন, এতদিনে মনে পড়লো, বাবা?

কি করব বলুন, বড়লোকের বাড়ি চাকরি—অবসর পাই না।

দিনরাতই তোমায় খাটতে হয়? আহা বাছা রে! তাই মুখখানি শুকনো শুকনো।

শুকনা মুখের কাহিনী অবশ্য প্রকাশ করিবার নহে। তবে মুখ- যাহাতে শুকনা না থাকে তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই যে এখানে আসিয়াছি—সেটুকু বলিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলাম।

তিনি নিজের কাহিনী বলিতে লাগিলেন, যে কটা টাকা দেনা শোধ দিয়ে বাঁচলো—তার আদ্দেক দিয়ে একটা সেলাইয়ের কল কিনেছি, বাবা। এক সময়ে সখ করে জামা-সেলাই শিখেছিলাম—এখন কাজে লেগে গেল। খোকা ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। পরে ছেলের পানে ফিরিয়া কহিলেন, হাঁরে খোকা, দাদাকে প্রণাম করলিনে?

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াই সে পায়ের কাছে প্রণামের ভঙ্গি করিল। তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া বলিলাম, থাক, থাক। সে কিন্তু ধস্তা- ধস্তি করিয়া আমার পায়ের ধুলা লইয়া মাথায় দিল।

মা বলিলেন, কোন্ ক্লাসে পড়িস—দাদাকে বল। আর বইগুলো এনে দেখা।

ছেলেটি সানন্দে মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল। তাহাকে খুসী করিবার জন্য বইগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতে লাগিলাম। মাঝে মাঝে লেখাপড়া সম্বন্ধে দু'একটি প্রশ্ন করিলাম, এবং নিজের মন্তব্যও কিছু কিছু শোনাইলাম। ছেলেটি মেধাবী ও বুদ্ধিমান। শিখিবার কৌতূহল তাহার মনের মধ্যে প্রবল। অনুকূল আবহাওয়ায় পড়িলে এই ছেলেরাই ভবিষ্যতে বরেণ্য পুরুষ হইতে পারে। কিন্তু অভাবের সংসারে ভবিষ্যতের ভরসা কতটুকু? গল্প তো অনেক শোনা যায়। গ্যাসের আলোয় সহপাঠীর কাছে ধার লওয়া বই হইতে পড়া মুখস্থ করিয়া যে ছেলেরা কৃতবিদ্য হইয়াছে—তাহাদের কাহিনী এ যুগে বইয়ের পাতায় উদাহরণ হইয়াই রহিল! সে যুগের আলোয় এ যুগের অন্ধকার কাটিতেছে কৈ?

সংসারের তুচ্ছ কথা ও আমার ভাবনার ভিন্ন গতি মিলিয়া—আমার বর্তমানকে পর্য্যন্ত কোথায় ভাসাইয়া লইয়া গেল। শহরের অঙ্ক হইতে যেন পূর্ব্ব জীবনে ফিরিয়া আসিলাম। কি কালেই এক সময়ে বাস করিলাম! পাঠ্যজগতে মশগুল হইয়া কত রঙীন স্বপ্ন দেখা ছিল আমার নিত্যকর্ম্ম। আকণ্ঠ দুঃখের পুকুরে ডুবিয়া এ ছেলেও হয়তো সেই স্বপ্ন দেখিতেছে।

এক সময়ে ছেলেটি বাহির হইয়া গেল। বলিলাম, উঠি।

ওমা, সেকি কথা! কতদিন পরে এলে, একটু মিষ্টিমুখ না করে-

আমার খিদে নেই তো।

খিদে মোবার মত খাওয়া কি আর!

অগত্যা বসিলাম। কিছু কথা না কহিলে ভাল দেখায় না বলিয়া প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা, আপনারা দেশে গেলে খরচপত্র কিছু কম হয় নাকি?

হয়, কিন্তু খোকার লেখাপড়া চালানোর মত সংস্থান তো আমার নেই। দেশের জমিটাই আছে সত্যি—একখানা চালাও নেই যেখানে গিয়ে দুটোদিন মাথা গুজবো।

কিন্তু দেশে একটা আস্তানা রাখা ভাল।

তিনি ম্লান হাসিয়া কহিলেন, সেত জানি বাবা, কিন্তু যে সংসারে ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না—সেখানে বাহুল্য আসে কোথেকে? ওঁর মাইনেটুকুর ওপরই ভরসা ছিল, তাই কি মোটা মাইনে!

এমন সময়ে শাল পাতার ঠোঙা হস্তে খোকা ফিরিয়া আসিল।

একখানি ডিসে করিয়া খাবার সাজাইয়া তিনি আমার সম্মুখে রাখিলেন। পরিষ্কার কাঁসার গ্লাসে এক গ্লাস জলও দিলেন। পরে অনুরোধ করিলেন, একটু মুখে দাও, বাবা। হাত ধোবে? বেশ তো

ওখানেই ধোও। আমি মুছে নেব'খন। খোকা যা, ওপরে তোর দিদির কাছ থেকে একটা পান নিয়ে আয় তো।

খোকা পা বাড়াইতেই আমি খপ করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, পান আমি খাইনে। তুমি বোস আমার কাছে। দুজনে মিলে মায়ের খাবার শেষ করা যাক। বলিয়া জোর করিয়া তাহার হাতে একখানা সিঙ্গাড়া গুঁজিয়া দিলাম। সে আড়ষ্ট ও বিব্রত হইয়া তাহার মায়ের পানে চাহিল।

মা বলিলেন, উনি যখন দিচ্ছেন—না বলো না খোকা, খাও। পরে হাসিয়া বলিলেন, যদিও বলতে পারতাম ভারি তো খাবার, ওর হাতে আবার কেন? কিন্তু অল্প জিনিস বলেই ও কথা বললাম না।

বিস্মিত স্বরে বলিলাম, তাই বলা তো রীতি।

হাঁ, তবে বলে তোমার আর আমার দু'জনের লজ্জা বাড়াই কেন। আমি তো জানি—ও সামান্য জিনিস সব খেলেও তোমার খিদে মিটবে না। তবে তুমি যাতে আনন্দ পেতে চাও—তা থেকে তোমায় বঞ্চিত করি কেন।

আপনি এমন করে ভাবতে পারেন! মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া ফেলিলাম।

তিনি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ভবানীপুরের কথা অনেক দিন আমার মনে থাকবে বাবা।

আমার কিন্তু সে কথা মনে নেই।

তুমি কি দুঃখে মনে রাখবে বাবা। সে দুঃখ যে আমাকেই বিঁধেছিল।

জলের গ্লাসটা মুখে তুলিয়া লজ্জা বাঁচাইলাম।

উঠিবার মুখে বলিলাম, এখানে আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো?

না, অসুবিধে আর কি।

স্বর নামাইয়া বলিলাম, যিনি কথা কইছিলেন আমার সঙ্গে—ওঁকে ঠিক—,

তিনি বলিলেন, ওঁরই বাড়ি। বিধবা মানুষ, একটু শুচিবেয়ে ধাত। সব তাতেই খুঁৎ খুঁৎ করেন বটে, লোক ভাল।

প্রণাম করিয়া বিদায় লইলাম।

পথে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম তখনও ব্যাগটা আমার হাতে, কিন্তু ব্যাগের মধ্যে মারণাস্ত্রের দুর্ভর চিন্তা অনেকখানি সরল হইয়া আসিয়াছে। প্রসন্নমুখে উঁহাদের দুঃখ বহনের ক্ষমতা দেখিয়া—নিজের দুর্ভোগকে বহন করিবার জন্য কখন যে আমি মনে মনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলাম! গোয়েন্দা-অধ্যুষিত কলিকাতাকে আর তেমন ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছে না।

৬

রাত্রির আহার শেষ করিয়া চেয়ারে বসিয়া ছিলাম। সারা দিনটা যেন সাইক্লোনের মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। এত পরস্পর-বিরোধী চিন্তা ও আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটিয়াছে যে নিশ্চিন্ত হইয়া ভাবিবার ইচ্ছাও করিতেছে না। বই লইয়া পড়িব বা খাতা লইয়া কবিতা লিখিব তেমন মানসিক অবস্থাও নাই। ইলার কথা লইয়া খানিকটা চিন্তাও তো হতাশ প্রণয়ীর মত করিতে পারিতাম! অথচ সে প্রবৃত্তিও আসিল না।

প্রতিবাদ-আপিসের একটি কথাও মনে জাগিতেছে না। অত্যন্ত ক্লান্ত; মনের ক্লান্তি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে শিথিল করিয়া দিতেছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে অবসাদ। ঘুম আসিতেছে না—অথচ চোখ চাহিতেও ইচ্ছা নাই। চলচ্চিত্রের ছবির মত সারি বাঁধিয়া ঘটনা-চিহ্নিত অনেকগুলি

দিন ও রাত্রি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। রূপে, রঙে বা রসে সে গুলিকে মনের আয়নায় ধরিতে পারিতেছি না। ইচ্ছা হইল আলোটা নিবাইয়া দিই। ধীরে ধীরে উঠিয়া সুইচের দিকেই অগ্রসর হইতেছিলাম, বাহির হইতে ডাক আসিল, আসতে পারি কি ?

নীতিশবাবুর কণ্ঠস্বরে সমস্ত অবসাদ মুহূর্তে খসিয়া পড়িল। সম্ভ্রম-পূর্ণ স্বরে বলিলাম, আসুন—আসুন।

হাসিতে হাসিতে তিনি প্রবেশ করিলেন। হাতে তাহার 'প্রতিবাদ' মাসিক পত্র। সেখানা টেবিলের উপর রাখিয়া—তিনি চেয়ার গ্রহণ করিলেন।

জানালাটা খুলে দাও তো। মোটা মানুষ, হাঁপিয়ে উঠেছি।

জানালা খুলিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

আহা—দাঁড়িয়ে রইলে কেন, বোস। আমি আসন গ্রহণ করিলে কহিলেন, পড়লুম তোমাদের মাসিকপত্রিকা।

দুরু দুরু বক্ষে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন পড়লেন ?

টেবিলের উপর মৃদু টোকা দিতে দিতে তিনি কহিলেন, তোমাদের কাগজ পড়ে এইটুকু আমার মনে হ'লো আমাদের দিনের পৃথিবীর থেকে আজকের পৃথিবীর অনেকখানি তফাৎ।

প্রশ্ন-উন্মুখ চোখে তাঁহার পানে চাহিলাম। তিনি বলিতে লাগিলেন, ঊনবিংশ শতাব্দী আর বিংশ শতাব্দী এক নয়। দুটো শতাব্দীর বহির্জগৎ যেমন বিভিন্ন, মানুষের মনোজগতে তার প্রতিক্রিয়াও তেমনি বিচিত্র। যে সব লেখা আজ ক্লাসিক আখ্যা পেয়েছে, জানি না, তোমরা তার রস কতটুকু গ্রহণ করতে পার। অবৈজ্ঞানিক সস্তা ভাববিলাস আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে না রাখলেও—কিছু নাড়া দেয়, তোমাদের মনের কাছেও তারা ঘেঁষতে পারে না।

বলিলাম, তা হয়ত পারে না।

তেমনি তোমাদের—এ যুগের স্টাইলটা আমাদের মনকে ঠিক স্পর্শ করতে পারে না। চারিদিকের আবহাওয়া দেখে বুঝি—ভুল হয়ত তোমরা করনি। কেউই ভুল করে না। যেমন পারিপার্শ্বিক—তেমনই ফসল জন্মায়। অতিকায় ম্যামথরা আজ পৃথিবী থেকে লুপ্ত, তারা বিস্ময়ের বস্তু। মিল্টনের প্যারাডাইজ লষ্ট বা মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্যের উৎপত্তি আর সম্ভব নয়, লিরিকের যুগও অবসিত প্রায়। এখন যা দেখা দিয়েছে—তাই হয়ত কর্ম্মব্যস্ত মানুষের পক্ষে যথেষ্ট। কল্পনা এখন বিলাস নেই—যুক্তিবাদী মন দিয়ে সে সব কিছুকে ছুঁতে চায়। সহসা তিনি চুপ করিলেন। মনে হইল, কিছু ভাবিতেছেন।

জানালা খোলাই ছিল। আকাশে পূর্ণিমা-অভিমুখী আধখানা চাঁদ আর অনেকগুলি নক্ষত্র। মহানগরীর পথে ও প্রাসাদে বিদ্যুৎ-আলোর ঐশ্বর্য্য। আকাশের স্বপ্নময়তা মহানগরীর উদ্ধত ঐশ্বর্য্যের মাঝে ছায়া যে ফেলে না—এমন নহে; সেটা মনেরই এক শুভক্ষণের ঘটনা। রাত্রির গাম্ভীর্য্যে স্তিমিত-কোলাহল শহরের তন্দ্রা-শিথিল মুহূর্ত্তে চাঁদ ও নক্ষত্রেরা অত্যন্ত কোমল হয় এবং বেশি করিয়াই হয়তো হাসে। কিন্তু—

নীরবতা ভঙ্গ করিয়া নীতিশবাবু বলিলেন, সামান্য একটা দৃষ্টান্ত দিই কবি। তোমরা হায়েনার হাসি শুনতে পাও।

বলিলাম, হায়েনার শব্দ অনেকটা হাসির মত নয় কি?

শুনিনি কখনও। যাঁরা উপমা দেন তাঁরাও সবাই শুনেছেন কিনা জানিনা। আচ্ছা সে না হয় হলো। সাপের হাসি—সে কেমন কবি?

সাপের স্বভাবের সঙ্গে মিল রেখে ওই উপমাটি—

হা হা করিয়া হাসিয়া তিনি বলিলেন, অথচ—চাঁদ ও তারার হাসিকে তোমরা বাতিল করে দিলে অবাস্তব বলে!

বলিলাম, অবাস্তব বলে নয়, বহু ব্যবহৃত বলে।

তিনি হাসি না থামাইয়া—বলিলেন, পরিবর্ত্তন মনের ধর্ম্ম। কিন্তু শুধু কানের সঙ্গে যোগসাধন হ'লেই তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় কি? মনের দুয়ারও যে খোলা রাখা চাই।

তাঁহার হাসি দেখিয়াও—তর্ক করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। ভয়ে ভয়ে মন্তব্য করিলাম, বুঝলাম, আপনার ভাল লাগেনি।

তিনি হাসি মুখে ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ঠিক তা নয়। মনকে না মিলাতে যদি পেরে থাকি সে তোমাদের লেখার দোষ নয়, আমাদেরই রস গ্রহণের অক্ষমতা।

আপনি—ঠিকমত কথাটি বলছেন না।

কেন, তোমাদের মন খারাপ হওয়ার ভয়ে?—পরে উচ্চ হাসিয়া কহিলেন, না সুপ্রিয়, মন খারাপ হওয়ার ভয়ে কাউকে অস্পষ্ট করে কিছু বলা আমার স্বভাব নয়। অবশ্য স্পষ্টবাদিত্বের বড়াইও আমি করি না। আমার বিশ্বাস—স্পষ্টবাদীরা অনেক সময় আত্মপ্রতারণা করেন।

কি করে?

যা তাঁরা পছন্দ করেন না—তা নিয়ে তীব্র বিরুদ্ধ মত প্রকাশই তো স্পষ্টবাদিত্ব! তাহলে দেখ—সে ভাষণে সত্যের সঙ্গে অহঙ্কারের আর ঈর্ষার খাদ কতখানি! তাই অপ্রিয় সত্য বলতে ঋষিরা বারণ করেছেন।

তবু স্থলবিশেষে অপ্রিয় সত্য হিতকর।

তর্ক করব না। কিন্তু এখানে অপ্রিয় সত্য এই ভয়ে বলিনি—একথা যেন ভেব না। সত্যি, তোমাদের চিন্তা ধারাকে কতক ধরতে পারি—কতক পারিনা। যা আমার জ্ঞানবুদ্ধির বাইরে—তাকে অসম্মান করতে ভয় পাই, সুপ্রিয়।

সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলাম, শুনেছি—এবং দেখছিও—এ যুগের সঙ্গে কোথাও আপনার অসামঞ্জস্য নেই।

নেই কি আর সাথে! আমার মধ্যে কম পরিবর্ত্তন হ'য়েছে তুমি ভাব?

তাই তো আপনি সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। যুগের সঙ্গে যাঁরা পরিবর্ত্তিত হতে পারেন না—

পরিবর্ত্তন ঘটে খুব অল্পেতেই, সে সৌভাগ্য তো সকলের হয় না। অনন্ত জীবনের কল্পনা করলে—এ বোধ অত্যন্ত অনায়াসে জন্মায়। তবে সান্ত জগৎ অতিক্রম করে—অনন্ত জগতের পথে পা দেওয়া—অনেক দৈবঘটনার যোগসাজসে ঘটে। যেমন ধর দুর্ঘটনা। এ নাকি মানুষের জীবনে আসেই। যেমন ধর মৃত্যু। গভীর বেদনা জীবনের সঙ্কীর্ণতাকে মোচন করে, গভীর দুঃখ আত্মচৈতন্যের প্রদীপ জ্বালে। আশ্চর্য্য মানুষের জীবন! সমস্ত কিছু থেকে মুক্ত হবার সাধনা তার চলছেই। ঐশ্বর্য্য থেকে—পরম ঐশ্বর্য্যে, দুঃখ থেকে আত্ম অনুভূতিতে, রস থেকে রসভূয়িষ্ঠতাতে, জড়জ্ঞান থেকে পরাজ্ঞানে, সান্ত থেকে অনন্তে। দেশ, কাল, পাত্র সময়ের সঙ্গে ভেসে চলেছে—মনোধর্ম্মী মানুষও চলেছে সেই স্রোতে। জ্ঞান স্থানাশ্রয়, গতিটাই হচ্ছে জগৎ—সেইখানেই জীবনের যত প্রশ্ন—যত তর্ক—যত মীমাংসার প্রচেষ্টা। এই গতিপ্রবাহ স্তব্ধ করে—শেষ মীমাংসা—শেষ জ্ঞান—শেষ রসকে উপলব্ধি আমরা করতে পারি না।

ঋষিরা তা করেছেন।

উঁহু। তাহলে মহাভারত একথা বলতেন না—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না
নাসাবৃষিযস্য মতং ন ভিন্নম্।

তর্কের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ সম্যক্ স্থিরতা নাই, শ্রুতি সমূহ ও বিভিন্ন;

এমন কোন ঋষি নাই যাহার মত ভিন্ন নয়। ঋষিরা নয়, এ শুধু অনুভব করেন সাধকরা। কিন্তু সে কথা থাক—আমরা যখন সাধক নই।

তিনি হাসিলেন। সে হাসিতে আবহাওয়া তরল হইল না। কেমন থমথমে ভারি হইয়া চাপিয়া বসিল মনের উপর।

বহুক্ষণ টেবিলের উপর টোকা মারিয়া তিনি চিন্তার সঙ্গে তাল দিতে লাগিলেন বুঝি। বাহ্যজ্ঞান তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না—শুধু চিন্তার সূত্রে সে জ্ঞানের অভিব্যক্তিটুকু ওই ভাবেই প্রকাশিত হইতে লাগিল। টং টং করিয়া নীচের একটা ঘড়িতে দশটা বাজিল, তাঁহার করাঙ্গুলি-সঞ্চালনও বন্ধ হইয়া গেল। সুপ্তোত্থিতের মত কহিলেন, আচ্ছা সুপ্রিয়, তোমাদের জীবনটাকে কেমন মনে হয়? ভারি আশা-আনন্দ ভরা। কেবল পরিপূর্ণ চারিদিক, নয়?

সকলেরই তাই মনে হয় না কি?

সকলের কথা জানি না। জীবন পরিপূর্ণ তো বটেই। এই মুহূর্ত্তটি পরবর্ত্তী পরিপূর্ণ মুহূর্ত্তের একটি অংশ। এই দণ্ডের ঘটনার সঙ্গে পরদণ্ডের ঘটনার সংযোগে—পরিপূর্ণ একটি কাহিনী গড়ে ওঠে। তবু দুটি ভগ্নাংশের মধ্যে স্থিতি কোথায়? যে কাহিনী তারা তৈরী করলো—তারা কি রইলো কাহিনীর মধ্যে? তারা কি অনন্ত গতির মধ্যে মিশিয়ে গেল না? তুমি বলবে, ইঁট একটা খণ্ড, কাঠ লোহা চুন সুরকি সবই এক একটা খণ্ড; মানুষের শ্রম, কল্পনা, রুচিবোধ এসবও আর কতকগুলি খণ্ডাংশ। এই সমস্ত খণ্ডাংশ মিলেই তো এই ঘরটা তৈরী হয়েছে। এর মধ্যে প্রত্যক্ষ যেগুলি সেইগুলিকে স্বীকার করলেই—অপ্রত্যক্ষগুলিকে অস্বীকার করতে পারি না। তবু সেগুলি স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিস নয়। তেমনি জীবন। তোমার আজকের জীবন যা সৃষ্টি করে আনন্দে বিভোর

হচ্ছে—দশ বছর পরের জীবন তার চেয়ে গভীর কিছু সৃষ্টি করে আনন্দ পাবে। তোমার আজও সার্থক—সেদিনও সার্থক। তোমার সব শেষের জীবনে যে কাহিনীর পরিণতি লোকের কাছে পড়ে থাকবে—তুমি শুধু তা নও—তোমার প্রতিদণ্ডের অনুভূতি—প্রতি মুহূর্ত্তের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে গতিধর্ম্মী মনোভিলাষ সেই কাহিনীর মূল উপাদান। সুতরাং কাহিনীকে অতিক্রম করে যে তুমি নিত্যসত্তাবান—তাকে পাওয়া কষ্টসাধ্য নয় কি ?

কিছু না বুঝিয়াই চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিতে লাগিলেন, শুধু ভরানো—জীবনকে ফাঁকা রাখলে চলে না।

বলিলাম, সে কথা সত্য। তাই তো আমাদের সাহিত্য-সাধনা।

তিনি বলিলেন, সাহিত্য সাধনমার্গের একটা উপায়, সবটা নয়। যদি কাল তোমাদের কাগজখানা উঠেই যায়—, অপাঙ্গে চাহিয়া বলিলেন, এমন অশুভ কথা উচ্চারণ করছি বলে আমায় মাপ করো।

না—আপনার কথা মিথ্যা নয়। কাগজের প্রথম সংখ্যাই বোধ হয় শেষ সংখ্যা।

অ্যাঁ, বলকি ! আমি যে হাক্সলির সেই বিখ্যাত কথাটাই বলতে চাইছিলাম :

The leisured classes take up art for the same reasons as they take up bridge—to escape from boredom. সত্যিই কি তোমাদের একঘেয়েমি কাটাতে তোমাদের সাহিত্য-চর্চ্চা !

হয়ত সত্যি।

কিন্তু তারপরের সত্যি কথাটা শোন। With sport, and love making, art helps to fill up the vacuum of their existence. শুধু vacuum পূর্ণ করার দরকার। নইলে মানুষ বাঁচবে কি করে !

কিন্তু সাধনা আমরা করিনি, কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে নিষ্ফল হলাম।

না। একটা দেশলাইয়ের কাঠি নষ্ট হ'লে আগুন জ্বালাবার চেষ্টাটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল—একথা বলতে পারি না। আলোলাভের ইচ্ছা থাকলে কাঠির পর কাঠি তোমাকে জ্বালাতেই হবে। **To fill up the vacuum** সুপ্রিয়।

যদি না জ্বালি?

তাতো জীবনের ধর্ম্ম নয়। জ্বলতে তোমায় হবেই। এক রূপে নয়—আর এক রূপে। **With sport or love-making**—বলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

সহসা হাসি থামাইয়া বলিলেন, ওহো, ভাল কথা মনে পড়লো। কাগজ কলমটা একবার দাও তো?

কাগজ কলম অগ্রসর করিয়া দিলে—চেয়ারটা আর একটু টেবিলের ধারে টানিয়া কলম তুলিয়া লইলেন। একটি ছত্র লিখিবার পর সহসা কলমটি টেবিলের উপর রাখিয়া আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, আজ কি বার, সুপ্রিয়?

বৃহস্পতিবার।

ঠিক। বলিয়া কাগজের প্যাড ঠেলিয়া সরাইয়া দিলেন।

লিখবেন না? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলাম।

না। একটু থামিয়া বলিলেন, 'কেন?' জিজ্ঞাসা করলে না?

হয় তো লেখবার প্রয়োজন নেই।

প্রয়োজন জরুরি। তবু লিখলাম না। ডি, এল, রায় ঠাট্টা করে যাই বলুন, আমি পারলে বিষ্যুদ্‌বারে জন্ম গ্রহণ করতাম না।

আপনিও বিষ্যুদ্‌বার মানেন?

মানি। জানি কুসংস্কার, তবু মানি। এ মানার সঙ্গে জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে কিনা। তুমি হয়ত শুনে থাকবে—এ বাড়ির যত দুর্ঘটনা সব এই বারটিতে ঘটেছে।

সহসা বিনয়বাবুর কথা মনে পড়িল। মাথা হেলাইয়া কহিলাম, কিছু জানি বটে।

তিনি বলিলেন, অনন্ত জীবনের আস্বাদ ওই বারের প্রত্যেক ঘটনাতে পেয়েছি। দুঃখ আমায় আত্মদর্শন করিয়েছে, তাই ওকে ভুলতে পারি নি। আমার মন বলে, এ কুসংস্কারও আমার একদিন ভাঙ্গবে। এবার দুঃখ আসবে অন্যপথে—ভিন্ন মূর্তিতে। হয়ত তাতে পাব মুক্তি। তবু যতক্ষণ সে না আসে—। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, একটা দৃষ্টান্ত দিই। আমার একজন মুসলমান বন্ধু ছিল। যাকে বলে অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। একদিন ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হ'লো। অর্থাৎ আমরা চড়িভাতির ব্যবস্থা করলাম। সবাই তাকে পংক্তিতে বসিয়ে পরিতৃপ্তির সঙ্গে আহার করলে—আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলো। শুয়ে শুয়ে ভাবলাম, আজন্মের শিক্ষা আর সংস্কারের বালাই বোধ হয়। অনেক ভেবে দেখলাম—ওগুলোও আছে, তার চেয়ে আছে আর একটি অভাব। যার জন্য অভিন্ন-হৃদয় মনে করেও—অভিন্নতা অনুভব করতে শিখিনি। সেটি কি জান? ভালবাসা।

ভাল না বাসলে আপনাদের বন্ধুত্ব হ'লো কি করে?

কি করে? কিন্তু তুমি ভালবাসা বলছ কাকে? রুচির মিলন মতের মিলন, না সঙ্গলিপ্সাকে?

হয়ত সবগুলিকেই।

অথচ ওগুলো মিলিয়েও মানুষ মিলতে পারে না। মানুষ এমনি

স্বতন্ত্র যে রুচি যেখানে মিলল না, মতের যেখানে প্রতিষ্ঠা হলো না, বা আসঙ্গলিপ্সা এলো না—সেখানে বিমুখ হওয়াই তার ধর্ম্ম। অথচ ওগুলো মিললেও সে মনের সঙ্গে এক হতে পারে না।

কেমন করে?

যেমন ছাদে উঠবার আগে সিঁড়িটার ওপর ভালবাসা। পথের শেষে থাকে আশ্রয়। সেখানে পৌঁছুতে না পারলে অনন্ত পথ চলা পণ্ডশ্রম মনে হয় না? আমরা কাকে ভালবাসি? পথকে, না আশ্রয়কে?

আশ্রয়ের জন্যই তো পথকে ভালবাসি।

ঠিক তাই। ওই মত, রুচি, সঙ্গ ওগুলি হলো পথ, ভালবাসা আশ্রয়। আশ্রয় পাইনি বলেই তো—পথকে নিয়ে এত খুঁৎ খুঁতুনি।

কিন্তু সংস্কার?

ভালবাসা না জন্মালে সংস্কার কাটানো যায় না। তারপর সেই মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে কতদিন আহার করেছি—একটুও খুঁৎখুঁৎ করেনি মন।

তাহলে তাকে ভালবেসেছিলেন।

তা জানি না। তবে যা নিয়ে আমার মন খুঁৎ খুঁৎ করে—তাকেই জোর করে উড়িয়ে দিয়েছি জীবনে, শুধু এই অশুভ বারটাকে উড়িয়ে দিতে পারলাম না।

তিনি চুপ করিলেন। স্তব্ধগাম্ভীর্য্যে ঘর ভরিয়া উঠিল—বাহিরের প্রকৃতিতেও থমথমানি ভাবটা ব্যাপ্ত হইয়া গেল। আড়মোড়া ভাঙ্গিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইংরেজী প্রথায় হাত কপালে ঠেকাইয়া শুভরাত্রি জ্ঞাপন করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, কোন একটা উঁচু স্থান হইতে সহসা যেন স্খলিত হইয়া পড়িতেছি। সর্ব্বাঙ্গে আড়ষ্টতা—অসহ্য শিহরণের সঙ্গে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। পরিত্রাহি চীৎকার করিতেছি—গলার কাছে ঘড় ঘড় করিয়া উঠিতেছে, কোন আওয়াজ বাহির হইতেছে না। সর্ব্বাঙ্গ নাড়িয়া পতনকে রোধ করিতে চাহিলাম। স্বপ্নের মধ্যেও অনুভব করিলাম—ইহা স্বপ্ন। তবু শঙ্কা কাটিতে চাহেনা। এমন সময় কাহার মিষ্ট আহ্বানে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। ঘর্ম্মাক্তকলেবরে চক্ষু চাহিলাম।

দুয়ারে খুট্‌খাট্ শব্দ। মৃদুকণ্ঠে কে যেন ডাকিতেছে, শুনছেন? ও সুপ্রিয়বাবু, শুনছেন?

জাগিয়াও মনে হইল, আবার বুঝি স্বপ্ন দেখা চলিতেছে! কিন্তু প্রভাত-রৌদ্রের দাক্ষিণ্যে একটু পরেই সে ভুল আমার ভাঙ্গিল।

দুয়ার খুলিতেই সম্মুখে অনুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, আপনি?

হ্যাঁ। বলিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সে দুয়ার অর্গলাবদ্ধ করিল।

অধিকতর বিস্ময়ে ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইলাম।

অনু চাপা গলায় ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিল, শীগ্‌গির দিন।

কি?

কাল যা রেবাদি আপনার কাছে দিয়েছেন।

ওঃ। কিন্তু আজই এই সকাল বেলায় নিয়ে যাবার কি দরকার?

দরকার আছে বলেই এলুম। দিন। হাত বাড়াইয়া সে ইঙ্গিত করিল।

চামড়ার ব্যাগটা খুলিয়া কাগজমোড়া পিস্তলটা অনুর হাতে দিতে দিতে বলিলাম, কিন্তু এ নিয়ে কি করবেন?

বস্ত্রাভ্যন্তরে সেটি সংগোপন করিয়া মৃদু হাসিয়া অনু উত্তর দিল, আর যাই করি—নরহত্যা করব না।

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, না, না, তা বলিনি।

যাই বলুন। এটার সম্বন্ধে বেশি যদি জানবার কৌতূহল হয়—প্রতিবাদ আপিসেও যেন যাবেন না।

কেন?

ওবেলা এসে পারি তো গল্প করব। নমস্কার। দ্রুতপদে সে চলিয়া গেল। কাল সন্ধ্যাবেলা যে ভার হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য ছট্‌ফট্ করিয়াছি—অনু বিনা ভূমিকায়—বিনা আয়াসে তাহা সুসম্পন্ন করিয়া দিল। নূতন প্রভাতে অনুকে নূতন করিয়া চিনিলাম যেন—মনে মনে কৃতজ্ঞ হইলাম।

অপরাহ্নে যথারীতি ওয়ারেণ্ট লইয়া খানাতল্লাসী সুরু হইল—এই বাড়িতে। নীতিশবাবু গম্ভীরমুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া আদ্যোপান্ত দেখিলেন। পুলিস-অফিসার সৌজন্যের হাসি হাসিয়া বলিলেন, মিষ্টার দাশ, কিছু মনে করবেন না—নেহাৎ কর্ত্তব্যজ্ঞানে—

নীতিশবাবু হাসিয়া উঠিলেন, মোটেই না। আইনের সঙ্গে সৌজন্যের সম্পর্ক কি? বলেন যদি অন্তঃপুরটাও—

না, না, এই ঘরটির উপরেই আমাদের লক্ষ্য ছিল।

নীতিশবাবু সোজা হইয়া চেয়ারে বসিয়া পূর্ণদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন, আশ্চর্য্য ত! এতবড় বাড়িটার মধ্যে শুধু এই ঘরখানি! এমন অদ্ভুত সার্চ্চ করার নিয়ম তো কোথাও শুনিনি! সুপ্রিয়বাবুকে—আপনাদের সন্দেহ হয়?

পুলিস-অফিসার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, সন্দেহ আমরা সারা কলকাতার লোককে করি।

এতো আর যথার্থ উত্তর নয়।

না। গোপন কথা বলা নিষিদ্ধ হ'লেও—এইটুকু শুধু জানাচ্ছি—এই ঘরখানার ওপরই আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি রেখেছিলাম। নমস্কার। তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

নীতিশবাবু একবার আমার পানে চাহিলেন। কি মর্মভেদী সে চাহনি! অপরাধী না হইলেও কম্পিত অন্তরে মাথা নামাইলাম। অতঃপর চাহিলেন বিনয়বাবুর পানে। বিনয়বাবু অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, এই টিকটিকিগুলোর জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে।

হুঁ। আমার দিকে চান তো বিনয়বাবু? এদিকে চান।

শুকনা মুখে হাসি টানিয়া বিনয়বাবু বলিলেন, আপনি ঘাবড়াবেন না মিঃ দাশ। ডেপুটি পুলিস কমিশনারের সঙ্গে আমার আত্মীয়তা—

নীতিশবাবুর কঠিন মুখের পানে চাহিয়া তিনি কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

সম্ভব। সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিলেন। হাসিটা ঠিক আমাকে উদ্দেশ করিয়া নহে, অনেকটা স্বগত হাসি। কোন কিছু সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আরও কয়েকবার তাঁহাকে এমনভাবে হাসিতে দেখিয়াছি।

এটা কি মাস বিনয়বাবু? গম্ভীর স্বরে তিনি প্রশ্ন করিলেন।

নভেম্বর।

আজ কত তারিখ?

চব্বিশ তারিখ আজ।

আচ্ছা—পুরো মাসের মাইনেই আপনি পাবেন। এখন আসতে পারেন।

বিনয়বাবু থতমত খাইয়া বলিলেন, পুরো মাসের মাইনে মানে—

পুরো মাসের মাইনে মানে—আধা মাসের মাইনে নয়। বুঝেছেন? আর আমার সেক্রেটারির দরকার নেই। কর্পোরেশন ছাড়ব—পৌরহিত-ব্রত ছাড়ব—শুধু কংগ্রেসের সেবা নিয়ে দিন কাটাব। বয়স হ'য়েছে, মন ভরাতে গিয়ে তাকে ভারগ্রস্ত করব না।

আপনি আমায় জবাব দিচ্ছেন?

তিনি একটু থামিয়া—দেওয়ালের পানে চাহিয়া নম্রকণ্ঠে কহিলেন, সেক্রেটারির দরকার নেই—শুধু এই কথা জানিয়ে দিলাম। বেশত, যতদিন আপনি কোথাও কিছু সুবিধা না করতে পারেন—আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবেন।

তাহলে—ততদিন আমাকে এখানে থাকতে হবে। কাজ করব না, অথচ মাইনে নেব—

না। এখানে আপনার থাকা চলবে না। আজই অন্যত্র চেষ্টা দেখুন। যদি অসুবিধা হয়—কোন হোটেলে ফোন করে দিই। বলিয়া টেলিফোনের রিসিভারটা তুলিয়া লইলেন।

বিনয়বাবু সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। রুক্ষস্বরে বলিলেন, ধন্যবাদ আপনাকে। কলকাতা আমার অচেনা জায়গা নয়, হোটেল আমি চিনি।

রিসিভারটা নামাইয়া রাখিয়া নীতিশবাবু বলিলেন, আ রিভোয়া।

বিনয়বাবু তেমনই উষ্ণ কণ্ঠে বলিলেন, মনে করবেন না—আমি কিছু বুঝিনি।

নীতিশবাবু হাসিয়া বলিলেন, সুপ্রিয় না বুঝতে পারে—আপনি বুঝবেন বৈকি। নমস্কার। তাঁহার হাসির ধ্বনি উচ্চ হইল। চিবুক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত মাংসপিণ্ডে তরঙ্গ জাগিল।

রাগে গর গর করিতে করিতে বিনয়বাবু বাহির হইয়া গেলেন।

মনে মনে অত্যন্ত খুসী হইলাম।

নীতিশবাবু সহসা আমার পানে ফিরিয়া কহিলেন, আজ পার তো একটা কবিতা লিখো সুপ্রিয়। এমন সুন্দর রাত্রি জীবনে কম দিনই আসে।

সে কথা অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত আমিও মনে মনে স্বীকার করিলাম। তথাপি কবিতা লিখিতে পারিলাম না। সুন্দর প্রকৃতি ও সমস্ত কবিতাকে ছাপাইয়া, সারা অন্তরের কৃতজ্ঞতাকে গভীর করিয়া শ্যামলা স্বল্পবাক্ অনুই সেই রাত্রিতে অধিকতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মধ্যে একদিন রেবার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। এস্প্লানেডে ট্রাম বদল করিয়া কালিঘাটের ট্রামের প্রতীক্ষা করিতেছি, পিছন হইতে সহাস্য-বদনা রেবা আমায় আহ্বান করিল, চিনতে পারেন?

হাসিমুখেই বলিলাম, না। একমাস বড় কম সময় নয়। কলকাতায় ছিলেন না কি?

না। কাল মাত্র আপনাদের শহরে এসেছি।

তবে কি ওয়ালটেয়ারে ছিলেন?

স্মরজিৎবাবু ভাইজাগে ছিলেন বলে এই রকম অনুমান করছেন বুঝি?

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, অনেকটা তাই।

আপনার অনুমান মিথ্যা নয়। কলকাতার শীতটা আমার সহ্য হয় না।

আপনার শীত সহ্য হয় না!

হাসিয়া রেবা বলিল, না। দারুণ গ্রীষ্মেও ভারি কষ্ট বোধ করি।

সে সময় বুঝি পাহাড়ে গিয়ে থাকেন?

এইধারে আসুন তো—ওইখানে একটু বসা যাক। বলিয়া আমাকে আকর্ষণ করিয়া—জনকোলাহল হইতে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে টানিয়া আনিল।

স্বর নামাইয়া কহিল, আমরা পাহাড়ে গেলে কোন গরীবের রক্ত-শোষণ-নীতির অনুসরণ করি না। আনন্দের জন্যও আমাদের পাহাড়-ভ্রমণ নয়। যাই হোক, পাহাড়-প্রসঙ্গ থাক। আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য এদিকে টেনে আনলুম।

কিসের ধন্যবাদ?

মাসখানেক আগের কথা মনে করে দেখুন। খোকাকে এমন লুকিয়েছিলেন যে তার বাপমাও খুঁজে বার করতে পারলেন না।

হেমচন্দ্র কানুনগোর বইখানা পড়িয়াছিলাম, 'খোকা' কথার অর্থ গ্রহণে বিলম্ব হইল না। মৃদুস্বরে বলিলাম, সে তো আপনার জন্যই—

আমার! কই না-ত! যতদূর আমার মনে পড়ে—তার পরদিনই আমি ওয়ালটেয়ার যাত্রা করি। নিশ্চিন্ত ছিলাম বলেই ও বিষয়ে বেশি মাথা ঘামাইনি।

বলিলাম, শ্রীমতী অনু এসে তার পর দিন ভোর বেলাতেই খোকাকে নিয়ে গেলেন যে।

অনু! খানিকটা বিস্ময়ের পর—রেবা চিন্তা করিতে লাগিল। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। চৌরঙ্গির চারিদিকে বিচিত্র ধরণের আলো

জ্বলিয়া উঠিতেছে। মেট্রোর অগ্নিঅক্ষরের নিয়ন লাইটগুলি—নীল জমির উপর সৌন্দর্য্যজাল বুনিতে সুরু করিয়াছে। আধ-আলো আধ-অন্ধকারের মধ্যে—একটা করবীকুঞ্জের পাশে দাঁড়াইয়া আমরা গল্প করিতেছিলাম। পথের আলো-ছায়ার মিশ্রণ রেবার চিন্তাকুটিল মুখেও আসিয়া পড়িয়াছে। বহুক্ষণ পরে সে কহিল, আপনি কখনো কাউকে ভালবেসেছেন, সুপ্রিয়বাবু?

না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলাম। ইলাকে ভাল-লাগার মোহটা যেন অতিক্রম করিয়াছি, অন্যকে ভাল-লাগার চিন্তাটিও আজকাল সযত্নে পরিহার করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই বয়সটাই—যেন প্রকৃত ভালবাসাকে চিনিয়া লইবার পক্ষে বিঘ্নস্বরূপ। প্রকৃতির চোখ দিয়া যে রূপময়ী পৃথিবীকে প্রত্যহের পরিচয়ে নিবিড়ভাবে দর্শন করিতেছি, বুঝিতেছি—সে পৃথিবীর ভিন্নরূপ মুহূর্ত্তের পাখায় ভর করিয়া দৃষ্টির বিভ্রম জন্মাইবে। হয়ত দৃষ্টিই অস্বচ্ছ, তাই বিভ্রমের কথাটা না মনে করিয়া পারি না। তবু স্বপ্নকে রঙীন করিতে অন্নসমস্যাযুক্ত জীবনকে সর্ব্ববাধা বিমুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিতেছি না। এ যুগটাই আত্ম-বিস্মরণের যুগ নহে, আত্ম-জাগৃতির যুগ।

রেবা বলিল, ভালবাসতে শিখুন সুপ্রিয়বাবু, নইলে জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাবেন না।

ভালবাসলেই তো চোখে ঠুলি পরতে হবে—জগতের প্রকৃত রূপ বা জীবনের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণ করতে পারব না।

তাই নাকি! ঈষৎ হাসিয়া সে কহিল, না-ই বা চিনলেন জগৎকে, নাইবা জানলেন জীবনকে রুটিন-বাঁধা পথে—নিজের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ করবার মন্ত্র যদি আপনি পান?

সাহস করিয়া বলিলাম, আপনারা কি সম্পূর্ণ হয়েছেন?

ঘাড় নাড়িয়া রেবা বলিল, হয়েছি বৈকি। যে শক্তি লাভ করলে মানুষ সম্পূর্ণ হয়েছি বলতে পারে—সে শক্তি অনুভব করি বৈকি, সুপ্রিয়বাবু।

তবে বিবাহের মধ্যে—

অমন ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আমাদের ভালবাসাকে ধরে রাখতে পারি না—সুপ্রিয়বাবু। এ ভালবাসা নিজেকে আত্মসাৎ করেও সুখী নয়—জগৎকে টানতে চায়।

আপনাদের আমি কোনদিন বুঝতে পারি নি!

পারেন নি—কারণ বোঝবার চেষ্টা তো করেন নি। একটু থামিয়া বলিল, আর নয়। যদি যান—কাল একবার ওদিকে যাবেন—আরও দুই একটি কথা বলব। বলিয়া চলিবার উপক্রম করিতেই আমি মৃদুস্বরে বলিলাম, অভয় দেন তো একটা কথা বলি।

আমাকেও ভয়!

আপনাদেরই বেশি ভয় করি। বলিয়া ইতস্ততঃ করিয়া কহিলাম, যে পথে আপনারা পা বাড়িয়েছেন—ওপথ থেকে ফেরা যায় না কি?

রেবা খানিকক্ষণ আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, না। চলা মানে চলাই, থামা নয়।

একদিন স্বরজিৎবাবু বলেছিলেন—

জানি। সে হ'লো পথে নামবার আগে বিচার-বিতর্কের কথা। পথে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমরা শেষ করে দিয়েছি।

এ কি ভাল?

কেমন করে বলব! ভাল বলেই লোকে একটা যা-হয়-কিছু বেছে নেয় —ফলনির্দ্দেশ করে ভবিষ্যৎ।

এ পথের নিষ্ফলতা—

রেবা হাসিয়া বলিল, সব দেশের সাধুরাও বলেন—ঈশ্বর এক, পথ ভিন্ন। তাঁর কাছে পৌঁছবার যখন এত বিভিন্ন রাস্তা—

বাধা দিয়া বলিলাম, সব পথই তো সুপথ নয়। দুর্গম রাস্তায়—বিপদ বেশি—সফল হবার আশা কম।

আমরা পথিক, চলবার কথাই জানি, ফলাফলের প্রত্যাশা কম রাখি। বিপদ? প্রভাত সূর্য্যকে যাঁরা চিরকাল কোমল দেখে এসেছেন—তাঁদের কথা আলাদা। আমরা—সেই তমোহরের জবাকুসুমসঙ্কাশ রূপ দেখি না। আমাদের মন্ত্র:

প্রভাত সূর্য, এসেছ রুদ্রসাজে,
দুঃখের পথে তোমার তূর্য্য বাজে
অরুণ বহ্নি জ্বালাও চিত্তমাঝে,
মৃত্যুর হোক লয়,
তোমারি হউক জয়।

কথায় কথায় আমরা ট্রাম চলাচলের পথে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রেবা শ্যামবাজারগামী গাড়িতে উঠিয়া যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া বলিল, কাল-পরশুর মধ্যে যাবেন একদিন।

সে কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিল না। ট্রামের ঘর্ঘর আওয়াজের মধ্যে আমি শুধু সেই অদ্ভুত কবিতার শেষ চরণ দুটির আবৃত্তি শুনিতে লাগিলাম:

মৃত্যুর হোক লয়,
তোমারি হউক জয়

২

পরের দিন তরুকে পড়াইতেছিলাম---দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জীবন।

তরু বলিল, আপনি দেশবন্ধুকে দেখেছেন মাষ্টার মশায়?

ঘাড় নাড়িয়া কহিলাম, না। দেশবন্ধুর মৃত্যুতে রবীন্দ্রনাথ যে দু'ছত্র কবিতা লিখেছিলেন---তা মুখস্থ করবে।

তরু গড় গড় করিয়া সেই অনবদ্য কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল তাহার কৃতিত্বকে বেশিদূর অগ্রসর হইতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিধায় তরু কহিল, কেন সেদিন যেটা বললেন---অরবিন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সে দু'লাইন: অরবিন্দ, রবীন্দ্রের লহ নমস্কার। কি সুন্দর!

আমি মৃত্যুহীন প্রাণের সরল ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবার মুখে নীতিশ বাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন, সত্যিকার সুন্দর মৃত্যু কখনো দেখেছ সুপ্রিয়?

মাথা নাড়িলাম।

তিনি চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। বলিলেন, তবে শোন তোরাও শোন্। যেদিন দেশপ্রিয়ের মৃতদেহ রাঁচি থেকে কলকাতায় আসে---সেইদিনের কথা বলছি। কি বিরাট সেদিনের জনসমুদ্র তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না। আর কি আশ্চয্য রকমের স্তব্ধ সেই জনতা। সমস্ত বেদনা দীর্ঘ-নিশ্বাস আর অশ্রু বরফের মত সেখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। মনে হ'চ্ছিল---সমস্ত শহরে আজ আগুন জ্বলছে. ঘরের কোণে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবে কে? কিন্তু কতক্ষণের জন্যই বা সে ভাবনা! জনতার থেকে বার হয়ে বাড়ির দুয়োর পর্য্যন্ত আসতে যেটুকু পথ কেঁটেছি---তার মধ্যেই মৃত্যুর পরমক্ষণেও জীবন দেবতার বাণী শুনতে

পেলাম। অদ্ভুত মহানগরী আর অদ্ভুত তার পথ, সুপ্রিয়! ক্ষতির বেদনা আর মনে তেমন তীব্র হয়ে রইলো না।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া তিনি···চুপ করিলেন। খানিক পরে তিনি বলিলেন, ব্যথা সর্ব্বক্ষণের জন্য থাকে না। তা যদি থাকত—

কথা তাঁহার শেষ হইল না, ঝড়ের বেগে বড়বাবু সেই কক্ষে ঢুকিয়া প্রায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বাবা।

নীতিশবাবুর করুণ মুখে দৃঢ় দু'একটি শিরা প্রকটিত হইয়া উঠিল। সংক্ষিপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, কি চাই?

আপনি কি আমায় মেরে ফেলতে চান? কণ্ঠস্বরে মত্ততাজনিত করুণ রসের প্রাচুর্য্য।

নীতিশবাবু শান্তকণ্ঠে কহিলেন, মরণ কি এমনই তুচ্ছ! তা নয়।

বিনয়বাবুকে আপনি তাড়ালেন—আমি বাঁচি কি করে! এত নির্দ্দয় যদি হন—you merciless—

হাত তুলিয়া নীতিশবাবু বলিলেন, থাম। বিনয়বাবুর কথা রেখে তোমার কথা বল। নাতি-নাতিনীদের প্রতি ফিরিয়া কহিলেন, তোমরা যাও তো দাদুভাই।

বড়বাবু বাহুবিস্তার করিয়া প্রায় ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে কহিলেন, না, কুকুর-শেয়াল পর্য্যন্ত আমার দুঃখে কাঁদে—ওরাও কাঁদুক। যার বাবা নির্ম্মম—যার বাবা পাষাণ—

অজিত!—চিকণ-গম্ভীর কণ্ঠে নীতিশবাবু ডাকিলেন।

অজিত ওরফে বড়বাবু নীতিশবাবুর পায়ের তলায় প্রায় শুইয়া পড়িয়া ক্রন্দনউচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন, মেরে ফেলুন—গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলুন আমায়। হাতখরচ কমালে আমি বাঁচব না।

অগত্যা ভৃত্য হারাধন—দুইজন দ্বারবান লইয়া রোরুদ্যমান বড়বাবুকে

স্থানান্তরিত করিল। মৃত্যুমহিমাপূত কক্ষ—দূষিত বায়ুতে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কাটিল। নীতিশবাবু স্থানুমূর্ত্তির মত বসিয়া আছেন, আমার অবস্থাও তদ্রূপ। অন্যের সংসারের অশান্তি ও গ্লানি উদ্‌ঘাটিত হওয়াতে লজ্জাটা আমারই বেশি বলিয়া মনে হইতেছে। বুঝিতেছি, এই দণ্ডে স্থানান্তরিত না হইলে সহজভাবে নিশ্বাস ফেলাও মুশকিল অথচ স্থানান্তরে যাওয়ার ইচ্ছাকেও আত্মসুখপরায়ণতা ভাবিয়া বেশি করিয়া লজ্জিত হইতেছি। নীতিশবাবু যে আঘাত পাইয়াছেন—তাহাতে সান্ত্বনা দেওয়া চলে না, অথচ একটা কোন কিছু না বলিয়া আবহাওয়াটাকে তরল না করিয়াই বা স্থানত্যাগ করি কি করিয়া?

বহুক্ষণ পরে নীতিশবাবুই কথা কহিলেন। আমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, আঘাত আমি পাইনি, সুপ্রিয়, শুধু ভাবছিলাম—এই জন্মের ফলটা—এই জন্মেই হাতে হাতে পেয়ে গেলাম। তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্ত নিঃশব্দ ম্লান হাসিতে তরঙ্গিত হইয়া উঠিল।

চুপ করিয়া রহিলাম।

তিনি বলিলেন, তুমি হয়ত মনে করছ—দুঃখ পেলাম! সবাই তাই মনে করে। কিন্তু আশ্চর্য্য দেখ—মানুষের অতীত কতবার তার সামনে ফিরে ফিরে আসে। এ সংসারে পুনরাবৃত্তি বড় বেশি। একটু থামিয়া বলিলেন, তবু মানুষ বোঝে না। বুঝতে চায় না। ভাবে অন্যের বেলায় যে কর্ম্মের যে ধ্রুব ফল লাভ হলো—আমার বেলায় তার ব্যতিক্রম ঘটবেই। কিংবা আমি যা ভুল করছি, আমার কল্যানীয়রা সে ভুল অনায়াসে শুধরে নেবে!

সাহস করিয়া বলিলাম, অগ্রগামীদের ভুল পরবর্ত্তীরা শুধরে নেবে বৈ কি।

প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে শুধু নয়। মাথা নাড়িয়া তিনি বলিলেন, বুদ্ধির অনুশীলন বা জ্ঞানের অনুশীলনে যে ভুল—সে ভুলের সংশোধন আছে, হৃদয়-বৃত্তিকে নিয়ে যে ভুলের আরম্ভ তার আর ভিন্ন পথ কোথায়?

কেন?

কেন? প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং। অমন যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জুন তিনিও শ্রীকৃষ্ণকে বললেন ঃ

চঞ্চলং হি মনো কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়

তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং

বড় শক্ত, সুপ্রিয়।

কি বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া বলিলেন, অবশ্য শ্রীভগবান তার উত্তরে বলছেন, সে কথা সত্য। তবে অভ্যাসের দ্বারা এমন যে বলবান ইন্দ্রিয়—তাকেও বশীভূত করা যায়। এবং তাতে বৈরাগ্য লাভও হয়। কিন্তু সে কথন? কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানকে নিয়ন্ত্রিত করতেই তো যৌবনের সীমায় এসে পড়ি আমরা। ধর আমার জীবন। তুমি আজ অজিতকে দেখে—অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়েছ। কি করে—এমন ঘরে ওর উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি সম্ভব হলো।

আশ্চর্য্যের কথা বৈকি।

কিছুমাত্র নয়। এ বংশের ইতিহাস তুমি জান না, তাই আশ্চর্য্য হ'চ্ছ? শোন তবে। আমাদের ঐশ্বর্য্য, তুমি দেখেছ, এ ঐশ্বর্য্য এক পুরুষের সঞ্চয়ে বেড়ে ওঠে নি। কয়েক পুরুষ ধরেই আমরা ধনী—অর্থাৎ জমিদার। আমার পিতামহ কলকাতায় এসে বাস করেন। তাঁর পূর্ব্বে—যাঁরা গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন—তাঁরা সেকালের জমিদার মনে রেখো—তাঁদের অপরিমিত অর্থ ও ক্ষমতার অপব্যবহারও যথেষ্ট হয়েছে। সে কালের যা প্রথা ছিল— প্রজা শাসন ও প্রজা পালন অর্থাৎ ব্যভিচার ও

মন্দির প্রতিষ্ঠা, নরহত্যা ও দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, দাঙ্গাহাঙ্গামা ও তীর্থযাত্রা, আভিজাত্যবোধ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার জেদ—কোনটাই তাঁদের কম ছিল না। আমার পিতামহ এলেন কলকাতায়। এখানে ইংরাজের আইনে—উগ্র মর্য্যাদাবোধ নিয়ে আইন লঙ্ঘন করবার নিয়ম নেই। লঙ্ঘন করলে তার শাস্তি আছে, কাজেই সে মর্য্যাদাকে ভিন্ন পথে বইয়ে দিতে হ'লো ; ফলে বাইজীসহ বাগানবাড়ির তাণ্ডব আরম্ভ হলো। তারপর বাবার আমলে এলো হেনরি ডিরোজিওর শিক্ষা। বাবা ধর্ম্মত্যাগী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠলেন। বাগানবাড়ি রইলো—তবে আসর সেখানে আর জমে না। পিতামহ তখন পরমার্থ চিন্তায় মন দিয়েছেন. বিষয় সম্বন্ধে কূর্ম্মবৃত্তি অবলম্বন করেছেন। পূর্ণ তেজে বাবা ভিন্ন আকারের মর্য্যাদাবোধে সব-কিছুকে বিপর্য্যস্ত করতে লাগলেন। বেশি অসহ্য হলে পিতামহ গেলেন কাশী। তারপর এলো আমার পালা।

আমি ব্যস্ত হইয়া বলিলাম, আজ থাক না।

না, না, শোন। রক্তের জোর কমে আসতেই বাবার সাধ হলো আমি যেন অন্তত—সুশীল সুবোধ বালক হই। ভর্ত্তি করিয়ে দিলেন সংস্কৃত কলেজে। ঠিক গোঁড়া হিন্দু তৈরী করবার জন্য নয়, খানিকটা সংযম অভ্যাস করবার জন্য। ভুল দেখলে, সুপ্রিয়? নিজে যে মুক্তি ক্রয় করেছিলেন বাড়ির রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে—আমাকে করতে চাইলেন—তা থেকে বঞ্চিত। এমনই স্থানুধর্ম্মী হয়ে পড়ে মানুষ বয়স হ'লে। বলিয়া দেওয়ালের দিকে চাহিলেন। সেখানে পূর্ণাবয়ব দৃঢ়সন্নদ্ধ ওষ্ঠযুক্ত সেই তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তির তৈলচিত্র শোভা পাইতেছিল। নীচেয় পরিচয়লিপি ছিল না—তবু চিবুকাগ্রভাগ হইতে উন্নত সরল নাসিকা পর্য্যন্ত ও পাতলা ঠোঁটের রেখায় অটল ইচ্ছাশক্তিকে বহন করিবার ভাবটি সুপরিস্ফুট। ধনগর্ব্ব কিনা জানি না, ক্ষমতাদৃপ্ত একটি

কঠিন রেখায় দ্বিধাবিভক্ত চিবুকে নীতিশবাবুর মনোবলও মাঝে মাঝে প্রকটিত হইতে দেখিয়াছি।

নীতিশবাবু সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিলেন, বাইরে বিদ্যা অর্জ্জন করলাম—আর ভিতরে বংশগত প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার-স্ফুরণ হ'লো। আমিও বাবাকে সম্পূর্ণ সুখী করতে পারিনি সুপ্রিয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি স্তব্ধ হইলেন।

একটু থামিয়া বলিলেন, এই যে আমার জীবন—এর আরম্ভ বেশি দিনের নয়। চোদ্দ পনেরো বছর বড় জোর। এ পরিবর্ত্তন একদিনে হয় নি—হয়েছে ক্রমে ক্রমে। সান্ত জগৎ সংসার অতিক্রম করে দেশের মধ্যে এখন সীমাবদ্ধ। তাই সংসারের দুঃখকষ্টকে গ্রাহ্য করি না, দেশের দুঃখে বিচলিত হই। আরও কিছুদিনের চেষ্টায়—এই জীবনকে যদি অনন্তের পথে নিয়ে যেতে পারি—তখন দেশের গণ্ডিও আমার কেটে যাবে হয়ত।

ক্ষণকাল ধ্যানস্থের মত থাকিয়া পুনরায় বলিলেন, কিন্তু সে সাধনা আমার নয়। আমি কাজের মাঝেই বাঁচতে চাই। আমার পূর্ব্ব পুরুষের রক্তে ভোগ জিনিসটা প্রচুরতরই ছিল—আমার সাধনাও তাই ত্যাগের নয়! তবে একটি সত্য আমি যেন ক্রমে আবিষ্কার করছি, সুপ্রিয়। ভোগ বা ত্যাগ কোনটাই আসলে ব্যক্তি-সংশ্লিষ্ট নয়। অবস্থার ভেদ মাত্র। মন খালি থাকে না কখনো। বয়স যেমন বাড়তে থাকে—মনের অতসী কাচে অমনি রঙের পরিবর্ত্তন সুরু হয়। গভীর থেকে গভীরতর বস্তু নিয়ে সে পরিপূর্ণ হতে চায়। প্রথমে জগৎকে সে সঙ্গে জড়িয়ে চলতে চায়—পরে জগৎ বিলুপ্ত হয়ে জগতাতীত কোন রহস্যকে আয়ত্ত করতে চায়। আসলে—দুঃসাহসিক হিমালয় অভিযানের রহস্য তাকে এক স্তর থেকে আর এক স্তরে টেনে নিয়ে যায়। কিছুতে তার শান্তি নেই।

তবে কি অশান্তিই জীবন?

না। জীবনের অর্থ হলো—জ্ঞান আহরণ। শুধু জানা। জ্ঞান-বৃক্ষের ফল খেয়ে আদি-মানব দুঃখভোগ করেছিলেন, কিন্তু সেইখান থেকেই তাঁদের জড়ত্ব ঘুচলো—জীবন আরম্ভ হলো। জীবন হলো—শুধু চলা। একটার পর একটা কৌতূহলকে মিটিয়ে দুঃসাহসিক অভিযান। হাঁ, আমার ছেলেদের কথাই বলি। বড়বাবুকে দেখলে—ওখানে পাবে আমার প্রথম জীবনকে। উদ্দাম, উচ্ছৃঙ্খল, দায়িত্বজ্ঞানহীন জীবন। তার পরের জীবন যে স্তরে এসেছিল—সে স্তরের বিকাশ আমার মেজ ছেলে সুজিত। বিচারবুদ্ধি বিশিষ্ট কর্ম্মী। আমার সেই জীবনের শেষ প্রায় হ'য়ে এলো—তাকে তুমি দেখনি—আমায়ও চিনতে পারবে না।

আর স্মরজিৎবাবু?

স্মরজিৎ? আমার মনে হয় যে জীবন আসছে ও তারই আভাস এখন বুদ্ধি স্তিমিত হ'য়ে পড়ছে, মস্তিষ্ক পরিশ্রান্ত। মনে কল্পনার নতুন রঙ ধরে না—অথচ হৃদয় নরম হয়ে উঠলো। সবাইকে ভালবাসতে ইচ্ছা হয় সুপ্রিয়, সকলের মাঝে নিজেকে দেখতে ভাল লাগছে এখন।

স্মরজিৎ আপনার বাধ্য ও শান্ত ছেলে।

হবে। শেষ বয়সের সন্তান কিনা, শান্তির আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছে। তবু চিরাচরিত বংশের ধারাকে আমি বিশ্বাস করি না। ওর স্বাতন্ত্র্যও একদিন আত্মপ্রকাশ করবে। কোন্ মূর্ত্তিতে জানি না। তবে মনে মনে প্রতিদিন বলি, সে যেন সহ্য করবার শক্তি লাভ করি। তাকে যেন অতিক্রম করতে পারি।

সে অবস্থাকে আপনি ভয় করেন কেন?

কেন? একটু থামিয়া হাসিয়া বলিলেন, কারণ মন আমার নরম

হ'য়ে আসছে। সুজিত আমায় আঘাত দিয়ে খানিকটা দুর্ব্বল করে দিয়েছে বৈকি। শুধু বাইরের কাজকে আশ্রয় করেই না খাড়া আছি!

ক্ষণকাল তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া মৃদুস্বরে তিনি হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সাহস আমার আছে। এ সঙ্কটও অতিক্রম করব, সুপ্রিয়।

বলিলাম, স্মরজিৎবাবুর বিয়ে দিন না।

তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, বিয়ে জিনিসটা ওপক্ষের ব্যাপার—এ পক্ষের নয় তো। সুতরাং আমার দিক থেকে আগ্রহ দেখানো অনুচিত।

বলেন কি! বাপমার কাছে বিয়ের কথা বলতে ছেলের লজ্জা হয় না?

সে যুগ কি তোমরা অতিক্রম করনি, কাব? আহা লজ্জায় মাথা নামাও কেন! আমার বিশ্বাস—ও আমাদের সঙ্গ শেষ হয়েছে, সেই রকম শিক্ষাও আমি দিয়েছি ওকে।

উনি যদি অসম বিবাহ করেন?

বিবাহ কথনো অসম হয়? ধর্ম্ম বাইরের জিনিস—ও নিয়ে আমি কখনো মাথা ঘামাইনে। বলিয়া হা—হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সেই চিকণ হাসির ধ্বনিতে কক্ষ ভরিয়া উঠিল। তাহার চিবুক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত প্রসারিত মাংসপিণ্ডে তরঙ্গ খেলিল। অতঃপর তিনি বলিলেন, ঘরটা ছেড়ে দিলাম—একটা কবিতাও তো শোনালে না—বুড়োকে। এইবার একটা গল্প লেখ না—আমার জীবন নিয়ে।

হাসিয়া বলিলাম, নিজের চেহারা আয়নায় দেখে সবাই তো খুসী হয় না।

আমি হব। যদিও জানি—এই বেমানান চেহারাটা আয়নার অযোগ্য, তবু জড় আয়নায় যা হুবহু ফুটে ওঠে, বুদ্ধি-শাণিত মনে তার চেহারাটা

দেখতে ভারি ইচ্ছে করে। আঁক না কবি—আমার তেমন একটা ছবি।

কি অদ্ভুত ছেলেমানুষের মত তাঁহার দুই চোখে তরল আগ্রহভরা দৃষ্টি !

সত্যিই কি আপনি নিজেকে গল্পের মধ্যে দেখতে চান ?

চাই বই কি। তেমনই আগ্রহোত্তেজিত স্বরে বলিলেন, আত্ম-বিশ্লেষণের ক্ষমতা আজ আর নেই, তাই কি হয়েছি জানতে ভারি ইচ্ছে করে ! তোমাদের মত পৃথিবী সবুজ দেখার চোখ আমার নেই। তোমাদের মত চীৎকার করে যুক্তিহীন তর্কও জমাতে পারব না, পারব না আবেগ-পরিচালিত হয়ে যে কোন একটা পথ বেছে নিতে।

আচ্ছা চেষ্টা করবো। বলিয়া গাত্রোত্থান করিলাম।

৩

তেতলার ঘরে প্রবেশ করিয়াই দেখিলাম, ইলা কক্ষমধ্যে ধীরে ধীরে পায়চারি করিতেছে। সম্মুখের বড় আয়নাটায় তাহার সযত্ন-প্রসাধিত প্রতিবিম্বের পাশে আমার প্রতিবিম্ব ফুটিয়া উঠিতেই—তাড়াতাড়ি সে মুখ ফিরাইয়া কহিল, আপনার জন্য অপেক্ষা করছি, মাষ্টার মশায়।

কিছু দরকার আছে ? অত্যন্ত সোজাভাবেই প্রশ্ন করিলাম। প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তেমনই সহজ ভঙ্গিতে তাহার পানে চাহিলাম। আশ্চর্য, কণ্ঠস্বরে আমার এতটুকু কম্পন নাই, চোখেও প্রণয়রাগ রঞ্জিত লজ্জার কণামাত্র নাই।

ইলা বলিল, হাঁ, আজ রঞ্জি ট্রফির পাঞ্জাব টীমের ফার্ষ্ট ইনিংসের শেষ দিন, যাবেন ?

ক্রিকেট খেলা আমার ভাল লাগে না।

আমারও না। তবু ওটাকে উপলক্ষ্য করে একটু বেড়িয়ে আসা যাক না।

বেড়াতে যাওয়াই তো বেড়ানোর উপলক্ষ্য থাকা ভাল। নইলে নিউ এম্পায়ার বা কার্নিভাল--

ইলা ব্যথিত দৃষ্টি আমার পানে নিবদ্ধ করিয়া কহিল, সে যে কত নিরুপায় হয়ে—তা কি আপনাকে বলিনি?

সামান্য কোমল কণ্ঠস্বরে আমার অনেকখানি অভিযোগের নিষ্পত্তি হইয়া গেল। খানিক থামিয়া কহিলাম, বেশ ত চলুন।

ইলা হাসিয়া বলিল, এখন নয়—খাওয়ার পর। কিন্তু কারণটা আপনাকে বলে নিই তার আগে। কদিন থেকে একটা কথা হাওয়ায় ভাসছে, সেটা পরীক্ষা করাই আমার উদ্দেশ্য।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া কোন প্রশ্ন করিলাম না। ইলা বলিতে লাগিল, রিণি চিটাগঙ থেকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমাদের সমাজ ও ত্যাগ করতে চায় নাকি।

সেকি!

সেই রকমই শুনছি। কে পাঞ্জাবী একজন ভাল খেলোয়াড় আছে—তাঁর সঙ্গে ওর আলাপ গাঢ়তর হ'য়েছে।

মৃদুস্বরে বলিলাম, তা সেজন্য—

না, সেজন্য আমার দুশ্চিন্তা অবশ্য নেই. কিন্তু আমি নিয়েই তো সমাজ নয়।

সমাজ! এই শহরে সমাজ আছে নাকি?

ইলা হাসিমুখে বলিল, সমাজ বলতে পল্লীগ্রামে যা বোঝায়—তা অবশ্য এখানে নেই, তবু অন্য আকারের সমাজ। গোত্রে গোত্রে বর্ণে

বর্ণে মিলন না হলে লোকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয় না এখানে—তবু—বলিয়া একমুহূর্ত্ত থামিয়া বলিল, এখানকার গোত্রের ডেফিনিশন আলাদা। যেমন ধরুন—ধনবানদের সমাজ, সংস্কৃতিবানদের সমাজ, পদমর্য্যাদাবানদের সমাজ—এগুলোও তো রয়েছে।

সেকথা স্বীকার করিলাম।

ইলা বলিল, এগুলো থাকবেও হয়ত বহুকাল। তাই রিণিকে নিয়ে অনেকে মাথা ঘামাচ্ছেন।

কিন্তু একবার যেন শুনেছিলাম, রিণি দেবী গান শিখছেন?

আপনিও শুনেছেন! সস্মিতমুখে আমার পানে চাহিয়া ইলা কহিল, কিন্তু সেখানে ও মন বসাতে পারলে কি? গানের পালা সাঙ্গ না করেই ক্রিকেট খেলায় ওর অনুরাগ দেখা দিল।

গানের পালা হঠাৎ সাঙ্গ হলো কেন?

সে কথাটি জানবার জন্যই তো বঙ্কি ট্রফি দেখতে হবে। ওখানে রিণিকে পাব।

তিনি আগে তো এখানে আসতেন।

আসতো। আজ এক সপ্তাহ হলো কলকাতায় এসেছে—ওকে দেখলেন কি? অবশ্য ছোট কাকাদের কাগজখানা উঠে যাওয়া আর সিনেমার ওপর ওদের হঠাৎ বিতৃষ্ণা হওয়াও—এখানকার মজলিস না-জমার আর একটা কারণ।

রণজিৎবাবু এখন কোথায়?

শোনেন নি? শীঘ্রই আমেরিকা যাচ্ছেন।

স্মরজিৎবাবুকেও দেখছি না।

ছোট কাকা আর রেবাদি দার্জ্জিলিং গেছে।

বলেন কি, এই দুর্জ্জয় শীতে!

তাই তো শুনছি। আচ্ছা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে তৈরী হয়ে থাকুন। বলিয়া কক্ষ ত্যাগ করিতেছিল, আমি বাধা দিয়া বলিলাম, যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা বলি।

কি, বলুন না। সে টেবিলের ধারে আসিয়া দাড়াইল।

ধরুন, একটু ইতস্ততঃ করিয়া সামান্য কাশিয়া গলাটা পরিষ্কার করিয়া কহিলাম, ধরুন, রিণি দেবী সেই পাঞ্জাবী ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন—তাতে—

বলেন কি! দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ইলা আমার পানে চাহিল। বাঙ্গালীর মধ্যে এত যোগ্যতর লোক থাকতে ও বিয়ে করবে—ভিন্ন দেশীয়কে। এতে করে আমাদের খাটো করে দেওয়া হয় না?

কেন? ভালবাসা তখনই সম্ভব—মর্য্যাদাবোধ যখন বিলুপ্ত হয়ে যায়। আন্তর্জ্জাতিক, আন্তঃপ্রদেশিক, বা অসবর্ণ বিবাহে দোষ কি—যদি সত্যকারের ভালবাসা হয়?

সত্যকারের ভালবাসা! সত্যিকারের ভালবাসবে—রিণি!

তাহার বিস্ময়ের আতিশয্যে আমাকে অবশ্য নীরব হইতে হইল, তবু মনে মনে বলিলাম, ও জিনিসটা শুধু রিণির পক্ষেই বা দুঃসাধ্য কেন? তোমরা কতবার হয়ত ভালবাসার অভিনয় করিয়াছ, এবং শেষবারও যে অভিনয় করিতেছ না তাহারই বা স্থিরনিশ্চয়তা কি। সুকুমারের সঙ্গে তোমার পরিচয়ের যোগাযোগ আমার জানা নাই, তবু অনুমান করিতে পারি—কানিভালের বহিঃসৌন্দর্য্যের মতই তাহাও হয়ত আপাত-মনোরম। বাহিরকে ধরিয়া মনের মধ্যে যদি পৌঁছিতে পার সে তোমাদের সৌভাগ্য—এবং তখনই হয়তো এই মোহকে প্রকৃত ভালবাসা আখ্যা দিয়া গর্ব্ব করিতেও তোমাদের বাধিবে না, কিন্তু এই মুহূর্ত্তে শপথ করিয়া বলিতে

পার কি প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া নিষ্টাতে তোমাদের সমগ্র সত্তা অধিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে?

ইলা হাসিয়া বলিল, তা যদি হবে—রণজিৎ সম্বন্ধে আমাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হতো না।

হতে পারে আঘাত পেয়ে—

আঘাত! কিসের আঘাত? সবিস্ময়ে ইলা আমার পানে চাহিল।

তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া কহিলাম, না, অনুমানে বলছি।

রেবা-ঘটিত কাহিনী—যাহা অনুমানের তুলিকায় রঞ্জিত করিয়া মনের মধ্যে পল্লবিত হইয়াছিল—তাহা মনের তলায় চাপা থাকুক। এসব সিদ্ধান্তের কথা বলিয়া কাহারও কিছু লাভ নাই।

ইলা বলিল, ও, অনুমান! তা কবি আপনারা—আপনাদের ওসব নিয়েই তো কারবার: তবে রিণিকে আমরা ভালমতেই জানি। ও মেয়ে পৃথিবীর কোন জিনিসটাই সীরিয়াসলি নেয় না।

সে ধারণা আমারও ছিল। কিন্তু বসন্তের বায়ু গ্রীষ্মের প্রখর তাপে দগ্ধ হইয়া একদিন-না-একদিন স্তব্ধ হইয়া দারুণ গুমোটের সৃষ্টি করে। সেই স্তব্ধ গুমোটের পরেই উঠে কাল বৈশাখীর ঝড়। কিন্তু আমার প্রকৃতিতত্ত্ব জ্ঞান আর ইলার রিণিতত্ত্ব প্রচার এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে: বিশেষ করিয়া উহার সহপাঠিনীকে জানিবার অভিজ্ঞতা আমার কয়টি দণ্ডেরই বা!

ইডেন গার্ডেনে—এ একটা সমারোহ ব্যাপার। রৌদ্রে পিঠ ও বুক পাতিয়া মাথায় হ্যাট চাপাইয়া—হাতের কমলা লেবু—বা কাগজে জড়ানো কেক, বিস্‌কিট, পাউরুটি ও ডিম সিদ্ধ লইয়া টিফিন করিতে করিতে পরম আলস্যে এ খেলাকেও উপভোগ করা যায়। প্রথম ইনিংসের ফলাফল

বোর্ডে ঝুলিতেছে, খেলার মুহূর্ত্তে উত্তেজনাসূচক মন্তব্য (প্রশংসার চেয়ে গালি গালাজই বেশি) নাই। শুধু বল দেওয়া ও বল মারার কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে হাততালি পড়িতেছে। বহুক্ষণ ধরিয়া যে খেলায় ধৈর্য্য পরীক্ষা চলে—তাহার পক্ষে এইটিই বুঝি শোভন।

ইলা আঙ্গুল হেলাইয়া কহিল, দেখছেন?

ঘাড় নাড়িলাম।

উঁহু, খেলা নয়। ওই যে পাগড়ীর পাশে বসে—মেয়েটি হাত নাড়ছে—

উনিই কি রিণি?

হু—বেশবাস দেখে মনে করছেন পাঞ্জাবী? ওই রিণি। উঁহু—

আপনার ভুল হতে পারে।

কক্ষনো না। লাঞ্চ আওয়ারে—চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাবে।

পাঞ্জাবী ভদ্রলোক তখন তাঁবুর মধ্যে গিয়াছিলেন, ইলা আসিয়া রিণির সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, ক্রিকেটে অনুরাগ হলো কতদিন থেকে?

ইলাদি! রিণি সবেগে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, এইবার মঙ্গল সিং নামবে। দেখবে—পাঞ্জাব সেভেন্ত উইকেটে কতটা প্রোগ্রেস করে। সেঞ্চুরির কম মঙ্গল সিং আউট হয় না।

ক্রিকেট খেলায় তোর এত ইণ্টারেষ্ট এলো কবে থেকে?

বাঃ রে, গেল বার রঞ্জি ট্রফিতে ও নামে নি? ওর খেলা দেখেই তো—

নাইডু, ধ্যানচাঁদ এদের চেয়েও মঙ্গল সিংয়ের নাম বেশি বুঝি!

যাই বল ইলাদি, ওসব ভেটারন্‌দের চেয়ে এদের খেলার একটা নিজস্ব স্টাইল আছে।

হুঁ, অস্তগামী সূর্য্যের চেয়ে উদয়াচলের সূর্য্যকে—চালাক যারা—তারা স্তবস্তুতি করে।

করেই তো। আমি বলছি তুমি দেখে নিও—আসছে বারে মঙ্গল সিং যদি সব্বাইকে না ছাড়িয়ে যায়—

তাহলে—রিণি দেবী তাঁকে কি পুরস্কার দেবেন?

যাও—তোমার ঠাট্টা ভাল লাগে না। হাসিমুখেই রিণি জবাব দিল। হাসিবার সময় সহসা মুখ ফিরাইতেই অদূরে দণ্ডায়মান আমার সঙ্গে চোখোচোখি হইবামাত্র সে সোচ্ছ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, গুড আফ্‌টারনুন—মিঃ রায়। আপনি কখন?

এঁর সঙ্গেই এসেছি।

বটে! কেমন লাগছে খেলা?

মন্দ কি।

মন্দ! সারা দুনিয়ার সেরা খেলা যদি থাকে তো এই ক্রিকেট। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

ইলা বলিল, ওঁর মতামতের চেয়ে তোমার মতটাই এখানে মূল্যবান।

নিশ্চয়ই—কতগুলো প্রভিন্সের সেরা খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন—একি একটা যে সে কথা!

মৃদুস্বরে বলিলাম, গানে কেমন উন্নতি করলেন?

গান! খানিকক্ষণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া সে বিস্ময় কাটাইয়া সহসা হাসিল, আপনিও যেমন। সারেগামার সিঁড়ি ভাঙ্গতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, নমস্কার আমার গান শেখায়!

কিন্তু স্বরলিপি পাঠিয়েছিলেন তো এক সময়ে?

ওটা ঝোঁক। বুঝলেন না, যেমন কবিতা লেখার ঝোঁক হয়েছিল এক সময়ে। সে কলম আর ছুঁই না—কাগজগুলো কোথায় যে গেল, কে জানে! সত্যি বলতে কি ইলাদি, ওসব বাজে চর্চ্চা না করে শুধু স্পোর্টস নিয়ে থাকাই উচিত মানুষের। ফিজিক্যাল এক্‌সারসাইজটা সুন্দর

শরীর তৈরীর চমৎকার দাওয়াই। দেখেছেন—মঙ্গল সিংয়ের চেহারা? খাঁটি আর্য্য সন্তানের চেহারা। একবার আমার পানে ও একবার ইলার পানে চাহিয়া সে হাসিমুখে ঘাড় নাড়িতে লাগিল।

ইলা আমার পানে চাহিয়া মৃদু হাসিল। ভাবটা, কেমন—রিণির অবস্থাটা বুঝিতে পারিলে তো?

আমি কিন্তু অত হাল্কাভাবে সে কথা স্বীকার করিতে পারিলাম না। খেলার প্রকৃতিটা মানুষের জন্মগত হইলেও—ঘরে বসিবার কথাও এক সময়ে সে না-ভাবিয়া পারে না। শুধু পথ বা শুধু ঘর মানুষকে চিরকাল ভুলাইয়া রাখিবে—এমনটি ভাবিতে অভ্যস্ত নহি। সংসারে বিপরীত দৃষ্টান্তই কত চোখে পড়ে। বাহিরে আমরা যাহাকে নিশ্চিন্ত বলিয়া ধারণা করি—সে হয়ত প্রকৃত পক্ষে ততখানি নিশ্চিন্ত নহে। অথবা উদ্ভিদজীবনযাপনে অভ্যস্ত মানুষ—জড় অবস্থাটিকে পরম শান্তির কারণ ভাবিয়া চোখকান বুজিয়া তাহাতেই বিলীন হইয়া যাইবার সাধনা করে। বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন মানুষের সে রীতি নহে। খানিকটা ঐ রকমই ভাবিতেছিলাম, আরও খানিকটা ভাবিলে—মানুষ সম্বন্ধে একটা সুগ্রন্থিত তত্ত্ব হয়ত মস্তিষ্কে চাপিয়া বসিত। রিণি ততক্ষণে বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, একদিন যাবে ইলাদি, বালিগঞ্জে, তোমায় চায়ের নেমন্তন্ন করছি। ওর গল্প শোনাবো। কোথায় অষ্ট্রেলিয়া—কোথায় ইংলণ্ড—কত দেশ না ঘুরেছে!

বটে! তা ওর সঙ্গে তুইও একবার ঘুরে আয় না কন্টিনেণ্টে।

যাবই তো। টেনিসটা আগে রপ্ত করে নিই।

বলিস কি, টেনিস ধরেছিস আবার!

মঙ্গল সিংয়ের টেনিসেও হাত চমৎকার।

দেখ, মঙ্গল সিংয়ের দ্বারা যদি তোর মঙ্গল হয়।

বাঃরে, ওকথা বললে কেন!

না, এমনি বললুম। হাওয়ায় আর কতকাল ভেসে বেড়াবি!

হাওয়াই আমার ভাল। যদি কবিতা লিখতুম বা গান শিখতুম তাহলে এতদিনে আমার কি দুর্দ্দশা যে হোত! মাগো! সে দৃশ্য কল্পনা করিয়া রিণি বারকয়েক শিহরিয়া উঠিল। তাপর হাসিয়া বলিল, স্পোর্টস্‌ই ভাল। আজকের জের কালকে টানতে হয় না। শুধু প্র্যাক্‌টিস।

বুঝা গেল, স্পোর্টস্‌ ছাড়া রিণি আজ অন্য কথা বলিবে না। হয়ত ভালাবাসার স্বাদ সে কোনদিন পাইবে না, তবু এই আনন্দই বা উহার মন্দ কি। সত্য ভালবাসিলে—কবিতা লেখা বা গীত সাধনায় অসাফল্যলাভের পর হাস্যমুখী চঞ্চলা রিণিকে এই খেলার মাঠে দেখিতে পাইতাম কি? বর্ষার আয়োজন ওর মেঘবিস্তারের মধ্যে নাই, সে হয়ত ভালই। শরতের হাল্কা মেঘের মত জীবনকে ও যদি এমনই স্বচ্ছন্দে বহন করিয়া ও বিস্তার করিয়া পৃথিবীর খেলাঘরের আনন্দ-কলরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারে—সে যে কত বড় আশীর্ব্বাদ জীবন দেবতার!

ইলা বলিল, ওই তোর বীরপুরুষ নামছেন, খেলা আরম্ভ হলো।

রিণি তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, এসো না ভাই।

আজ নয়—সুপ্রিয়বাবু ব্যস্ত হয়েছেন যাবার জন্য।

আমার পানে ফিরিয়া রিণি কহিল, খেলার সবটা দেখবেন না?

বিশেষ কাজ আছে। ফলাফল কাল কাগজেই তো পাব।

আচ্ছা, আমি না হয়—ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল, ওঃ—আই অ্যাম অফুলি বিজি।

আচ্ছা—নমস্কার।

নমস্কার। আর সে আমাদের পানে ফিরিয়া চাহিল না। উৎফুল্ল জনতার সঙ্গে করতালি দিয়া উঠিল। মঙ্গল সিংয়ের প্রথম বল বাউণ্ডারি ছাড়াইয়াছে।

৪

মাঠের বাহিরে আসিয়া ইলা বলিল, বালিগঞ্জ যাবেন?

এখন?

এই দুপুরবেলা কোথায় কাটানো যায় বলুন তো। তার চেয়ে লেকের দিকে—

সেও তো টো টো করে ঘোরা।

একটা গল্প শুনবেন? সহসা ইলা আমার পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল।

গল্প! বিস্মিতস্বরে বলিলাম।

হাঁ, আমারই গল্প। আমি বেশ বুঝছি, আপনি সেই দিনের পর আমায় মন থেকে ক্ষমা করতে পারেন নি। চলিতে চলিতে আমরা কলিকাতা ফুটবল গ্রাউণ্ডের কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

বলিলাম, একথা মনে করছেন কেন?

মনে না করে যে পারি না। কথাকলি নৃত্য থেকে কার্নিভাল পর্য্যন্ত কোনখানেই আমার আচরণটা তো সুষ্ঠু নয়।

তা-ও আপনার মনে হ'য়েছে! ব্যঙ্গোক্তি করা আমার অভিপ্রায় ছিল না, তবু ঈষৎ শ্লেষে যেন কথাগুলি সিক্ত হইয়া উঠিল।

ইলা আপন মনে বলিল, নিজের যুক্তিটা জানি—আর পরের কষ্ট বুঝব না—এতটা নির্ব্বোধ আমি নই। আমার ব্যবহার সম্বন্ধে আমি

বরাবর সচেতন। অবশ্য নিজেকে বাঁচাতে এই কৌশল আমায় করতে হ'য়েছে।

কি বলিতে যাইতেছিলাম, বাধা দিয়া সে বলিল, মিঃ সেনের হাত থেকে কোন রকমে নিস্তার পাবার আশা আমার ছিল না। কেন জানেন ?

জানি।

না, জানেন না।

না জানলেও শুনতে চাই না।

না শুনলে আপনি আমায় ক্ষমা করবেন কেন ?

হাসিয়া বলিলাম, কেন ও কথা ভাবছেন ? আপনি তো আমায় শুধু আঘাতই দেননি, আনন্দও দিয়েছেন প্রচুর।

আনন্দ ! না, না, আমি আপনার অসম্মান করেছি হয়ত।

বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই বলছি।

আমার মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিপাত করিয়া ইলা বলিল, বিশ্বাস করলুম। কিন্তু আনন্দ কিসে পেলেন ?

এক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলাম। পরে হাসিতে হাসিতেই বলিলাম, কথাকলি নাচই বলুন—আর কার্নিভালই বলুন—সবটাই আমার পক্ষে নতুন। কথা শেষে অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম। ইলা তখনও স্থির-দৃষ্টিতে আবার মুখের পানে চাহিয়া আছে। মুখ না ফিরাইলে তাহাকে আশ্বস্ত করা কঠিনই হইত।

তথাপি সংশয়কুণ্ঠিত স্বরে সে কহিল, তবু নাচ দেখাটা এমন আনন্দ নয়—

মুখ না ফিরাইয়া উত্তর দিলাম, প্রথম দেখার আনন্দ আছে বৈ কি। অনেকবার দেখেছেন বলে—সে কথা আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না।

তাই হবে হয়ত। মৃদুস্বরে কথা কয়টি উচ্চারণ করিয়া সে পুনরায় পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

আর যে প্রশ্ন করিল না ইহাতেই যথেষ্ট খুসী হইলাম। সত্য কথা বলিতে কি—ইলা আমাকে বেদনা এবং আনন্দ দুইই দিয়াছে। হয়ত বেদনার মধ্যে অসম্মানের পীড়াও ভোগ করিয়াছি, তবু দৃষ্টির প্রসার সে বাড়াইয়া দিয়াছে। শীতকালের নরম দ্বিপ্রাহরিক রৌদ্র মাঠের মধ্যে—বহুদূর সীমাকে স্পষ্টতর করিয়া যেমন পরম স্নেহে সর্ব্বাঙ্গ স্পর্শ করিতেছে, এবং সেই সঙ্গে মন ও চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিয়া দিতেছে—তেমনই রঙ্গীন কল্পনাজাল প্রসারিত হইয়া বস্তুপরিচয়হীন মনকে বাঁধিবার জন্য এক স্বর্ণশৃঙ্খল তৈয়ারী করিয়াছে অলক্ষ্যে। এই সৌর জগতের আকর্ষণ-কেন্দ্রে আকৃষ্ট না-হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের বুঝি চরম তৃপ্তি নাই। তীব্রতর দুঃখ ও অস্পষ্টতর সাধ মিশিয়া এক পরম স্বাদে জীবন স্বাদুতর হইয়া উঠে। যতই অস্বীকার করিবার চেষ্টা করা যাক, জড়ে ও চেতনে এই এক হইয়া যাওয়ার খেলাটি পুনঃ পুনঃ আবহমান কাল হইতেই চলিতেছে। পরস্পরকে বাঁধিবার চেষ্টাই বুঝি—সম্পূর্ণ হইবার ইঙ্গিত।

ডালহাউসি গ্রাউণ্ডের কাছে আসিয়া বলিল, যাবেন বালিগঞ্জ? অনেক দিন অনুর সঙ্গে দেখা হয় নি।

সূর্য্যকিরণে চোখকাণ আমার উত্তপ্ত হইয়া উঠিল সহসা। অস্ফুট স্বরে কহিলাম, আজ থাক না।

তাহলে রিচি রোডে যাওয়া যাক। ঈষৎ হাসিয়া কহিল, জানেন তো ওখানে সুকুমারদের বাড়ি।

যে মেয়ে স্বয়ম্বরা হইতে পারে তাহার আর লজ্জা কিসের? লজ্জা শুধু আমাদের পাড়াগাঁয়ে—মধ্যবিত্ত ঘরের সম্পত্তি হইয়া আছে। তবে সে সম্পদ্‌ও অপচিত হইতে দেখিতেছি। সুতরাং আমিই বা বৃথা লজ্জায়

নিজে দুঃখ ভোগ করি কেন। তাড়াতাড়ি কহিলাম, বেশ তো দুই জায়গায় যাওয়া যাক।

ইলার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, আগে রিচি রোড, না আগে ঢাকুরে।

টস্ করা যাক। বলিয়া একটা চক্‌চকে পয়সা বাহির করিলাম।

ইলা বলিল, বেশ, আমার হেড।

টসে ইলাই জয়লাভ করিল।

আপাত জয় হইলেও—রিচি রোডে সুকুমারের দেখা পাওয়া গেল না। ইলা বলিল, তাইত, রিণিটার মনে দুঃখ দিয়ে—নিজেদের কষ্টই সার হ'লো। আচ্ছা—আর একটা চান্স দেখা যাক।

এ চান্সটা সফল হওয়াতে বোঝা গেল, রিণির দুঃখটা তেমন মারাত্মক হয় নাই। অনুদের বাড়ি পর্য্যন্ত পৌছিতে হয় নাই, গলিতে প্রবেশ করিতেই তাহার সঙ্গে দেখা।

ইলা বলিল, এই পোড়ারমুখী, আর যাস না কেন?

অনু আমায় নমস্কার করিয়া কহিল, ভাল আছেন? পরে ইলার পানে ফিরিয়া কহিল, মা বাতে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়েছেন—সংসার আমাকেই দেখতে হয় কি না।

ইলা তাহার স্কন্ধে চাপড় মারিয়া কহিল, পাকা গিন্নি! আই-এ টা তা'হলে দিচ্ছিস না?

পড়ছি বৈকি। তবে তেমন সুবিধা হবে বলে মনে হয় না।

না হয় দিনকতক আমাদের বাড়ি এসে থাক।

মাকে দেখবে কে? সংসার—

ফের সংসারের কথা! ওসব বুড়্‌টে কথা আমি আর শুনতে চাই না। চ, লেকে গিয়ে বসা যাক।

অনু আমার পানে চাহিয়া অনুনয়ভরা কণ্ঠে কহিল, আমাদের বাড়ি আসবেন না?

ইলা বলিল, এই আহ্বানের অর্থ বোঝেন তো? ওর গিন্নিত্ব। অর্থাৎ এক কাঁড়ি খাবার খাইয়ে উনি কুটুম্বিতে রক্ষা করবেন।

অনু বিষন্ন মুখে বলিল, এক কাঁড়ি খাবার কোথায় পাব, ভাই! শুধু চা।

আর টা? সশব্দে ইলা হাসিয়া উঠিল।

অনুদের বাড়ি দেখিয়া বোধ হইল, কিছুমাত্র অত্যুক্তি সে করে নাই। এই বাড়িতে গৃহিণী বাতব্যাধিগ্রস্ত হইলে—সেবা করিবার জন্য মেয়েদেরই অগ্রসর হইতে হয়। ভাঁড়ার ও রান্নাঘরকে সুশৃঙ্খলিত করিবার দায়িত্ব তাহাদেরই। ঠিকা ঝি বাহিরের দুই চারিটি কাজ সারিয়া দিলেও সংসারের গতি বজায় রাখিবার ভার মেয়েদেরই। পড়ার ফাঁকে গৃহিণীত্ব করিবার দায়িত্বটুকু তাই অনুরই হয়ত বা। কলিকাতার নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারকে দেখিয়া চিনিয়া লওয়া কিছু সময় সাপেক্ষ।

শহরের সস্তা পুরানো জিনিস ও চক্‌চকে মেকি জিনিস দিয়া ঘর সাজাইয়া রাখা সহজ। সেই সজ্জার মধ্যেও যথেষ্ট পারিপাট্য ও কৌশল আছে। ষাট হইতে ছয় শত টাকা মাহিনার কেরানীর আবাসগৃহের পার্থক্য নিরূপণ—প্রথম দৃষ্টিপাতেই করা চলে না। বিশেষ করিয়া আমার মত পল্লী অঞ্চলের লোকের পক্ষে সেটা তো কঠিন ব্যাপার। তবে ধনীর প্রাসাদে বাস করিয়া এইটুকু বুঝিয়াছি—সাচ্ছল্যের মধ্যে অজস্র অপচয় ও পূরণের অবকাশ আছে। ভাঙ্গা-ফুটা জিনিসকে লোকরঞ্জক করিয়া সাজাইবার মমতা সেখানে নাই। ধনী-অনুকৃত এই সব মধ্যবিত্তদের ঘরে একই আসবাব বহুকাল ধরিয়া অপরিবর্ত্তিত ও অটুট্ থাকে। তাহাদের ছবির ফ্রেমে ময়লা জমে না, চেয়ারের

কুশনে ফুটা দেখা যায় না, টেবিল ক্লথে ঘরে-বোনা শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয়, চায়ের সেটে হাতল-ভাঙ্গা কাপগুলি সযত্নে পরিবর্জ্জিত হইয়া থাকে। এবং সর্ব্বোপরি কথাবার্ত্তায় থাকে একটা সদা-সতর্ক কৃত্রিম সৌজন্য ও ধন গরিমার অনিচ্ছাকৃত সযত্ন উল্লেখ। অবশ্য অনুদের সম্বন্ধে একথা খাটে না। স্বল্পবাক্ অনুর মতই স্বল্প সজ্জা এই গৃহের। মন না ভরিলেও ভারি হইয়া উঠে না।

ইলা কহিল, বসুন সুপ্রিয়বাবু, মাসীমার সঙ্গে দেখা করে আসি।

সুতরাং আমি আর অনু একা পড়িলাম। একেবারে একা। মাঝ-খানে সাহিত্য আলোচনা বা অন্য কিছুর পর্দ্দা নাই। পূর্ব্বে হইলে কোন-কিছু তুচ্ছ ব্যাপারকে টানিয়া আনিয়া আলাপ জমাইতে বাধিত না, কিন্তু সেই প্রাতঃকালের পর হইতে অনু আমার কাছে স্বতন্ত্র জগতের মানুষ হইয়া গেছে। সেই সকারণ কৃতজ্ঞতার ভারে আমি হইয়াছি নীচু। অভিজ্ঞজনের মত এই স্বল্পবাক্ ছাত্রীটিকে উপদেশের নিম্নবৃত্তে টানিয়া আনিতে পারিতেছি না। অথচ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা লইয়া আলাপ জমাইবার যে চিরাচরিত প্রথা আছে—তাহাকেও সুষ্ঠু বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি কই? শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ব্যাপার হইলে ঐটিই হয়ত সৌজন্য প্রকাশের রীতি বলিয়া সানন্দে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু—ইলার সাহচর্য্যে প্রত্যাশা-পরিপূর্ণ যে শতদল নূতন রূপ বিস্তার করিয়া জীবনের নূতন অর্থ বোধ করাইয়াছিল, সে শতদল অনুর অভিমুখে আসিয়া পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। হৃদয় কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ছোট্ট কথার ভর—বাজে কথার ভর—মন সহিতে পারিতেছে না। সৌজন্য বা বিনয় দিয়া যাহাদের ভুলানো চলে, তাহারা কয়দণ্ডেরই বা অতিথি! অনুর আগমনকে ঠিক পায়ে হাঁটিয়া সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার

পর্য্যায়ে ফেলিতে মন চায় না, আবির্ভাব ভাবিয়া অনেকখানি তৃপ্তি পাই যেন।

চা আনব? যেন কোন দূর নদীপার হইতে অনু কথা কহিল। নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিবার আর দ্বিতীয় উপায় ছিল না, তাই লঘু পানীয়ের পথে সে পরিচয় স্থাপনের চেষ্টা করিল।

চা? না, থাক। সঙ্কোচে তাহার পানে চাহিলাম। সে তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইয়া কহিল, না, আনি। এবং দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

এখানে বলিয়া রাখা ভাল, শহরকে ভালবাসিয়াছি বলিয়াই ভালবাসার ক্ষেত্রে অনুকে টানিবার সাহস আমার নাই; সাধ্য হয়ত আছে। আমার শহর পান্থনিবাসঅনুগত শত দৈন্যদুঃখবৃত্তিময় সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র নহে। সে শহর মসীজীবী কেরানীবৃত্তিকে কল্পনা করিয়া নহে, কিংবা ক্রোরপতি মূর্খ মহাজনের গদীতে নিবদ্ধ নহে। সে শহর প্রতিভা এবং সংস্কৃতি—আর্য্য সংস্কৃতির জন্মভূমি ও লীলা নিকেতন; সে শহরের জ্ঞানে মানুষের ললাট ও চক্ষু প্রোজ্জ্বল, মননশক্তিতে তার সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের সগোত্রীয়, কর্ম্মপ্রবাহে কালস্রোত সেখানে স্বচ্ছন্দ গতিতে প্রবহমান। সেখানকার প্রেম একটা মহামূল্য রত্ন। সে রত্নের আধার প্রাসাদ অর্থাৎ সহরের শ্রেষ্ঠ মণিপেটিকা। সর্ব্বপ্রকার সাচ্ছল্যের অবাধ সূর্য্যকিরণে মানুষের জীবন সেখানে বিস্তৃত, আশা হিমালয়-শৃঙ্গ আবিষ্কার-উন্মুখ। সে জীবন অনুদের এই একতলা পুরাতন বাড়িতে—ঢাকুরিয়া-পল্লীর ঘনবসতি ঘন মশক সমাকুল ক্ষেত্রে দুর্লভ। ইলার গতিপথে জীবনের বিস্তীর্ণতা ছিল—আলো-হাওয়ার অপ্রাচুর্য্যও বোধ করি নাই। কিন্তু অনুর জগতে চারিদিকের দেওয়ালে-আটকানো জীবন ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইয়া আসিতেছে যে! অথচ আশ্চর্য্য, মনের তাহাতে ক্ষোভ নাই, গ্লানি নাই, বিমুখ হওয়ার চেষ্টা নাই। বড় পাত্রে

ক্ষুদ্র বীজকণার হারাইয়া যাওয়ার শূন্যতা ও ব্যর্থতাকে এই মুহূর্ত্তে বড় করিয়াই দেখিতেছি। ছোট পাত্রে সীমানা-পরিবৃত হইয়া সে যেন পরিপূর্ণ হইতে পারে। শীতকালে কাশ্মিরী শাল গায়ে চাপানো আমাদের সাজেনা বলিয়াই কি ধুলামাখা আধময়লা ও পুরাতন আলোয়ান খানি টানিয়া লইয়া সহজ হইয়া উঠিবার চেষ্টা? মনকে শাসাইলাম। এত কৃতজ্ঞতাবোধ ভাল নহে। এই কোমল হৃদয়-বৃত্তির মত ছোঁয়াচে রোগ আর নাই। উপরে উঠিবার পথকে চোখের দু'ফোঁটা জলে ইহাই তো মুছিয়া দেয়, গতিকে স্তব্ধ করে। তবু মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছে। জন্ম-পরিবেশকে এক মুহূর্ত্তে ছাঁটিয়া ফেলা কত যে কঠিন! অভাব—ছোটখাটো অভাবগুলি মনের তলায় থিতাইয়া পড়িলে—সেই আবর্জ্জনায় একদিন সেখানকার জমি ভরাট হইয়া উঠে। বিস্তীর্ণ জগৎ হইতে মুখ ফিরাইয়া সঙ্কীর্ণ গৃহকোণকে তখন সে প্রেয় জ্ঞান করে। প্রকৃত মৃত্যু মানুষের জীবনে বহুবার ঘটে। এক ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আর এক ধারায় স্রোত বহিলে—পূর্ব্বধারা শুকাইয়া যায়।

আরও কতক্ষণ এমনই এলোমেলো ভাবনায় কাটিত বলা যায় না, চা হাতে অনু আসিয়া দাঁড়াইল। টেবিলের উপর চা নামাইয়া দিয়া কহিল, খান।

চা! ঈষৎ চমকিত হইয়া কহিলাম, দুপুরবেলায় চা আমি খাই না, তবে বড় টায়ারড আছি। বলিয়া কাপ তুলিয়া ওষ্ঠপ্রান্তে ধরিলাম।

ইলার আসতে একটু দেরি হবে।

আপনি বসুন না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে অনেকখানি কুণ্ঠা কাটিয়া গেল।

সে বসিলে বলিলাম, সেই দিনের কথাই মনে পড়ে কেবল।

কেন?

কেন ? সেই দিনই তো—

জানি। কিন্তু সে আর এমনই বা কি। সকলেই এ সামান্য কাজটুকু করতো।

না। ওটি সামান্যও নয়, সকলের করবার সাধ্যও ছিল না। আরও খানিকটা চা পান করিয়া কহিলাম, সেইজন্যই চিরকাল ওটি মনে থাকবে।

অনু নতমুখে কহিল, সামান্য কাজকে বড় করে দেখলে আমি—লজ্জা পাই।

হঠাৎ কাপ রাখিয়া ঈষৎ আবেগভরে কহিলাম, লজ্জা! আপনি জানেন না—এই সামান্য কাজ করেই মানুষ কত বড় হয়—কত আপনার হয়।

অনুর মুখে রক্তোচ্ছ্বাস জমিল কিনা বুঝিতে পারিলাম না। মধ্যাহ্ন হইলেও—এ ঘরে আলো তেমন ছিল না, দাঁড়াইবার ভঙ্গিটিও অনুর মুখভাব-পাঠের অনুকূল নহে। একটু তেরছাভাবে সে খালি কাপ-প্লেট তুলিয়া প্রস্থানোদ্যোগ করিল। আমি সহসা উঠিয়া তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইলাম। হয়ত আমি নহে—যে আবেগ কথার মধ্যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল—সেই আবেগই অনুর মৌনতার সুযোগে সক্রিয় ও শক্তিমান হইয়া আমাকে সাহসী করিয়া তুলিল। একটি হাত বাড়াইয়া তাহার পথ আগলাইয়া বলিলাম, আমাকে কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগও তুমি দিতে চাও না ?

স্বর কাঁপিয়া উঠিল, আমিও কাঁপিতেছিলাম। একমুহূর্ত্তে সম্বোধনে অন্তরঙ্গতা আনিয়া মন আনন্দেই বুঝি দুর্ব্বল হইয়া গেল।

অনু নতমুখেই বলিল, আমি জানি।

কি জান ?

মুখ তুলিতে গেল, পারিল না। কম্পন বুঝি সংক্রামক ব্যাধি, তাই আমার কথার উত্তর দিতে গিয়া ওর দু'টি ওষ্ঠ শুধু থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। চক্ষু পল্লবাবৃত হইল এবং এক পাও অগ্রসর হইতে না পারিয়া সে স্থাণুর মত দাঁড়াইয়া রহিল।

নারীর এত কাছে এমন কম্পমান হৃদয় লইয়া আর কখনো দাঁড়াই নাই। মনের এত আবেগ আগ্নেয়গিরির গৈরিক নিঃস্রাবের মত এ ভাবে বাহিরে সগর্জ্জনে ছুটিয়া আসে নাই, এমন করিয়া কানে তালা লাগিয়া চোখেও অন্ধকার দেখি নাই। আমার ক্ষুদ্র দেহের ভিতর এমন মত্ততা—এমন জ্বালা—এমন পিপাসা—কোথায় লুকাইয়া ছিল এতকাল!

অনু আমার স্পর্শে বিহ্বল হইয়া উঠিল। হাত হইতে চায়ের কাপ ও প্লেট স্খলিত হইয়া টেবিলের উপরেই পড়িল। ভাঙ্গিল না, সামান্য শব্দ হইল শুধু। সেই শব্দে আমরা পৃথিবীতে নামিয়া আসিলাম।

সেই অবসরে সে পুনরায় চলিবার উপক্রম করিতেই—ব্যগ্রকণ্ঠে কহিলাম, রাগ করলে?

মৃদুস্বরে 'না' বলিয়া দ্রুতপদে সে কক্ষত্যাগ করিল।

মধ্যাহ্ন তখন বেশ-পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছে। অপরাহ্নের কোমল আলোয় অনুদের বাড়িখানিকে ভারি মনোরম মনে হইতেছে। আরও মনে হইতেছে, বিস্তীর্ণতায় যে সৌন্দর্য্য বিচ্ছিন্নভাবে ভাসিয়া বেড়ায়—গণ্ডিতে সংহত হইলেই সে পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে পারে; এবং সেই সৌন্দর্য্যের কাছে যুক্তিবাদী মন চিরকালই পরাজয় স্বীকার করিয়া থাকে।

আমার এই অতিগোপন পরম রত্ন পাওয়ার কথা, কি করিয়া জানি না, প্রকাশ হইয়া গেল। প্রজাপতিরা বিচিত্র বর্ণের পাখায়—এই সব বিচিত্র রকমের সংবাদ দুয়ারে দুয়ারে বিলি করিয়া বেড়ায়। আমাদের গোপন মর্ম্মকথা কোন্ গোপনচারিনী যে উদঘাটিত করিয়া দিয়াছে—তাহা অবশ্য পরে জানিয়াছি, প্রথমটা আশ্চর্য্যই হইয়াছিলাম।

আহারশেষে অন্দরমহল ত্যাগ করিবার জন্য পা বাড়াইতেছি—দিদি ডাকিলেন, সুপ্রিয়, শোন।

ফিরিলাম।

এই ঘরে এসে একটু বোস না ভাই। আমি উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন, কালই আমি প্রয়াগ যাব। ইচ্ছা আছে মাঘ মাসটা ওখানে কল্পবাস করব।

কালই যাবেন?

হাঁ ভাই। বাবা অবশ্য কিছু বল্লেন না, বড় বউদি প্রাণপণে বাধা দিচ্ছেন।

কেন?

তুমি শোননি বোধ হয়—মাঘ মাসের মাঝামাঝি ইলার বিয়ে। ওঁরা জানেন, বাইরে থাকলে আমাকে টেনে আনা কঠিন, তাই হয়ত আটকাবার চেষ্টা করছেন।

কেন, বাইরে থেকে আসার অসুবিধা কি?

আসার অসুবিধা কিছু নেই, শুধু আমারই অনিচ্ছা। শান্তি যেখানে পাই সেইখানেই শেকড় নামিয়ে বসি। মানুষের ক্ষণভঙ্গুর সঙ্গে তেমন তৃপ্তি পাই না।

দেবতাকে মনের মধ্যে অনুভব করতে পারেন? প্রশ্নটা করিয়াই লজ্জাবোধ করিলাম। আর যাহাকে হউক—এমন প্রশ্ন করিলে সঙ্কুচিত হইতে হইত না, কিন্তু শোকাতুরা অবলম্বনহীনা বিধবাকে ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহজনক উক্তি করাটা ঘোরতর নিষ্ঠুরের কাজ।

তিনি আমার মুখেরপানে না চাহিয়াই আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, পারি বৈকি ভাই। চক্ষু বুজে তাঁকে ধ্যান করি, তিনি বুকের কাছটিতে এসে দাঁড়ান, টের পাই; এক একদিন তাঁর গায়ের পদ্মগন্ধ পাই। আমার শ্যামসুন্দর না থাকলে—কাকে নিয়ে এই শোক ভুলতুম ভাই। আবেগে তাঁহার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া গেল। সারা দেহ ক্ষণে ক্ষণে শিহরিয়া উঠিতে লাগিল এবং মুদিত চক্ষুর কোল বাহিয়া অবিরল অশ্রু গড়াইতে লাগিল। আমি স্তব্ধবিস্ময়ে তাঁহার ভাবান্তর দেখিতে লাগিলাম। ভয় হইল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া হয়ত বা তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

তাড়াতাড়ি বলিলাম, তবু ওঁদের বিয়েয় উপস্থিত থাকলে ওঁরা খুব খুসী হবেন।

ধীরে ধীরে আত্মসম্বরণ করিয়া চক্ষু মেলিয়া কহিলেন, কি বলছ?

কথাটা পুনরাবৃত্তি করিলাম।

জানি। আত্মীয়স্বজনদের নিয়েই সামাজিক আনন্দ। তবু সাহস হয় না ভাই। সমাজকে আঁকড়ে ধরেছিলাম প্রাণপণে, বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ। দশ বছর আগে তুমি যদি আমায় দেখতে তো অবাক হয়ে ভাবতে—এ আবার কে? যে ছিল ফ্যাশানের প্রজাপতি—যার অষ্টিন ছাড়া বেড়ানো হতো না, প্যারীর সেণ্ট ছাড়া যে গন্ধ-তেল গায়ে মাখত না, পালকের নরম বিছানায় শুয়ে যে সারারাত্রি ছটফট্ করতো—সেই শৈল আজকের এই শৈল কিনা। মায়ের শেষ মেয়ে—তাই আদর করে নাম দিয়েছিলেন শৈলজা।

তিনি অতীতে ফিরিয়া গিয়াছেন, আমি স্তব্ধবিস্ময়ে তাঁর অতীত-রোমন্থন শুনিতে লাগিলাম। তবে কাহিনীতে ভাবাবেগ থাকিলেও বর্ণন-বাহুল্য ছিল না। তা ছাড়া কোন্ অলক্ষ্যে স্নেহের সূতায়—তাঁর সঙ্গে আমার মনের সংযোগসাধন হইয়াছিল। তাঁহার দুঃখটী সমস্ত মন দিয়া একদিন গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, অতীত কাহিনীকে মনের বাহিরে সরাইয়া দিতে পারিলাম না।

সেই শৈলজা—শিবের সংস্পর্শে এসে গলতে আরম্ভ করলো। সূর্য্যের তাপে যেমন বরফ গলে—তেমনি। তুমি দেখনি সেই ভোলা মহেশ্বরকে, তিনি শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, মঙ্গলও সৃষ্টি করেন। তাই তাঁর অন্য এক নাম—শিব। গৌরীর কত যুগের তপস্যা ছিল—তাই শিবের গলায় মালা দিতে পেরেছিলেন।

অতীতধ্যানে খানিকক্ষণ মগ্ন হইয়া গেলেন। খানিক পরে বলিলেন, শিব অহঙ্কারকে ধ্বংস করেন, ঐশ্বর্য্যে তাঁর অভিলাষ নাই, তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। গৌরীর মধ্যে যা কিছু অশিব ছিল—তাঁর মঙ্গলময় স্পর্শে ধুয়েমুছে গেল। শৈলজা হলো—কৈলাসের অধীশ্বরী।

পুনরায় নিস্তব্ধতা। ও ঘরে সময় ঘোষণা করিয়া ক্লকটা টং টং করিল। তিনি চক্ষু মেলিয়া বলিতে লাগিলেন, ভেবেছ দ্বন্দ্ব-বিসম্বাদ কিছু হয় নি—শুধু তাঁর প্রখর ইচ্ছা দিয়ে তিনি সব রকমের অসাম্যকে জয় করেছিলেন অনায়াসে? কিন্তু আশ্চর্য্য ভাই, মন ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও—সেই পরাজয়ে নিরানন্দ হয় নি। এমনি ছিল তাঁর করুণা। একটু থামিয়া বলিলেন, সেই ভোলা মহেশ্বর একদিন লীলা শেষ করলেন। এ মর্ম্মান্তিক কথা তোমায় বলতে পারব না। তাঁকে পেয়েছি, তাঁকে হারিয়েছি। তাই আবার তাঁকে পাবার জন্য সাধনা করছি।

মনে মনে বলিলাম, তোমার সাধনা জয়যুক্ত হোক্, দিদি। আর

জয়যুক্ত যদি নাই হয়—তাহাতেই বা ক্ষোভ কিসের? তুমি যে ধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছ—সেই আনন্দ লোকেই নিজেকে সম্পূর্ণ করিবার মন্ত্রও তুমি খুঁজিয়া পাইয়াছ। আমাদের কোন কামনাই—তোমাকে আনন্দ-স্বর্গ হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না।

কহিলাম, আপনি খাবেন না? অনেক বেলা হ'লো যে।

না, আজ একাদশী। এই দিনে ব্রতউপবাসের মধ্যে দিয়ে কি যেন কাছে আসে, কারা যেন কথা কয়, মন ভারি আনন্দলাভ করে।

স্থাণুর মত বসিয়া আর অধ্যাত্মজগতের রূপকথা শুনিতে পারি না, শব্দ করিয়াই উঠিলাম।

দিদি চমকিত হইয়া আত্মসম্বরণ করিলেন। তাড়াতাড়ি দ্বারপ্রান্তে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, জান সুপ্রিয়, আসল কথাটাই ভুলে গেছি বলতে। ইলাকে আমি আশীর্ব্বাদ করতে পারি—কিন্তু ওর বিয়েয় উপস্থিত থাকতে পারব না। আর তোমাকেও ভালবাসা জনিয়ে যাব, শুভদিনে দিদিকে স্মরণ করো।

আমি তো রোজই আপনাকে—

বাধা দিয়া হাসিয়া বলিলেন, আরে না, না, রোজ না মনে কর, তা নয়। বিশেষ শুভদিনেই—আমাকে মনে করো। দাঁড়াবে একটু? বলিয়া অন্যঘরে চলিয়া গেলেন। অবিলম্বে শ্বেত চন্দনের কারুকার্য্য-খচিত একটি বাক্স হাতে করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

এতে কি আছে, জান? আমার শুভেচ্ছা। ব্রাহ্মণ না হ'লে আশীর্ব্বাদও মনে করতে পারবে।

তাই যদি করি।

বেশ, আমি আপত্তি করব না। আমাদের বংশে মানুষকে খাটো

করার প্রথা কোনকালে ছিল বলে শুনিনি। জাতিবর্ণের উচ্চত্ব আমিও—গুণ কর্ম্ম অনুসারে মানি। তোমায় ছোট ভাইটির মত স্নেহ করি—তুমি যদি শ্রদ্ধা কর আমায়—কেন আপত্তি করব? সম্মান না নিতে পারাটাও তো গৌরবের নয়। ও বাক্স—আমি অনুকেই দিলাম।

অনুকে! ভীষণভাবে চমকিত হইলাম।

তপস্বিনী দিদি মধুর হাসিয়া বলিলেন, হাঁ—অনুকে। কিছু ভুল বলেছি কি?

কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?

আমি শিবের তপস্যা করি, পৃথিবীতেই যে আমার আসন পাতা। আঃ বোকা, অনু ইলার বন্ধু নয়? ওদের যে অনেকদিন থেকেই জানি।

কিন্তু আপনি থেকে যদি আশীর্ব্বাদ করেন—

পারলে তাই করতুম, কিন্তু তা হয় না। নাও, ধর। বাক্সটি আমার হাতে গুঁজিয়া দিয়া তরল স্বরে বলিলেন, তবে ইলাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছি—তার ওপর আমার খুব রাগ হয়েছে। সে কি একবার এসে এই কথাটি বলে যেতে পারতো না।

হয়ত লজ্জায় আসে নি।

সেকালের গৌরীরা স্বয়ম্বরা হতো, একালের গৌরীদেরই বুঝি যত লজ্জা?

সেকথা একালের গৌরীরাই জানেন। শিবের মধ্যে হয়ত শুভ দেখেন না তাঁরা।

না, তা নয়। তারা শিবের একটি রূপই জানে।

কোন্ রূপ?

আমি বলব না, অনুকেই জিজ্ঞেস করো। বলিয়া হাসিলেন।

বাক্সটি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, আপনার গৌরীকেই এ রত্ন দেবেন, শিব ভিখারী—সে রাখতে পারবে কেন ?

তিনি সজোরে হাসিয়া উঠিলেন। কহিলেন, ওই রূপ—ওই কাঙাল রূপ দেখিয়ে ওদের ভয় খাওয়ানো মিছে। ও রূপের সঙ্গে গৌরীরা—সব কালের গৌরীরা পরিচিত।

তবে কোন্ রূপের সঙ্গে তাঁরা পরিচিত নন ?

স্বষ্টির দেবতার একরূপ—শুধু স্বজন, পালন কর্ত্তারও—ঐ একরূপ। কিন্তু ধ্বংস-দেবতার মধ্যে রূপের সংখ্যা নেই। তাঁর মধ্যে স্বষ্টি, স্থিতি এবং লয়।

কিন্তু ধ্বংসেরও তো একটি রূপ। শুধু শেষ হওয়া।

শুধু শেষ হওয়ার কি একটি রীতি ? কেউ রোগে মরে, কেউ অপঘাতে প্রাণ দেয়, কারও বা ইচ্ছা-মৃত্যু। স্বষ্টি—তার রহস্য মানুষ জানে, পালনের তত্ত্বও তার অজ্ঞাত নয়। কিন্তু ধ্বংসের মহিমা সে আজও হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। এই জিজ্ঞাসা তার অনন্তকালের। এই তত্ত্বের উদ্‌ঘাটনে মনীষীর মনীষা, ঋষির দিব্যদর্শন, দার্শনিকের মীমাংসা-চেষ্টা ও বিজ্ঞানের বিকাশ। মৃত্যু আছে বলেই তো জীবনের আদি মধ্য ধরে এমন তন্ন তন্ন করে দেখবার চেষ্টা।

দিদি।

এসো। অনেকক্ষণ তোমায় আটকে রেখেছি—আর আটকাবো না

না, না, তা বলছি না। আমি শুধু ভাবছি—এত অল্প বয়সে—এত—

কিছুই তো শিখি নি, সুপ্রিয়। শুধু কতকগুলো বুলি মুখস্থ করে আওড়াচ্ছি। জ্ঞানের সঙ্গে মানুষের দিব্যদর্শন না হলে—সব জ্ঞানই যে মিথ্যে। সে সময়ে মন বড় হু-হু করতো—তাই বাবার কাছে কিছু কিছু মৃত্যুতত্ত্ব শুনতুম।

মনে হইল, দিদি আজও পরিপূর্ণ শান্তি পান নাই। মুখে যতই বলুন না কেন, সেই মন হু—হু-করার অশান্তি আজও উঁহার বিদ্যমান। শোকের তীব্রতা আপনিই কমিয়া আসে, কিন্তু জ্বালার উপশম ঘটে না। কি করিয়া ঘটিবে? পৃথিবীতে পুনরাবৃত্তি এত বেশি যে—মনের ভারকেন্দ্রটিকে স্থিত করিবার অবকাশ জীবনের শেষ দিনেও আসে না।

মনের মধ্যে যিনি শান্তির দেবতাকে পাইয়াছেন—তাঁর তীর্থ-ভ্রমণের কি প্রয়োজন? কোন মাঙ্গলিক কর্ম্মে যোগ দিবার সাহসই বা কেন তাঁর নাই?

ভাবিতে ভাবিতে ত্রিতলের ঘরে কখন পৌঁছিয়া গেলাম।

৬

আমিও হঠাৎ চিন্তার জগৎ হইতে চমকিত হইয়া অন্যমনস্কের মত প্রশ্ন করিলাম, কে? তিনিও টেবিলে প্রসারিত খাতা হইতে মুখ তুলিয়া তেমনই বিস্মিত কণ্ঠে প্রতিপ্রশ্ন করিলেন।

পরে আত্মস্থ হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, বোস, বোস, কবি। তুমি যে এমন সুন্দর লেখ—তা জানতাম না।

অতি তুচ্ছ ধুলি হতে বিস্তারের যে বারতা নিয়ে এলো উত্তরের বায়ু,
তার প্রিয় স্পর্শ পেয়ে দু'জনার মনোমাঝে লভে প্রেম দীর্ঘ পরমায়ু।
অনন্ত আকাশ হাসে, রঙীন ধরণী কহে, এ খেলার বারতা গোপন,
ক্ষুদ্র ক্ষতি, ক্ষুদ্র আশা—অনন্তে মিশিয়া গেল, ক্ষুদ্র দুঃখ হ'লো বিমোচন।

লজ্জিত মুখে বলিলাম, নেহাৎ ছেলেমানুষি।

তাতে কি! ছেলেমানুষেরা বুড়োমানুষি করলেই তো বেমানান। বড় মানুষি করলেও।

বড় মানুষি করলেও?

কেন নয়? নিজেকে বিস্তার করবার ও উঁচু করবার সময়ই যে ওটা।

আমার তো মনে হয়, দেখেওছি—অনেক বৃদ্ধ তাঁদের যৌবনকালের দুঃসাহস আর কীর্ত্তিকাহিনীতে পঞ্চমুখ।

সেটায় বুড়োদের দোষ দেখো না, কবি। যাঁদের সঞ্চয়ের শক্তি ফুরিয়ে গেছে, পুঁজিকে ভাঙ্গিয়ে বিলাস তাঁরা করবেনই তো। তাঁরা বড় অসহায়, কবি।

আপনি তো কই করেন না।

আমার আছেই বা কি? সোনার চামচ মুখে পুরে জন্মেছি—জীবন-যুদ্ধ কাকে বলে জানি না। প্রণয়ের ক্ষেত্রেও স্বাধীনতা ভোগ করিনি—বলিয়া চিকণস্বরে হাসিয়া উঠিলেন। হাসি থামিলে বলিলেন, কিন্তু তোমার কথা তো সত্যি নয়, সুপ্রিয়। প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়—তখন কি কোন বিষয় নিয়ে আমাকে গর্ব্ববোধ করতে দেখনি? তারপর কংগ্রেসের কমিটি মীটিং শেষ করে—প্রায় মাসখানেক পরে যখন কলকাতায় ফিরে এলাম—তখন একেবারে আলাদা মানুষ।

প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে জাগিল, খুব যে স্পষ্ট করিয়া জাগিল তাহা নহে। অপরিচয়ের অন্ধকারটা তখন বিস্তারে ও গাঢ়তায় ছিল বৃহৎ, কাজেই তাঁহার কথার অর্থ ও চালচলনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভ্রম জন্মানো স্বাভাবিক ছিল। আজ সে অন্ধকার নাই, মানুষটির পূর্ণ পরিচয় ক্রমশঃ আলোর মধ্যেই পাইতেছি, এবং সে অন্ধকারকে মনে রাখিবার কথা নহে। শুধু এই চিকণ হাসির ধ্বনির মধ্যে—সেদিনের হারানো সুরটি এক একবার যেন মনের পরদা ছুঁইয়া যাইতেছে। আর একটি জিনিস সেই প্রথম দর্শনে যাহা মনকে অত্যন্ত বিমুখ করিয়া দিয়াছিল—দেহ ও স্বাস্থ্য লইয়া অতিব্যস্ততা, তাহাও আশ্চর্য্যজনকভাবে মিলাইয়া গিয়াছে। সেই প্রশ্নটিই উঁহার কথায় উগ্র হইয়া উঠিল এবং সাহস

করিয়া বলিয়াও ফেলিলাম, আজকাল আপনার শরীর বোধ হয় ভালই আছে ?

ভাল ? কেন বল ত, হঠাৎ তুমি এই প্রশ্ন করলে ? আগ্রহভরে তিনি আমার পানে চাহিলেন।

মানে, প্রথম যেদিন আসি এখানে—তখন যেন কবিরাজী ওষুধ, না কি চলছিল।

ওঃ—! হাঁ—সে সব পাট আর নেই বটে। অনেকদিন শরীরটাকে নিয়ে ব্যস্ত রইলাম ; দেখলাম ব্যস্ততা বাড়ানো ছাড়া ও আর কিছু দিতে পারলে না আমায়, তাই ওকে নিয়ে আর ব্যস্ত হই না।

কিন্তু শরীর ভাল থাকা কি সবচেয়ে ভাল সম্পদ নয় ?

সব সম্পদ সবাইর ভাগ্যে জোটে না, কবি। মেদমাংসের বোঝাটা বয়ে বেড়ানোই যখন দুর্ভোগ—তখন তা থেকে আমায় ঠেকাবে কে ! চিকিৎসককে পোষণ করা ধর্ম্ম বলেই—এতকাল তাই করলাম।

কিন্তু হঠাৎ আপনার এই পরিবর্ত্তন হ'লো কেন ?

যদি বলি, কংগ্রেস-মীটিং শেষ করে কোন এক তীর্থে এক পণ্ডিত-সাধুর দেখা পেয়ে আমার মত বদলেছি—তুমি কি মনে মনে বলবে না, বুড়োবয়সের যা রোগ তাই পেয়ে বসেছে আমায় ? বলবে না ? আমার যখন বয়সকাল ছিল—তখন সাধুসন্ন্যাসী দেখলে কি মনে ভাবতাম জান ? ভাবতাম—ধর্ম্মের নাম করে আলসেমির এমন সুবর্ণসুযোগ আর কোথাও বুঝি নেই !

ধর্ম্মের নামে আলসেমি কি হয় না ?

হয়, সবক্ষেত্রে নয়। আরও কি ভাবতাম জান ? ওঁরা জনগণের দুঃখদুর্দ্দশা বোঝেন না, ওঁরা স্বার্থপর। বাইরের জগতে কে বেঁচে রইলো, কার কি অভাব সে বিষয়ে ওঁদের দৃষ্টি নেই। শুধু নিজের

পরমার্থ-চিন্তা নিয়ে মগ্ন হয়ে রয়েছেন। হতে পারে সেটা ব্রহ্মের সামীপ্যলাভ—নিজের উন্নতি চিন্তা ছাড়া আর তো কিছু নয়।

এ কথাও সত্য।

না কবি, একথা সত্য নয়। আচ্ছা বলত, তুমি সন্ন্যাসী নও, ঈশ্বর-চিন্তায় কালক্ষেপ না করে মানুষকে ভালবাসার অবকাশও তোমার যথেষ্ট, তুমি কতটুকু মঙ্গল করেছ এই জগতের? কতটুকু মঙ্গল করেছ তোমার প্রতিবেশীর?

আমার হয়ত সে সুযোগ হয় নি।

এবং সারাজীবনেও এ সুযোগ হয়ত আসবে না! বলিয়া হাসিলেন। সান্ত জগতের মানুষ—সব কিছুই তার সীমাবদ্ধ। বাল্যে ও কৈশোরে বিদ্যা অর্জ্জনে মনোনিবেশ করেছ, যৌবনে উপার্জ্জন ও প্রণয় এই চিন্তায় সংসারে তোমার সীমা নির্দ্দিষ্ট, আর বার্দ্ধক্যে যদি সংসার-বিমুখতা কখনো আসে—তবে দিনগত পাপক্ষয় মত মালাজপে পরকালকে কিছু সুলভ করবার আশা রাখবে। বলত কবি, এই যে দীর্ঘ সময় এর মধ্যে জনকল্যাণে কখন তোমার আত্মনিয়োগ হ'লো?

কিন্তু—সে সুযোগ আমার আসতেও পারে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক তাঁরা সন্ন্যাসী না হয়েও মানব সমাজের যা কল্যাণ করেছেন—

সুপ্রিয়, সন্ন্যাস শব্দের তুমি সঙ্কীর্ণ অর্থ করো না। যা কিছু নিজের স্বার্থ—তার ত্যাগই হ'লো সন্ন্যাসের মূল কথা। আত্মসমাহিত বৈজ্ঞানিকের যে উদ্ভাবন, চিকিৎসকের যে আবিষ্কার তা সন্ন্যাসীর মঠ, মন্দির বা গীর্জ্জায় বসে আবিষ্কারের সমগোত্রীয়। শোন তোমার রুশ লেখক কি বলছেন:

The monk is reproached for his solitude, 'you have secluded yourself within the walls of the monastry for

your own salvation and have forgotten the brotherly service of humanity. But we shall see which will be most zealous in the use of brotherly love. For it is not we, but they, who are in isolation, though they don't see that. Of old leaders of the people come from among us, and why should they not again? ওঁদের জগৎ অনন্ত—কাজেই জনহিতের জন্য ওঁরাই বার বার এগিয়ে আসেন। আমরা সংসারীরা—অত্যন্ত ব্যস্ত থাকি আমাদের চারখানি দেওয়াল-ঘেরা ঘরের মধ্যে।

দীর্ঘ বক্তৃতায় ঈষৎ হাঁপাইয়া উঠিয়াছেন মনে হইল। আমি কোন কথা কহিতে পারিলাম না। নানাদিক হইতে জীবনকে দেখিয়া বিশ্লেষণ করার অবসর বা সুযোগ আমার আসে নাই। নিজের সান্ত জীবন লইয়া মগ্ন আছি—অনন্ত জীবনের কল্পনা কোথায় পাইব। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করিতেছি, অনুর কাছে নিজেকে প্রকাশ করিয়া যে অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি—তাহার রঙে সমস্ত-কিছুই রঙীন হইয়া গিয়াছে। সবই ভাল লাগিতেছে। এমন কি কাল রাত্রিতে কবিতা লিখিবার অবসরে বিনয়বাবুর কথাও একবার চিন্তা করিয়াছিলাম। কাল রাত্রিতে সুদীর্ঘ একটি কবিতা লিখিয়াছি। আজ মনে হইতেছে—আরও অসংখ্য কবিতা লিখিব। জগৎ প্রসারিত হইতেছে।

নীতিশবাবু আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, সেদিন তোমায় বলেছিলাম না আমার পরিবর্ত্তন আসছে। আর একটা পরিবর্ত্তন। সেটুকু আমি বুঝছি। তবে—বৈরাগ্যের দ্বারা নয়—কর্ম্মের দ্বারা সেই পরিবর্ত্তনকে আমি গ্রহণ করব। পণ্ডিত-সাধু আমার উপকার করেছেন বৈকি। একটু থামিয়া বলিলেন, হাঁ—যে কথা বলছিলাম, সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সঙ্কীর্ণ নয়। যে কোন কর্ম্মীর জীবন দেখ—বাহ্যত মনে হবে, তোমার আমার জীবনের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য, কিন্তু মূলতঃ যোগী-জীবনের সঙ্গেই

তাঁদের যোগ। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন—এ নৈলে কোন বড় কাজ হয় না।

আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো? গান্ধীর জীবন—

সুপ্রিয়, রাজনীতি আলোচনার ক্ষেত্র আমার আলাদা, তবু গান্ধীর কথা যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন বলব, অদ্ভুত ওঁর জীবন। উনি সান্ত জগৎ অতিক্রম করেছেন—কর্ম্মের পথে। চিত্তশুদ্ধির ওপর এখন বেশি করে জোর দিচ্ছেন বলেই—আমাদের অপ্রিয় হয়ে পড়ছেন। উনি দীর্ঘ জীবনে যা দেখলেন—মিথ্যাভাষণ, শঠতা, আত্ম-প্রবঞ্চনা, নীচতা, হিংসা, ক্ষমতাপ্রিয়তা—তারই প্রতিক্রিয়া চলছে আজ। তাই ব্যাপক আন্দোলনকে সীমাবদ্ধ করে এনেছেন। রাজনীতির ক্ষেত্র ওঁকে আর মানাচ্ছে না।

তাহ'লে—নেতাদের শেষ পরিণতি অধ্যাত্মবাদে?

বহু লোকের সাহচর্য্যে এসে ওইটাই হয়তো শেষকালের অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। জড়শক্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে না পারলে দৈবশক্তির আশ্রয় আমরা নিয়ে থাকি। হয়ত এ আমাদের দুর্ব্বলতা—কিন্তু ভারতীয় মনের এই ধারা নিজস্ব। তবু, একটু থামিয়া বলিলেন, গান্ধী সম্বন্ধে আমার ধারণাকে নামাতে কষ্টবোধ করি। তাঁকে একদিন মাথায় তুলে নেচেছি, আজ যা-নয়-তাই বলে মাটিতে ফেলে লাঞ্ছনা করছি—এ দেখে নিজের ওপর আমার নিজেরই করুণা হয়। সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরা অমনি করেছি। এ তো আমাদেরই দুর্ব্বলতা।

দুর্ব্বলতা হতে পারে, তাঁরা কি নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে অন্যায় করেন নি?

তাইত সুপ্রিয়, সব জিনিসের পরিবর্ত্তন আছে—জগতের, ধর্ম্মের, সমাজের, সংসারের—শুধু পরিবর্ত্তন নেই মানুষের আর তার নীতির?

আর্য্য বংশধর বলে আমারা গর্ব্ব করি, অথচ সেকালের ঋষি-রচিত বিধান ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে বলি, সেকালে যা খাপ খেতো—আজ তাকে মানিয়ে চলার চেষ্টা বাতুলতা। কেন? না, একাল তো সেকাল নয়। এর মধ্যে মানুষের আকৃতি ও প্রকৃতি বদলেছে—ধর্ম্মশাস্ত্র কেন বদলাবে না! যদি সমাজনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, স্থাপত্যনীতি, বৃত্তি, জীবনযাপনপ্রণালী সব বদলে থাকে—তো প্রথম যুগের সুরেন্দ্রনাথ কি সার সুরেন্দ্রনাথ হতে পারেন না? জননেতা হয়ে তাঁরা তো যন্ত্রমাত্র-হন নি।

না, তা বলছি না। জননেতা জনতাকে চালাবেন, যে মূলনীতির সঙ্গে তাঁদের বিরোধ তার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তনের কোন কথাই আসে না। আসা উচিত নয়।

আসে না আর আসা উচিত নয়—এক কথা নয়, কবি। উচিত নয় ওটা হ'লো জনমত, আসে না—ওটা হ'লো কালের মর্জ্জি। মানি তুজনেই সমান নিষ্ঠুর। তুইই নিজের নিজের মর্জ্জি বা খেয়াল অনুসারে চলে। তবু পরিবর্ত্তন আসে। নিষ্ঠুর জনমত ধিক্কার দেয়—নিষ্ঠুর কাল পরিবর্ত্তনের স্রোতে নেতাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউ কাউকে ঠেকাতে পারে না, কবি। বড় অসহায় নেতা। তিনি জাতির হৃদ্স্পন্দন অনুভব করেছেন এককালে, তার তুর্ব্বলতা জানেন, ক্ষুদ্রতায় ব্যথিত হন, শঠতায় গ্লানিবোধ করেন, দ্বৈতনীতির প্রয়োগে বিবেকের শাসন-বাণী শুনতে পান। যাঁরা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন—তাঁদের গতি অত্যন্ত দ্রুত, তাঁদের ধৈর্য্য কম, বিচারে আবেগপ্রবণতা বেশি। একটু এদিক-ওদিক হ'লে দলে ভাঙ্গন ধরে, নেতার তুর্নাম রটে। নেতা সঙ্কোচে পিছিয়ে পড়লে আমরা নিষ্ঠুরের মত তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করি। এতবড় হিংসাপ্রবৃত্তি নিয়ে অহিংস সংগ্রাম?

হাসিয়া বলিলাম, তাই মনে হয়—ও আকাশকুসুম।

তাতো বটেই—মাটিতে ওর প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্য্যন্ত—আকাশেই ওর শোভা। তবু কবি, তোমার কবিতায় যেমন প্রখর কল্পনা আর শব্দব্যঞ্জনা মিলে সুস্পষ্ট ও সুন্দর একটি রূপ দিয়েছ—ওর তেমনি রূপ একটা আছে। আমাদের কল্পনায় আসে না বলে—অবাস্তব বলে আমরা অসম্ভব মনে করি। আত্মিকশক্তিকে ব্যাপক আন্দোলনের ক্ষেত্রে টেনে আনাটাই হয়ত ভুল।

আপনারা স্বীকার করেন?

স্বীকার করি এইজন্যে যে ওকে লাভ করবার সাধনা আমাদের নেই। আমরা নীচেয় রইলাম পড়ে—উঁচু ধারণাগুলো রাখবার পাত্র কোথায়? যাক, অনেক বকলাম।

কিন্তু—

আর একদিন—কবি—আর একদিন ও তর্ক করব। আজ আমি ভারি ক্লান্ত। বলিয়া ক্লান্তিভরে চেয়ারের পিঠে মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিলেন।

৭

আর একদিন, এবং এইদিন তর্কের আসর বসে নাই। মাঘ মাসের মাঝামাঝি একটা শুভদিনের খোঁজে নীতিশবাবু পাঁজি উল্টাইতেছিলেন। চোখের চশমাটিকে কয়েকবার মুছিয়াও শুভদিনের সময়টি হয়ত ঠিক ধরিতে পারিলেন না, আমার হাতে পাঁজিখানা দিয়া বলিলেন, যে ক্ষুদে ক্ষুদে লেখা—নজর হয় না। দেখত, আজ বারবেলা কালবেলা গুলো বাদ দিয়ে কখন অমৃতযোগ বা মাহেন্দ্রযোগ আছে?

পাঁজি লইয়া অনুচ্চস্বরে উচ্চারণ করিলাম, শুক্রবার, পুষ্যানক্ষত্র, কালবেলা দিবা ৮-৩০ মিনিট, পশ্চিমে যোগিনী—

নীতিশবাবু মৃদুস্বরে একবার উচ্চারণ করিলেন, শুক্রবার।

বেলা ৪টা ৩০ সেকেণ্ডের পর অমৃতযোগ আছে।

কতক্ষণ পর্য্যন্ত?

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত।

ব্যস, বিকেলেই আমরা যাব। আজ সুকুমারকে আশীর্ব্বাদ করতে যাব কিনা। বিকেলেই ভাল।

আমায়ও যেতে হবে?

নিশ্চয়। কবি, পুরোহিত, নরেন দত্ত আর আমি এই চার জনে যাত্রা করব। বড় বউমা—বড় ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন—ফাল্গুনের প্রথমেই শুভকার্য্য হবে।

সুকুমারকে আপনি জানেন?

জানি বৈকি। তবে ওর সঙ্গে প্রথমে বিয়ের কথা হয় নি তো। বউমারও মত ছিল না।

মত ছিল না?

না। আর একটি ছেলেকে আমরা জানতাম। সে বিলাত থেকে ব্যারিষ্টার হ'য়ে এসেছে।

সেখানে বিয়ে হ'লো না কেন?

হলো না, কারণ স্বয়ম্বরের ব্যাপার। নাতনী হ'লেন স্বয়ম্বরা—বউমা হলেন আউট-ভোটেড। বলিয়া চিকণ স্বরে হাসিয়া উঠিলেন। অতঃপর হাসিতে হাসিতেই বলিলেন, একালের ছেলেমেয়েগুলোর বুদ্ধি আছে, কবি। তারা বুড়ো মাবাপকে অযথা কষ্ট দেয় না। মনে হইল হাসিটা আমাকে উপলক্ষ্য করিয়াই বা! অন্যদিকে মুখ ফিরাইলাম।

তিনি আড় চোখে আমার পানে চাহিয়া কহিলেন, অবশ্য এ হাওয়াটা সংক্রামক। তবু আমার তো বেশ লাগে। প্রথম ভালবাসাটা লুকোবার জন্য তরুণের এই চেষ্টা—ভারি চমৎকার! এটাকে ওরা গোপন মনে করে বলেই লজ্জা, নয়?

লজ্জায় কান লাল হইয়া উঠিল। মুখ ফিরাইতে পারিলাম না, গলার স্বরও আটকাইয়া গেল।

তিনি হাসিয়া বলেলন, তাইত কবি, নাতনীর হ'য়ে লজ্জাটা তুমিই ভোগ করছ মিছিমিছি। আরে চাও না এদিকে। শৈলর কথাটাও আমায় রাখতে হবে তো। আবার হাসি।

রহস্যের মূলসূত্র আবিষ্কার করিয়া মৃদুস্বরে বলিলাম, যে হাওয়ায় ভাসছে—তাকে ওসব সাজে না।

আমায় রাগিও না, কবি। তোমরা ভীরু, তাই দায়িত্বের কথায় শিউরে ওঠো। তোমাদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব—তাই উপার্জ্জনের দোহাই দিয়ে সমাজকে কর পঙ্গু, নিজেকে কর বঞ্চিত। তীক্ষ্ণ সর কণ্ঠস্বরের মধ্যে ভর্ৎসনার সুর শুনিলাম। নীরবে ভাবিলাম, তাই কি?

তিনি বলিলেন, দায়িত্ব! শুধু দুঃখবহনের বেলায় তোমাদের মুখে শুনি দায়িত্বের কথা। দারিদ্র্য—ওতো বাইরের খোলস, ওতে মানুষকে খাটো করবে কেন। এমনভাবে আমার পানে চাহিলেন, যাহাতে নঙর্থক প্রত্যুত্তরটা মুখে আটকাইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই আমার অবনত ও পাংশু মুখের পানে চাহিয়াই হয়ত বা তাঁহার ক্ষণিক উত্তেজনাটুকুকে দমন করিলেন ও হাসিমুখে বলিলেন, ভয় পেয়ো না, কবি। জীবনে ভয় পেলে—এত ছোট হ'য়ে যাবে যে সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে নিজেকে আর খুঁজে পাবে না। দুঃখ শুধু দারিদ্র্যের পথে নেই, সম্পদের পথেও আছে। যদিও তাদের রূপ ভিন্ন, তবু সমান আঘাতই দেয়। বস্তুতন্ত্রের

জগৎ ছাড়া—আরও এক জগতের সন্ধান তো তোমরা রাখ কবি, তোমরা কেন দুঃখ-দুঃখ করে হা-হুতাশ কর !

ধীরে বলিলাম, সংসারকে অস্বীকার করতে পারি না বলেই—

তিনি হাসিয়া বলিলেন, কে বলেছে—তাকে অস্বীকার কর। নিরুদ্বিগ্ন স্বর্গসুখ সে দেবতারা ভোগ করুন—অবশ্য আমাদের কল্পনা যদি সত্য হয় ; কিন্তু উদ্বেগই তো মানুষকে সামনের পথ দেখায়। আমরা দুঃখের কথায় এত ভয় পাই কেন, জান ? কারণ—জীবনযাপনপ্রণালীর ধারা আমাদের জানা নেই। আকাশের চাঁদ না পেলে যে ছেলে কাঁদে—মাটির খেলানায় তার খুঁৎখুঁতুনি ঘুচবে কেন ? এটা বোঝ না কবি, চাঁদ পাওয়ার তপস্যা না থাকলে মাটির ঢেলাতেই সন্তুষ্ট হওয়া উচিত কিনা ? গুণ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ—পৃথিবীতে স্বনিয়মে ঘটে আসছে। এটাকে জোর করে মুছবার চেষ্টা মিছে।

তর্কের মীমাংসা আমি চাহি নাই, তর্কপ্রবৃত্তিও ছিল না। এমনি-তেই মন উঁচু সুরে বাঁধা ছিল, কাজেই মনে মনে খুসী হইলাম।

নীতিশবাবু বলিলেন, সব শেষ কথা মনে রাখবে কবি, প্রত্যেক জিনিস—সাধনার দ্বারা লাভ হয়। চালাকির দ্বারা অনেক কাজ হলেও —মহৎ কাজ হয় না। সে সাফল্যে খানিকক্ষণের জন্য আনন্দ হয় তো হয়, সর্ব্বক্ষণের তৃপ্তি তাতে নেই। তোমার দু'ছত্র কবিতা যদি রবি-বাবুর লেখা থেকে ভাঙ্ চুর করে লোকের প্রশংসা পেয়ে থাকে—তার আনন্দ তোমার কতক্ষণ স্থায়ী হতে পারে, কবি ? তেমনি—সংসার। নিজেকে যতক্ষণ ওর সঙ্গে মানিয়ে না নিতে পারছ—ততক্ষণ তুমি নিষ্ফল—তোমার দুঃখ তোমায় পুড়িয়ে মারবে।

মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিলাম। শীত-প্রত্যুষের মিষ্ট রৌদ্র তাঁহার বার্দ্ধক্য শ্রী-মণ্ডিত মুখখানিকে অপরূপ করিয়া তুলিয়াছে।

সেই সঙ্গে বুঝি মাঘ মাসের মহানগরীও প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

প্রকাণ্ড বাদামী রঙের মোটরে আমরা পথ অতিবাহন করিতেছিলাম। পিছনের সীটে নরেন দত্তের পাশে বসিয়াছেন পুরোহিত মহাশয়—তাঁর পাশে আমি। চালকের আসনে ষ্টীয়ারিং ধরিয়া স্বয়ং নীতিশবাবু। তাঁহার পাশে প্রৌঢ় হিন্দুস্থানী চালক বসিয়া আছে।

মোটরে উঠিবার সময় নরেনবাবু বলিয়াছিলেন, সামনে গিয়ে বসলে কেন হে?

নীতিশবাবু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, নাতনীর বিয়ের সারথির কাজটা আমায় দিয়েই হোক না, ভাই। অনেক করেও তো ওদের মন পেলাম না!

নরেনবাবু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, এগিয়ে-যাওয়া মনের সন্ধান করা আমাদের মত বুড়োরা পারবে কেন? এতো আর দ্বাপর যুগ নয়। নরেনবাবু নীতিশবাবুর বন্ধু অর্থাৎ সমবয়সী। কর্পোরেশনের একজন তেজী কাউন্সিলর, পরিহাসপটুত্ব তেমন না থাকিলেও—পরিহাসের চেষ্টাটুকু আছে।

মোটর ছাড়িবার মুখে পুরোহিত মহাশয় গমনে বামনশ্চৈব সর্ব্বকার্য্যে শ্রীমাধব উচ্চারণ করিলেন। সম্পূর্ণ আধুনিক ধরণের মোটর—যাত্রাকালে একবারও বিশ্রীভাবে গোঙাইয়া উঠিল না, প্রচুরতম ধোঁয়া ছাড়িয়া প্রবলতম ঝাঁকানি দিয়াও সর্ব্ব ইন্দ্রিয়কে গমনোপযোগী করিয়া তুলিল না। নিঃশব্দে পীচবাঁধানো পথে পিছলাইয়া গেল।

দক্ষ চালকের মত নীতিশবাবু ষ্টীয়ারিং পরিচালনা করিতে লাগিলেন। পথের বিদ্যুৎবাতির আলোকে তাঁহার বলি-রেখাঙ্কিত বিশাল

ক্ষণে ক্ষণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কি প্রশান্ত—
নির্ব্বিকার সেই মুখ। গতির উল্লাসে লোল চর্ম্মের উপর ঈষৎ-
শিরার মধ্যে চঞ্চল রক্তস্রোত নাচিয়া উঠিল, নিঃশব্দে জন-
াপার সাকুলার রোড বাহিয়া মোটর ছুটিয়া চলিল।
লদহের মোড়ে ট্রাফিক-পুলিশ-নিয়ন্ত্রিত হইয়া ক্ষণিকের জন্য
ামিল। কাগজের অপরাহ্নিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।
বাদটি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়া বাঙালী হকার আসিয়া মোটরের
াইল। নরেনবাবু তাড়াতাড়ি একখানা কাগজ কিনিলেন।
জ বিক্রেতারা তখনও হাঁকিতেছে, ভারি কাণ্ড হলো বাবু।
স্বদেশীবাবুদের ভারি কাণ্ড। বোমা ফাটল—লোক মরলো

শবাবু একবার ঈষৎ ঘাড় ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর.
কার মাথায় বোমা ফাটল—কে মরল?
বাবু উত্তর না দিয়া মনোযোগসহকারে কাগজ পড়িতে
তখনও ক্যাম্পবেল হাসপাতাল পার হয় নাই, নরেনবাবু
কার করিয়া উঠিলেন, থামাও—গাড়ী থামাও, নীতিশ।
বাবু গাড়ীর গতি কিছু মন্দীভূত করিয়া কহিলেন, হলো কি
? সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত মাহেন্দ্রযোগ, গাড়ী থামালে কি
পৌছতে পারবে?
বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন, হ্যাং ইওর মাহেন্দ্রযোগ। ইউ
। বলিয়া কাগজখানা নীতিশবাবুর কোলের উপর ছুড়িয়া
নর কুশনে অধৈর্য্যভাবে কয়েকটা চাপড় মারিলেন।
। নীতিশবাবুকে [illegible]
খের সামনে ধ[illegible]

হয়ত হইবে—সেখানার সংবাদটুকু গলাধঃকরণ করিয়া
আমার কোলের উপর ফেলিয়া দিয়া পুনরায় মোটরে স্টার্ট দি

নরেনবাবু আর একবার চীৎকার করিয়া কি যেন বলি
কানে গেল না। বিশেষ-সংবাদে আমি তখন নিবিষ্টচিত্ত।

সংবাদটুকু সংক্ষেপে এই:

দার্জ্জিলিং শৈলশৃঙ্গে—বাতাসিয়া চা বাগানের নিভৃত
বিপ্লবীদের সঙ্গে পুলিশের একটা সংঘর্ষ হইয়া গিয়াছে। সে
তৈয়ারীর সাজসরঞ্জামসহ কয়েকজন বিপ্লবী ধরা পড়িয়া
ধরা পড়িবার পূর্ব্বে যে সংঘর্ষ হয়—তাহাতে দুইজন যুবক
আহত হয়। একজন তরুণীও নাকি সেই বিপ্লবীদলে ছি
বাঁচাইতে গিয়া চা বাগানের তরুণ ম্যানেজার শ্রীযুক্ত স্ব
মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, তরুণীর অবস্থাও সাংঘাতিক। প
হতাহতের সংখ্যা পাঁচ।

কিন্তু অতদূর অগ্রসর হইবার মনোবল আমার ছিল না
নরেনবাবুর মত চীৎকার করিয়া মোটরের গতিবেগ সংয
চাহিলাম। কিন্তু সে প্রয়াসে গলার স্বর আটকাইয়া সারা
ভাবে শুধু কাঁপিয়া উঠিল। অপেক্ষাকৃত জনবিরল ও প্র
সার্কুলার রোডে পড়িয়া মোটর ততক্ষণে বায়ুবেগে ছুটি
করিয়াছে। সন্ধ্যা-অভিমুখী সুসজ্জিতা মহানগরী
চারিপাশ হইতে মুছিয়া যাইতেছে, শুধু স্থির দৃঢ়মুষ্টিতে ষ্টী
নীতিশবাবু পরম নির্ব্বিকারভাবে বসিয়া আছেন।

সমাপ্ত